ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা

[১৯৬৫ সালের ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের জন্য]

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ, এম্. এ.

প্রাক্তন অধ্যাপক যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও গুরুচরণ কলেজ, শিলচর ; শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা, শিক্ষায় পথিকৃৎ, অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা, মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, সহজ তর্কবিদ্যা, মনোবিদ্যার রূপরেখা, সমাজ-দর্শন, নীতিবিদ্যার রূপরেখা, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের রূপরেখা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা

ও

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী, এম্. এ., এল্. এল্. বি., ডি-ফিল. (ক্যাল), সাহিত্যভারতী (বিশ্বভারতী)

দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

নলেজ হোম • কলিকাতা-৬

৫৯, বিধান সরণি (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট)

প্রকাশক :
শ্রীশান্তিকুমার মজুমদার, বি. এ.
নলেজ হোম
৫৯, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ১৯৬৪

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীসমীর রায়চৌধুরী

মুদ্রণে :
শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩, কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৩

উৎসর্গ

দেবচরিত্র পিতৃদেব
শ্রীনীরদরঞ্জন গুহ
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

বিভুরঞ্জন গুহ

... ...

৺রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে—

সুধীরকুমার নন্দী

ভূমিকা

দর্শনশাস্ত্র নির্বস্তুক দুরূহ মননের বিষয়। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা হইতে জানিয়াছি যে সহজ ও সরস ভাষায় এবং যেখানেই সম্ভব পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে এই কঠিন বিষয়কে উপস্থাপিত না করিলে ইহা বিদ্যার্থীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে না এবং স্পষ্ট রেখাপাতও করে না। ইহা অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তার ও আলোচনা সাপেক্ষ। সর্বত্রই বিষয়টি যাহাতে ছাত্রদের কাছে সরল ও স্পষ্ট রূপ নিয়া ফুটিয়া ওঠে সেই চেষ্টাই আমরা করিয়াছি। হয়তো ইহা সত্য যে শুধু মাত্র পরীক্ষা পাসের জন্য অল্প কয়েকটি প্রশ্ন বাছিয়া নিয়া তাহাদের 'তৈরী উত্তর' মুখস্থ করিলে চলিতে পারে। কিন্তু এ প্রকার শর্করার ভারবাহী গর্দভ সৃষ্টি করায় সহায়তা করা শিক্ষকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়াই মনে করি। তাই বিষয়টি প্রাঞ্জল করিবার উদ্দেশ্যে সর্বদাই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি—ছাত্রদের কৌতূহল উদ্রেক করিয়া বিষয়বস্তুতে আগ্রহ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

পুস্তকটি রচনায় দেশী ও বিদেশী বহু গ্রন্থ হইতে উপাদান অকৃপণভাবে সংগ্রহ করিয়াছি। সর্বত্রই আকরগ্রন্থ এবং ভারতীয় দর্শনের বেলায় মূল সূত্র বা শ্লোক উল্লেখ করিয়াছি। বলাই বাহুল্য, এই ঋণগ্রহণ ব্যতিরেকে এই গ্রন্থগুলি রচনা করাই সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়াও যে সমস্ত সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী উৎসাহ দিয়া, পরামর্শ দিয়া, পুঁথিপুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদের এই কঠিন কাজ সফল করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে ঋণের বোঝাও সামান্য নয়।

যাঁহারা পরামর্শ দিয়া, উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিধুভূষণ ঘোষ, অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত, অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্র দাশ, অধ্যাপক মনোমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা প্রতিমা সেন, অধ্যাপিকা মীরা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা রত্না সেন, অধ্যক্ষা ডঃ সুশীলা মণ্ডল, অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা সুব্রতা বসু।

অধ্যাপিকা সুজাতা চৌধুরী এম. এ., শ্রীমতী শুক্লা মুৎসুদ্দি ও তাঁহাদের পিতা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দি বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যাপিকা প্রতিভা আচার্য ও শ্রীমতী

রাধারাণী সেন এম. এ. কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে যত্ন করিয়া পাঠ করিয়া এবং আলোচনা করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের কাছে আমাদের ঋণ প্রভূত।

দূর হইতে অথবা নেপথ্যে থাকিয়া যে সব মা-বোনেরা তাঁহাদের স্নেহ, শ্রদ্ধা ও সেবা দিয়া আমাদিগকে শক্তিদান করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপিকা অপরাজিতা চৌধুরী, অধ্যাপিকা অলকা দাশ, শ্রীমতী মালবিকা সরকার, শ্রীমতী মীরা অরোরা, শ্রীযুক্তা মায়ামুকুল মজুমদারের নিকট আমাদের ঋণের সীমা নাই।

এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীযুত অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা বিশেষ ভাবে ঋণী। তিনি আদ্যোপান্ত প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার প্রুফ অতিশয় যত্নের সঙ্গে সংশোধন করিয়াছেন এবং বহু ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন ও আলোচনা দ্বারা আমাদের চিন্তাকে সুস্পষ্ট এবং প্রকাশভঙ্গীকে প্রাঞ্জল করিতে সাহায্য করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

কলিকাতা
জুলাই, ১৯৬৪

বিভুরঞ্জন গুহ
সুধীরকুমার নন্দী

সূচীপত্র

Syllabus for Pass Course candidates for 3-year Degree Course (published in 1963)

PHILOSOPHY

Paper I

(Full marks—50)

General Philosophy—Indian

Basic Features of Indian Philosophy: Schools of Indian Philosophy and their Development. The Common Characters of the Indian Systems.

Outlines of three systems of Indian Philosophy to be selected by the Board from time to time.

For the present—The Buddha, Nyāya and Vais'eṣika systems.

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং
নাল্পে সুখমস্তি।
যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ
যদল্পং তন্মর্ত্যম্॥

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, চিন্তা ও মননের জগতে তাহার অবদানে। রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নতির পিছনেও থাকে মননশীলতার পরিচালনা। ইংরেজ বা রুশ বা ফরাসীজাতি শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সভ্যতার বহিরঙ্গ-প্রকাশেই বিশিষ্ট নয়—তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তা, শিল্পবোধ ও সুশৃংখল মননও উল্লেখযোগ্য।

মাক্স্ মুয়েল্যের (Max Müller) বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক ভারতবাসী জাত-দার্শনিক। বাস্তবিক পক্ষে, আর কোন দেশেই বোধ হয় বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তার পরিণত ফল এমন করিয়া দেশের জনসাধারণের নিম্নতম স্তরেও ছড়াইয়া পড়ে নাই। অশিক্ষিত গ্রামবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাত্রা বেদান্তের মায়াবাদ দ্বারা প্রভাবিত। অক্ষরবোধবর্জিতা গ্রাম্য রমণীও জানে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের পার্থক্য। বাংলাদেশের বাউল গাহিয়াছে—

তোরই ভিতর অতল সাগর !
মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই ॥

আবার,

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি, যার নিত্যলীলা চমৎকার ?

... .

কারে গুরু বলে প্রণাম করবি মন ?
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন
কারে গুরু বলে প্রণাম করবি মন ?

অথবা, মধ্যযুগের নিরক্ষর সাধক রজ্জব বলিয়াছিলেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচ কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ ॥

সব সত্যের সঙ্গে যাহা মেলে তাই সত্য, যাহা মিলিল না তাহা মিথ্যা; রজ্জব বলিতেছে, এই কথাই খাঁটি—ইহাতে তুমি খুশীই হও, আর রাগই কর।

এমন গভীরতম ভাবের কথা, নিবিড় অনুভূতির কথা, ভারতবর্ষের দেহাতী মানুষও অতি সহজেই অন্তর দিয়া বুঝিয়া নেয়,—তাহার কারণ ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী ভারতের এই অগণিত জনসাধারণ। বাস্তবিক, দার্শনিক চিন্তায় ভারতবর্ষের মানুষের জন্মগত অধিকার।

অধ্যাত্মচিন্তা ভারতের বৈশিষ্ট্য, ইহা হইতে এমন ধারণা করা ভুল হইবে যে, ভারতবর্ষে শুধু তপোবন ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই ছিল। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে কৃষিকর্ম, শিল্পচর্চা, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও জীবনকে সমগ্রভাবে ও সুন্দর ভাবে ভোগ করিবারও কোন আয়োজনের অভাব ছিল না। মুণ্ডকোপনিষদে পরা ও অপরা

পরা ও অপরা বিদ্যা

এই দুই প্রকার বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদেরা বলেন, এই দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য, পরা ও অপরা। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ইহারা অপরা বিদ্যা; পক্ষান্তরে সেই অক্ষরপুরুষকে জানা যায় যে বিদ্যার সাহায্যে, তাহাই পরা বিদ্যা।"[১] চতুঃষষ্টিকলার চর্চা তখন ছিল। সবল সুস্থ, প্রাণবান ও তীক্ষ্ণ ধীমান জাতির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহারা জীবন হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহেন নাই। জীবনে দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু তাহাকে জয়ের মধ্যেই তো পৌরুষ। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরাজয়ের নয়, জয়ের ও জীবনেব। তাঁহারা ইহা জানিতেন যে, সমস্ত অপরা বিদ্যারও শেষ উদ্দেশ্য সেই পরমপুরুষকে জানা। কিন্তু তাই বলিয়া এই সাংসারিক জীবন, তাহার সম্ভোগ ও কর্তব্যকে তাঁহারা অবহেলা করেন নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাই দেখিতে পাই, দেবতার কাছে এই অসঙ্কোচ প্রার্থনা—রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিশো জহি। "ঋষিরা এই সুন্দরী পৃথিবীতে মরিতে চাহেন নাই। তাহারা মানুষের মাঝে মানুষের মত বাঁচিতে চাহিয়াছেন। বশিষ্ঠ এই জননী বসুন্ধরার ধনসম্পদকে সহস্র ধারায় দোহন করিতে চাহিয়াছেন। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—কৌশল শিখিবার জন্য, যে কৌশলে এই পৃথিবীরূপ গাভীকে দোহন করা যায়।"[২]

বেদের সর্বত্র প্রাণের আবেগ। আমাদের পিতৃপিতামহ একশত শরৎ বাঁচিবার মতো বাঁচিতে চাহিয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সমস্ত সত্ত্বা দিয়া তাঁহারা এই

১। মুণ্ডকোপনিষৎ—১, ১, ৪-৫

২। মতিলাল দাশ—বেদের কথা (ভারত সংস্কৃতি)

পৃথিবীকে অপ্রমত্ত হইয়া ভোগ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের কামনা ছিল স্বস্তির, শান্তির ও অভয়ের :

অভয়ং ন করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু ॥[৩]

"অন্তরীক্ষ দিক অভয়, দ্যৌ-পৃথিবী উভয়কেই দান করুন ভয়হীন শান্তি। আমরা যেন সম্মুখে-পিছনে, উপরে-নিচে সবদিকেই বরাভয় লাভ করি।"

কিন্তু এই অভয় অলস, নির্বীর্য ও উদাসীনের জন্য নয়। ইহা উদ্যমের দ্বারা, শুভকর্মের দ্বারা, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। দুঃখদুর্গম কষ্টকঠোর কর্মের পথেই মানুষ প্রতিষ্ঠা, শ্রী ও শান্তি অর্জন করে। যে পথ চলে, সে-ই পায় কল্যাণ, যে কঠিন সংগ্রামে জয়লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করে, সার্থকতা তো তাহারই জীবনে আসে। যে বীর, যে যুদ্ধ করে, বিভূতি তাহারই।

কিন্তু সুস্থ মানুষ তো শুধু ভোগের কথাই ভাবে না। বুদ্ধিমান মানুষ জানে, ভোগের সঙ্গে ত্যাগ অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা। শুধু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ভোগের উপদেশ কোথাও নাই। সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোগ, সমাজের কল্যাণার্থ। "তাহারা মঙ্গল ভাবিবে, মঙ্গল চাহিবে এবং মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিবে। তাহারা কল্যাণমার্গে চলিবে"— তাহাদের প্রার্থনা হইবে :

ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংস স্তনূভি
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

"হে দেবগণ! আমরা কর্ণে শুনিব কল্যাণময়ী বাণী, হে যজনীয়গণ! আমরা চক্ষু দিয়া দেখিব সুভদ্র কল্যাণময় দৃশ্য। অচঞ্চল, দৃঢ় বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়া আমরা পরমাত্মার পূজা করিব—আমরা জগদ্ধিতের জন্যই জীবন যাপন করিব। কল্যাণময় যে ঋত জগৎসংসার বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সেই ঋতের পালক হইব।"

এই জীবনকে প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন যজ্ঞ। জীবনের যাহা কিছু বিশেষ ঘটনা—জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন বিবাহ সর্বত্রই যজ্ঞ। ঋষির কণ্ঠে প্রার্থনা—

প্রাচীন যজ্ঞধারণা

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং
প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম।

৩। অথর্ববেদ—১৯।১৫।৫

শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্।
যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাং
প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম
স্বর্দেব অগন্মামৃতা অভূম॥

"আমাদের জীবন যজ্ঞের জন্য নিবেদিত হউক। প্রাণ যজ্ঞের জন্য উৎসৃজিত হউক। আমাদের চোখ, কান, পিঠ যজ্ঞের জন্য সামর্থ্যলাভ করুক। জীবন এক বৃহৎ যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হউক। আমরা হইব পরমাত্মার পরমপ্রিয় সন্তান। হে দেবগণ! স্বর্গ হইতে তোমরা এস—আমরা অমৃতত্ব লাভ করিব।"[৪]

ভারতীয় দর্শন শুধুই হিন্দুর অধ্যাত্মচিন্তা, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। ভারতের এই পুণ্যতীর্থে কত মানুষের ধারা আসিয়া মিলিয়াছে—'শক হুন দল, পাঠান মোগল, একদেহে হোল লীন'। আর্য, অনার্য, আস্তিক, নাস্তিক, ঈশ্বর, নিরীশ্বর, চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, পাশুপত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা-বেদান্ত ইত্যাদি কত চিন্তা ও মননের বারি সিঞ্চনে ভারতের চিত্তভূমি উর্বরা হইয়াছে। এই পুণ্য ভারত-ভূমিতে যে সব ধর্ম ও মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারা সকলেই ভারতীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। চিন্তাজগতে ভারতবর্ষ সকলকেই সাদর আহ্বান জানাইয়াছে—কাহারও পথ রুদ্ধ করে নাই, কাহারও উপর নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, আচার বা বিশ্বাস চাপাইয়া দেয় নাই। 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' এমন উদাহরণ আর কোথায়ও মিলিবে না। কিন্তু আশ্চর্য মনে হয়, চিন্তার স্বাধীনতা বিষয়ে যে ভারতবর্ষ এত উদার, সামাজিক আচার-আচরণে সেই দেশের দৃষ্টিভঙ্গী এত সংকীর্ণ!

ভারতীয় দর্শন শুধুমাত্র হিন্দুর অধ্যাত্মচিন্তা নহে

ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা নাই। ভারত সমস্ত জীবনকে এক অখণ্ড সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। তাই ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি-বিষয়ক চিন্তা পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। ভারতীয় দর্শন তাই শুধুমাত্র বুদ্ধির অনুশীলন, প্রয়োগ ও পরিতৃপ্তি নয়। 'দর্শন' কথাটি আমরা ইংরাজী 'Philosophy'র সমার্থবাচক বলিয়া ব্যবহার করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, এই কথা দু'টি সম্পূর্ণ-রূপে এক নয়। দুইয়েরই উদ্দেশ্য পরম সত্যের অনুসন্ধান; কিন্তু ইয়োরোপে Philosophy হইতেছে শুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে

দার্শনিক চিন্তা ও প্রাত্যহিক জীবন

৪। মতিলাল দাশ—বেদের কথা, পৃঃ ২৭

কঠোর যুক্তিবিচার দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি। ইহা নিতান্তই বুদ্ধিনির্ভর। কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় 'দর্শন' অর্থ হইল ঋষি দ্বারা সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ইহা সাধনার বস্তু, শুধুই বুদ্ধি- ও বিচারগ্রাহ্য নয়। বরঞ্চ, অনেক স্থানেই ইহা বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের পথে বা বিচারের পথে সত্যের সাক্ষাৎকার মিলে না। ইন্দ্রিয়ের সংযম, দেহের শুচিতা, আত্মশাসন, বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা ঋষিপ্রবর্তিত পথ অনুসরণ করিলেই, দৈবকৃপার ফলে, সত্যের দর্শন মিলে—তখন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।[৫]

সেই পরম সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ কবিলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত ভোগবাসনার অবসান হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং সাধকের সমস্ত কর্ম ক্ষয় হইয়া তাহার মুক্তি ঘটে। সমগ্র জীবনের সাধনার সহিত এই সত্যদৃষ্টি যুক্ত, তাই ইহাকে বলা হইল সম্যগ্‌দর্শন। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে যে, এই সম্যগ্‌দর্শন লাভে কর্ম সাধককে আর বদ্ধ করে না, আর যে হতভাগ্যের এই সম্যগ্‌দৃষ্টি লাভ হইল না সে, পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবর্তিত হয়।[৬]

সম্যগ্‌দর্শনের ধারণা

ভারতবর্ষে দার্শনিক মতগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধির পরিতৃপ্তির জন্য নয়, তাহারা জীবনে অনুশীলন ও প্রতিফলনেরও বিষয়। সেই জন্যই বিভিন্ন দার্শনিক মত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ-বিশ্বাসে প্রতিফলিত এবং জীবনে অনুশীলিত। তাই ভারতবর্ষে পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রত্যেকে নিজ নিজ আচার-প্রথা-বিশ্বাস নিয়া শান্তিতে সহাবস্থান করিয়াছে। একই কারণে সাংখ্য, ন্যায়, বেদান্ত ইত্যাদি দার্শনিক মতবাদীরাও এক একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহাদের মূল বিশ্বাসকে নিজ জীবনে আচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনির মধ্য দিয়া বিশিষ্ট মতগুলিকে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের যেমন মঠ-আশ্রম আছে, তেমনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদেরও পৃথক মঠ, মন্দির, আশ্রম আছে ; শৈবদের পৃথক দেবমন্দির, আরাধনা, শাস্ত্রচর্চা আছে, আবার তেমনি বৈষ্ণবদেরও আছে নিজ নিজ উৎসব, পূজা, নিজ নিজ মতামত চর্চা ও আলোচনার নানা ব্যবস্থা। ইহার ফলে ভারতের বিভিন্ন মতবাদগুলি, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও, এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধতা ও অবহেলা সত্ত্বেও তাহাদের

ভারতীয় দর্শন জীবন-আশ্রয়ী

৫। মুণ্ডকোপনিষৎ—২, ২, ৮
৬। সম্যগ্‌দর্শন সম্পন্নঃ কর্মভির্ণনিবধ্যতে
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারম্ প্রতিপদ্যতে—মনুসংহিতা ৬, ৭৪

প্রাণশক্তি সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলে নাই, এবং প্রাচীন ভারতের চিন্তা ও ঐতিহ্যকে বহন করিয়া আমাদের উত্তর পুরুষদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কাজেই তাহারা অবজ্ঞা ও অবহেলার বস্তু নয়। বরঞ্চ নূতন ভাবধারা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যময় প্রাণশক্তির সহিত সেই প্রাচীন চিন্তার সমন্বয় ঘটাইয়া তাহাদের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব আমাদের, একথা যেন আমরা না ভুলি। সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণই ভারতীয় সাধনার মূল সাধনা। "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া, তাহার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[৭] বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতার অসহিষ্ণুতা ও উত্তাপের মধ্যে বারে বারে ভারতবর্ষের এই আন্তরিক ঐক্যসাধনাকে যেন আমরা স্মরণ করি।

ভারতের দার্শনিক চিন্তায় বেদের স্থান

ভারতের সমস্ত চিন্তার আকরগ্রন্থ হইতেছে বেদ। ভারতের বুকে যত ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছে, সকলের মূল হইতেছে বেদ। ইহাতে অতি উচ্চ অধ্যাত্মচিন্তার যেমন বীজ রহিয়াছে, তেমনি অতি নিকৃষ্ট মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক্, মারণ-উচাটন ইত্যাদি পদ্ধতিরও ইঙ্গিত আছে। তাই ইহাতে বহু বিরুদ্ধ উপাদান একাকার হইয়া মিশিয়া আছে। চতুর্বেদ নিশ্চয়ই একই কালে রচিত হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট চিহ্ন বেদে বর্তমান। বেদ চারিখানি—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। যজুর্বেদ আবার দুইখানি—শুক্ল ও কৃষ্ণ। মাক্স্ মুয়েল্যের-এর মতে, বেদরচনায় চারিটি পর্যায় আছে—ছন্দযুগ, যখন বিক্ষিপ্তভাবে মন্ত্র রচনা হইত; তাহার পর মন্ত্রযুগ, যখন বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি সংহিতায় পরিণত হয়; তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর সূত্র। প্রত্যেক পর্যায়ে দুইশত বৎসর ধরিয়া তিনি বেদরচনার সময়কে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধান্ত করেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভিন্টারনিট্জ্ অবশ্য এই মতকে নিতান্তই কাল্পনিক ও অগ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন।[৮] মহামান্য তিলকের মতে ৬০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে

বেদের স্থান

চতুর্বেদ

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ ও সমাজ

৮। "Max Müller's hypothetical and really arbitrary determination of the Vedic epochs". Winternitz

২৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত বেদ রচিত হইয়াছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে বেদের রচনাকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ সালের পূর্বে নয়। যাহা হউক, এই বিতর্কমূলক বিষয়, আমাদের আলোচ্য নয়।

ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে বেদের মর্যাদা অসামান্য। ভারতীয় দর্শনকে আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই দলে ভাগ করা হয়। ভারতীয় দর্শনে তাঁহাদিগকেই আস্তিক বলা হয়, যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করেন। বেদ মনুষ্যসৃষ্ট নয়—বেদবাক্য তাই স্বতঃপ্রমাণিত। বেদবাক্য স্মৃতিগ্রাহ্য নয়, বেদবাক্য আচার নয়, বেদবাক্য সমস্ত প্রমাণের ঊর্ধ্বে।

বেদ ও আস্তিক দর্শন

সুপরিচিত ষড়দর্শন, যথা মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য-যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক ইহারা আস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই। মীমাংসা বা সাংখ্য জগৎস্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না, কিন্তু বেদের অপৌরুষেয়তা তাঁহারা স্বীকার করেন—কাজেই তাহারা নিরীশ্বর হইয়াও আস্তিক।[১]

নাস্তিক দর্শন বলিতে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন ও অন্যান্য জড়বাদী মতবাদকে বোঝায়। ইঁহারা কেহই বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা স্বীকার করেন না। অবশ্য এই দর্শনগুলি ঈশ্বর স্বীকার করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। ইঁহারা তাই নাস্তিকও বটে, নিরীশ্বরও বটে।

নাস্তিক দর্শন

আস্তিকই হোক্ আর নাস্তিকই হোক্, ভারতীয় কোন চিন্তাই বেদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে না। হয় গঠনাত্মকভাবে, না হয় নেতিমূলকভাবে সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক মতবাদই বেদের দ্বারা প্রভাবিত। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মত বেদের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়া, তবে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

উভয়বিধ দর্শনই বেদ-প্রভাবিত

মীমাংসা ও বেদান্ত তো বৈদিক চিন্তারই অনুসরণ করিয়াছেন। মীমাংসায় বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দার্শনিক প্রমাণ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। অন্যদিকে বেদান্ত বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা অধ্যাত্মচিন্তার সুশৃংখল প্রকাশ। মীমাংসা ও বেদান্ত বেদবাক্যকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার সমর্থনে অন্য যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যদিকে সাংখ্য-যোগ এবং ন্যায়-বৈশেষিক, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ভিত্তিতে যাহা প্রমাণিত, তাহা যে বেদানুযায়ীও বটে, তাহাই দেখাইয়াছেন। আস্তিক্যবাদীরা কেহই বেদবিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই।

ভারতীয় চিন্তায় বেদের এই বিপুল মর্যাদা ও বেদবিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া, অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতীয় দর্শনে

১। Chatterjee & Dutt—An Introduction to Indian Philosophy, P.5

স্বাধীন চিন্তার স্থান নাই, তাহা dogmatic। ইয়োরোপের মধ্যযুগেও দার্শনিক চিন্তা তাহাদের ধর্মশাস্ত্রকে সর্বাংশে অনুসরণ করিত। যাহা বাইবেলের ব্যাখ্যাতা পুরোহিততন্ত্রের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধী, তাহা কঠোর নিন্দালাভ করিত এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি নৃশংস উৎপীড়ন অতিশয় পুণ্যকার্য বলিয়াই গণ্য হইত। এমন কি অবিশ্বাসীদের (heretics) পুড়াইয়া মারার দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না।

আস্তিক্যবাদীরা যথা মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য-যোগ ও ন্যায়-বৈশেষিক বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কখনও করেন নাই তাহা সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষে চিন্তার কদাচ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই এবং নাস্তিক্যবাদী চার্বাক, বৌদ্ধ বা জৈন মতাবলম্বীদের নিন্দা করা হইলেও, তাহাদের পুড়াইয়া মারিবার কথা কেহ চিন্তা করে নাই। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের সংকীর্ণ অসহিষ্ণুতার সহিত ভারতের আধুনিক কালের বর্বর সাম্প্রদায়িক নৃশংসতারই শুধু তুলনা হইতে পারে। এমন কি, যাঁহারা আস্তিক্যবাদী, তাঁহারাও কেবলমাত্র বেদবাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বেদবাক্যের সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ, অনুমান, বা উপমান-ভিত্তিক প্রমাণ দিয়াছেন। মাক্স্ মূয়েল্যেব ভারতীয় দর্শনের দুইটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ প্রশংসাযোগ্য মনে করিয়াছেন: (১) প্রত্যেক প্রস্থানই নিজ নিজ মতবাদকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ নিজ মতের ফলাফলও তাঁহারা নির্বিচারে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। সত্যকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়াছেন। (২) প্রত্যেক ভারতীয় দর্শনই, প্রথমতঃ কি করিয়া আমরা জানি, কাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তবেই দার্শনিক চিন্তায় রত হইয়াছেন।[১০]

১০। There is one thing which we cannot help admiring, and that is the straight-forwardness and perfect freedom with which they are elaborated. However imperfect the style in which their theories have been clothed may appear from a literary point of view, it seems to me the very perfection for the treatment of philosophy. It never leaves us in any doubt as to the exact opinions held by each philosopher...we can always appreciate the perfect freedom, freshness and downrightness with which the searcher after truth follows his track without ever looking right or left.

It has sometimes been said, that Hindu philosophy asserts, but does not prove, that it is positive throughout, but not argumentative. This may be true to a certain extent and particularly with regard to the Vedanta-philosophy, but we must remember that almost the first question which everyone of the Hindu systems of philosophy tries to settle is, How do we know? In thus giving the Noetics the first place, the thinkers of the East seems to me...superior to most of the philosophers of the West. Max Müller—Six Systems of Indian Philosophy, Preface, xii-xiii

ভারতীয় চিন্তায় বেদের এই অসামান্য প্রতিষ্ঠার কারণ কি ?

বেদের রচয়িতা ঋষি আছেন, অথচ বেদকে অপৌরুষেয় বলি কেন ? তাহার অর্থ, বেদ সাধারণভাবে লভ্য নয় ; এই আত্মবিদ্যা, এই জ্ঞান বোধির দ্বারা প্রাপ্য—সত্যদ্রষ্টা যাঁহারা, তাঁহারাই ইহা জানিতে পারেন, তাঁহারা ইহা ভাবিতে পারেন। নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অধিকারী ঋষিদের জ্ঞানদীপ্ত চিত্তে বেদ প্রতিভাসিত হইয়াছিল, তাই বেদ শ্রুতি।[১১] তাই বেদ অনন্য।

বেদ-বিদ্যার বৈশিষ্ট্য

প্রাত্যহিক জীবনের সত্য লাভের উপায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান, কিন্তু পরম সত্যকে আবিষ্কারে ইহারা অসমর্থ। ইহার জন্য চাই ঋষিদৃষ্টি। যাঁহারা তপশ্চর্যা ও সাধনার দ্বারা সেই উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শুধু সেই পরম সত্যকে দর্শন করেন, তাঁহারাই কেবলমাত্র সেই সত্যোপলব্ধির পথ অন্যকে দেখাইতে পারেন। বেদ-রচয়িতা ঋষিদের তাই এত অসামান্য সম্মান। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়াই শুধুমাত্র সেই পথের সত্যতা প্রমাণ করা যায়। ইহা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতালভ্য নয়। দর্শন-ধন্য ঋষিদের অধ্যাত্ম সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা বেদে প্রচারিত, তাই তাহা অন্য সমস্ত প্রমাণ হইতে শ্রেষ্ঠ। বেদের প্রমাণ অন্য সমস্ত প্রমাণের আশ্রয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মূল্য ততক্ষণই, যতক্ষণ ইহা ঋষি-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা ঋষির আন্তরিক উপলব্ধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। নাস্তিক্যবাদীরা অবশ্য সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকেই যথেষ্ট মূল্য দিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরাও তাঁহাদের ধর্মের মহাপুরুষদের বাক্যকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা উচ্চতর মূল্য দিয়াছেন। এক চার্বাকই এমন দুঃসাহসের কথা বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। এমন কি অনুমানকেও তিনি প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন-মত প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে মূল্যবান মনে করিয়াছেন। এবং বেদবাক্যকেও অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা বেদকে কখনও অতিক্রম করেন নাই।[১২] ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতীয় দর্শনে অনুমানকে অনুশাসনের বন্ধনে পঙ্গু করিয়া রাখা হয় নাই। ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্ত্য অর্থে 'ডগ্‌ম্যাটিক্‌' নয়।

১১। ভারত সংস্কৃতি—প্রবন্ধ : বেদের কথা, পৃঃ ২৩

১২। Indian Philosophy is based on logical reason subordinate to the authority of the Vedas which are believed to embody the intuitions of the seers of truth. The authority of the Vedas is that of intuition. Logical

অধিকারবাদ ও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের ঐক্য

প্রত্যেক মানুষ তাহার শক্তি, রুচি, প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক। পৃথিবীর সর্বপ্রকার দ্রব্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ দ্বারা গঠিত।

মানব প্রকৃতির আত্যন্তিক প্রভেদ

সত্ত্বের ধর্ম প্রকাশ, লঘুতা, শুচিতা, আনন্দ ইত্যাদি; রজের ধর্ম সক্রিয়তা, বল, বীর্য, উদ্যম, দুঃখ; তমের ধর্ম আচ্ছন্নতা গুরুত্ব, মোহ, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান। সেই অনুযায়ী তাহাদের প্রকৃতির প্রভেদ। যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা রজোগুণ-প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; আর যাঁহারা তমোগুণ-প্রধান, তাঁহারা শূদ্র। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার জ্ঞানের বিষয়ও বিভিন্ন। প্রত্যেকেব প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার মুক্তির পথও ভিন্ন। বেদাধ্যয়ন সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত। তাই কেবল মাত্র শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণেরই অধিকার শাস্ত্রচর্চায়; শূদ্রের

ভারতীয় দর্শন ও মোক্ষ

বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, কারণ তমোগুণ-প্রধান প্রকৃতি এই অধ্যয়নের ফলগ্রহণে অসমর্থ। চার বৎসরের বালককে এক মণ বোঝা তুলিতে দেওয়া হয় না। ইহা তাহাবই হিতের জন্য। ইহাতে অপমানের কথা কিছু নাই। প্রাচীন ভারতে মানুষ সহজেই এই কথা মানিয়া নিয়াছিল যে, সকলের জন্য একই ব্যবস্থা উপযোগী হইতে পারে না। গীতাতে তাই শ্রীভগবানের উপদেশ: "বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ"। প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের বিভিন্ন সংস্কার। সেই সংস্কার বা বিশ্বাস জোর করিয়া পরিবর্তন করা উচিত নয়। বিদ্যাগ্রহণ যান্ত্রিক একটি পদ্ধতি নয়। শ্রদ্ধা-দ্বারা নিজেকে বিদ্যাগ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়া তবেই বিদ্যাগ্রহণ সার্থক। এখানে গণতন্ত্রের দাবি নিরর্থক। ভারতীয় সমস্ত প্রস্থানের উদ্দেশ্য হইতেছে, মোক্ষলাভ। বিভিন্ন দার্শনিক পথ বিভিন্ন প্রকৃতিব মানুষের জন্য পৃথক পৃথক মোক্ষলাভের পথ। ভারতীয় দৃষ্টিতে স্থূল জড়বাদী চার্বাক মত হইতে শুরু করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদী অদ্বৈত বেদান্ত পর্যন্ত একটি অনবচ্ছিন্ন ঐক্যের সূত্র বর্তমান। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, কিন্তু তাহারা মানুষের প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করিয়াছে। সর্ব-দর্শন-সংগ্রহে বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক মতেব ইতিহাস আলোচনাকালে শ্রীমাধবাচার্য এই

---

reason is subordinate to intuition. So Indian philosophy is based on rational speculation in harmony with the Vedas and consciously aims at achieving the highest perfection (moksha) attainable in human life. Jadunath Sinha—Outlines of Indian Philosophy, P. 1

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন দার্শনিক মতকে বিন্যাস করিয়াছেন। চার্বাকের জড়বাদ তমোগুণ-প্রধান অবিকশিত-বুদ্ধি সংসারী সাধারণ লোকের উপযোগী, কিন্তু সত্ত্বগুণ-প্রধান তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন সংযত মানুষের জন্যই শুধু ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠফল, বিশুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তবাদ।[১৩]

ভারতীয় দর্শনের বিষয়বস্তু ও আলোচনার পদ্ধতি

ভারতীয় দর্শনের বিষয়বস্তু হইল, মোক্ষলাভের উপায়নির্দেশ। ইহাই মনুষ্যজীবনের পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম মানুষের জীবনে কাম্য, কিন্তু মানবজীবনের শেষ উদ্দেশ্য হইল, মোক্ষলাভ। ভারতীয় দর্শন শুধু মাত্র বুদ্ধির তৃপ্তি নয়, তাহা জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সাধনের উপায়। মোক্ষলাভ করিতে হইলে চাই, অজ্ঞানতার ও মোহের বিদূরণ এবং সত্যের সাক্ষাৎকার। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান (different schools) হইতেছে সত্যের অনুসন্ধানের বিভিন্ন পথ।

মোক্ষলাভের পথ

ভারতীয় দার্শনিক জানেন সত্যলাভের একটি মাত্র পাকা বাঁধানো সড়ক নাই। ভারতীয় দার্শনিক বিরুদ্ধ মতকে উপেক্ষা করেন না, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহাদের বিবেচনা করেন। শান্ত ভাবে, কঠিন যুক্তি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা, তাঁহারা প্রত্যেকটি প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রথমে খণ্ডন করিয়া, সর্বশেষ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই হইল উত্তরপক্ষের সিদ্ধান্ত। পরমতসহিষ্ণুতা-সঞ্জাত আলোচনার পদ্ধতি ভারতীয় দর্শনকে একটি সম্পূর্ণতা ও ঐক্য দিয়াছে, যাহা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে দেখা যায় না। ভারতীয় দর্শনে প্রত্যেকটি প্রস্থান বিপরীত অন্য সমস্ত প্রস্থানের যুক্তিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করে, খণ্ডন করে এবং তাহার পরই কেবল নিজ মত প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। সুতরাং প্রত্যেক মতই অন্য মত হইতে পুষ্টি ও তেজ আহরণ করে।

বিরুদ্ধ মত শ্রদ্ধেয়

ভারতীয় দর্শনের আলোচনার আর একটি পদ্ধতিও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় দার্শনিক আলোচনায় প্রত্যেক সমস্যাকেই সমগ্রভাবে সমস্ত দিক হইতে

১৩। The many systems of philosophy beginning from the materialism of the Carvaka school and ending with the Vedanta of Sankara were thus conceived to offer different paths of philosophical thinking and living, to persons of differing qualifications and temperaments. Chatterjee & Dutta—An Introduction to Indian Philosophy. P. 12

আলোচনা করা হয়, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মতো প্রত্যেক সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, এক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা হয় না। ইহাই পাশ্চাত্ত্যের বিশ্লেষণমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যথা, কেহ বা জীবনকে দেখিতেছেন ইহার জড় উপাদানের দিক হইতে, কেউ কেউ ইহাকে দেখিলেন জীবতত্ত্বের দিক হইতে, আবার কেহ বা দেখিলেন মনস্তত্ত্বের দিক হইতে। ভারতীয় দার্শনিক আলোচনায় মনস্তত্ত্ব (psychology), জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology), অধিবিদ্যা (metaphysics), সমাজতত্ত্ব পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হইয়া নাই। ভারতীয় দর্শনে সমস্ত আলোচনাই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে। ভারতীয় পণ্ডিত জ্ঞানকে জীবন হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখেন নাই। সত্যের অনুসরণ তাঁহার কাছে বুদ্ধির বিলাস নয়, তাহা জীবন-সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। তিনি বলিয়াছেন, সত্যজ্ঞানের দ্বারা আত্মোপলব্ধিই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন :

সমস্যার সামগ্রিক ও সম্যক্ আলোচনা

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য থাকিলেও, তাহাদের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে :

(১) ভারতীয় দর্শনের মূল সমস্যা হইল, দুঃখের আত্যন্তিক অবসান। জীবন দুঃখময়—এমন জীবন নাই, যাহা কখনো না-কখনো দুঃখের তাপে মলিন হয় নাই। প্রত্যেকের জীবনে রোগ আছে, বার্ধক্য আছে, মৃত্যু আছে। আমাদের দুঃখ এই যে :

> 'আমি যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই,
> যাহা পাই, তাহা চাই না।'

আমাদের দুঃখ অপ্রিয়-সংযোগের এবং প্রিয়জন-বিরহের। তাহা ছাড়া, এই সংসারচক্রের বন্ধন, বারে বারে পৃথিবীতে জন্ম ও মরণের দুঃখ, কাহারও তো এড়াইবার উপায় নাই। চার্বাক অবশ্য জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই জীবন যে দুঃখের আকর, তাহা তিনিও মানিয়াছেন এবং এই দুঃখের বিশ্বঘেরা জাল এড়াইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন—"এই জীবনের যে সুখ হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা আকণ্ঠ ভোগ করিয়া লও। পশ্চাতে তাকাইও না, সম্মুখে তাকাইও না। প্রতিমুহূর্তে যে সুখের সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিয়া লও, কারণ এই জন্মের পরে স্বর্গও নাই নরকও নাই।" বুদ্ধদেব বলিলেন—

দুঃখ ও তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি

"জীবন দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, প্রিয়জন-বিরহ দুঃখ।"[১৪] তিনি চারিটী 'আর্য সত্য' প্রচার করিয়াছেন: (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের অবসান আছে, এবং (৪) দুঃখ নিরোধের পথ আছে। জীবনের উদ্দেশ্য হইল নির্বাণলাভ— তখন সকল দুঃখের অবসান।

বৌদ্ধ দর্শনের মূল সমস্যা যেমন দুঃখ, সাংখ্য দর্শনেরও তাই। সাংখ্য কারিকার প্রথম শ্লোক হইতেছে—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসাতদভিঘাতকে হেতৌঃ
দৃষ্টে সাপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥[১৫]

ত্রিবিধ দুঃখ

জীবনে আছে ত্রিবিধ দুঃখ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক হইতেছে—ভূত সকল হইতে উৎপদ্যমান ক্লেশসমূহ। অন্য মানুষ, হিংস্র প্রাণী, সর্প, কুম্ভীর ইত্যাদি প্রাণী মানুষের অনেক দুঃখের কারণ। আধিদৈবিক দুঃখ হইতেছে দেবতা হইতে উৎপন্ন— যথা শীত, বর্ষা, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক দুঃখ হইল নিজ দেহ বা মনের বিকারজনিত নানা দুঃখ। সমস্ত দর্শনের জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কি করিয়া এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটানো যায়। চিকিৎসকের দ্বারা রোগের দুঃখ সাময়িকভাবে উপশম হইতে পারে; বন্য জন্তুর উৎসাদন দ্বারা তাহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে; সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা ও কঠোর শাসন দ্বারা মানুষের উৎপীড়ন কতকটা রোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার কোন উপায়েই ত্রিতাপ-জ্বালা সম্পূর্ণ জুড়াইবার উপায় নাই। ভারতীয় দর্শনের সমস্ত প্রস্থানেরই মত হইতেছে যে, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারাই কেবলমাত্র সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটানো যায়। কি করিয়া সেই সত্যজ্ঞান লাভ করা যায়, ইহাই সমস্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয়।

দুঃখই যখন সমস্ত ভারতীয় দর্শনের মূল, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই সমালোচনা সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী

১৪। গৌতম—ন্যায়সূত্র ১,১,২
[Ecclesiastes-এর লেখকের মতো তাঁহারা বলেন নাই: And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit for in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.]

১৫। ঈশ্বরকৃষ্ণ—সাংখ্য কারিকা, ১

(Indian philosophy is pessimistic)। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য pessimism এবং ভারতীয় দর্শনের দুঃখবাদ এক নয়। পাশ্চাত্ত্য দুঃখবাদী সোপেনহাউয়ের বা হার্ডি-র মতো পণ্ডিতেরা বলেন যে, এক অদৃশ্য প্রতিকূল শক্তি মানুষের সুখ ধ্বংস করিবার জন্য সদা উদ্যত। এ অশুভ অন্ধ অ-নৈতিক শক্তির উপর মানুষের কোন প্রভাব নাই। তাহার আঘাত অনিবার্য। গ্রীক ট্র্যাজেডীর রচয়িতারা বিশ্বাস করিতেন যে, দেবতারা মানুষের সুখ সহ্য করিতে পারেন না (gods are jealous)। এই অশুভ অদৃশ্য শক্তিকে তাঁহারা নাম দিয়াছেন অদৃষ্ট (Fate)। মানুষের পাপপুণ্যের সঙ্গে এই অদৃষ্টের মারের কোন নিয়ত সম্বন্ধ নাই।[১৬]

ভারতীয় দর্শন সাধারণ অর্থে দুঃখবাদী নহে

কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকের মতে অদৃষ্ট অন্ধ ও অযৌক্তিক নয়। অদৃষ্ট প্রত্যেক মানুষের নিজ কর্মফলেরই শুভাশুভ সৃষ্টির শক্তি। কোন অন্ধ অযৌক্তিক অদৃশ্য শক্তি মানুষকে দুঃখ দিয়া আনন্দ পায়, ইহা নিতান্ত শিশুসুলভ কল্পনা। মানুষ নিজ অনিয়ন্ত্রিত বাসনা-কামনার বশবর্তী হইয়া অন্যায় কর্ম করে, এবং নিজ কর্মফলই সে এ জন্মে বা পরজন্মে ভোগ করে। মানুষের এই দুঃখ চিরন্তনও নয়, অপ্রতিরোধ্যও নয়। দর্শন আলোচনার দ্বারা যখন তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইয়া মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিবে—যখন সে বুঝিতে পারিবে যে তাহার দেহ বা ইন্দ্রিয় তাহার আত্মাস্বরূপ নহে, তখনই সে অন্যায় কর্ম হইতে বিরত হইবে, মোক্ষলাভার্থ ব্যাকুল হইয়া জগতের মূল যে পরমপুরুষ তাহার আশ্রয়গ্রহণ করিবে, এবং তখন তাহার সমস্ত সঞ্চিত কর্মফল দগ্ধ হইয়া যাইবে এবং দুঃখের মূল চিরকালের জন্য উৎপাটিত হইবে। পাশ্চাত্ত্য দুঃখবাদ যুক্তিহীন, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের গভীর নৈতিক ভিত্তি আছে। পাশ্চাত্ত্য দুঃখবাদে দুঃখের কোন অন্ত নাই। কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় দুঃখই শেষ নয়; দুঃখকে অতিক্রম করিয়া আনন্দের রাজ্যে উত্তরণ সম্ভবপর। ভারতীয় দর্শন চরম সত্তাকে সৎ, চিৎ, আনন্দ-স্বরূপ বলিয়াই কল্পনা করিয়াছে। বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনে ব্রহ্ম- বা ঈশ্বর-স্বীকৃতি নাই, কিন্তু তাঁহাদেরও মতে জীবনের সাধনার শেষ পরিণতি যে নির্বাণ—তাহা একটি আনন্দময় অবস্থা। কাজেই এই উক্তি খুবই যুক্তিসঙ্গত যে দুঃখবাদ নিয়া ভারতীয় দর্শনের শুরু হইলেও,

অদৃষ্ট আপন আপন কর্মফলপ্রসূত

ভারতীয় দুঃখবাদের বৈশিষ্ট্য

১৬। Streams will not curb their pride,
The just man not to entomb,
Nor lightnings go aside
To give his virtues room
Nor is that wind less rough which blow a good man's barge

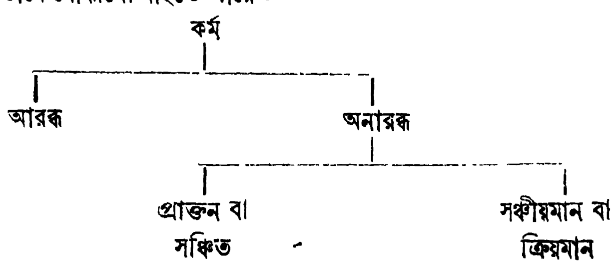
দুঃখবাদেই তাহার সমাপ্তি নয় (pessimism in Indian Philosophy is initial, but not final)।[১৭]

(২) ভারতীয় দর্শন জগতের নৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বাসী। সমস্ত বিশ্বজগৎ নৈতিক বিধিদ্বারা শাসিত। ঋগ্বেদে এই সর্বব্যাপী নৈতিক বিধিকে বলা হইয়াছে ঋত।[১৮] এ ঋতের শাসন কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। পরবর্তী কালে মীমাংসা দর্শনে এই বিশ্বাসই 'অপূর্ব'র ধারণায় পরিবর্তিত হইয়াছে। মীমাংসা মতে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অভ্রান্ত ভাবেই ভবিষ্যতে ফল উৎপন্ন করে। ন্যায়-বৈশেষিকে নৈতিক বিধির অভ্রান্ততায় বিশ্বাস 'অদৃষ্ট' রূপে কথিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মফল তাহাকে অনুসরণ করে। অদৃষ্ট রহস্যজনক অযৌক্তিক শক্তি নয়। ইহা নৈতিক বিধির অভ্রান্ত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ। এই বিশ্বাস সমস্ত নৈতিক জীবন ও ধর্মের মূল।[১৯]

জগৎ নৈতিক ভিত্তি-আশ্রয়ী

(৩) কর্মফলবাদে বিশ্বাস সমস্ত ভারতীয় দর্শনের আর একটি মূল ভিত্তি। যেমন বিনা কারণে ব্যক্তির জীবনে কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না, তেমনি কোন কর্মের ফলও ধ্বংস হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মের ফলদ্বারা আবদ্ধ। সমস্ত কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ ফলে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া, এই হিসাব-নিকাশের জের চলে। যে কর্মের ফলভোগ শুরু হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ কর্ম। এই প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বাধা দিতে পারেন না। তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। যে কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই তাহা অনারব্ধ। অনারব্ধ কর্ম আবার দুই প্রকারের : (ক) কতক কর্মফল পূর্ব পূর্বজন্মের কৃতকর্ম হইতে **সঞ্চিত**। এবং (খ) কতক হইতেছে যাহা এই জন্মেই **সঞ্চীয়মান** বা **ক্রিয়মান**। কাজেই সমস্ত কর্মের ভাগ ও উপবিভাগ এ ভাবে বোঝানো যাইতে পারে :

কর্মফলবাদে আস্থা



১৭। Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol.1, Pp. 49-50
১৮। Rig-Veda, 1.1.8, 1.23.5, 1.24.9 etc.
১৯। Spiritualism means the affirmation of an eternal moral order

জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য ও মীমাংসামতে কর্মফল স্বাধীন শক্তি। ইহা অন্য কোন ঊর্ধ্বতন শক্তিদ্বারা শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে অদৃষ্ট যখন অন্ধ অযৌক্তিক শক্তি নয়, তখন তাহা পরম চিৎশক্তি ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বরই কর্মফল বণ্টন করেন। তাঁহার বিচার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে।

কর্মের শ্রেণীকরণ

আর একভাবে কর্মের বিভাগ করা হয়—সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। যে কর্ম কোন বিশেষ ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া করা হয়, তাহা সকাম কর্ম। ভারতীয় দর্শনের মতে সকাম কর্মই সংসার-বন্ধনের হেতু। সকাম কর্মের ফল সঞ্চিত হয়। ইহাই জন্ম হইতে জন্মান্তরের কারণ। অন্য প্রকার কর্ম হইল নিষ্কাম কর্ম। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ কর্তব্যবুদ্ধিতে যে কর্ম করা হয়, তাহা নিষ্কাম কর্ম। কর্মের ফল নিঃশেষের যদি কোন উপায় না থাকিত, তবে জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী সংসারচক্র অনন্তকাল ধরিয়াই চলিত, মোক্ষ- বা মুক্তিলাভ অসম্ভব হইত। কিন্তু ভারতীয় দর্শন বিশ্বাস করে যখন মানুষ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় (গন্ধর্বলোক, স্বর্গলোক, দেবলোক ইত্যাদি স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত ফলপ্রাপ্তির আশায় নয়) কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম করে, তখন তাহা দ্বারা কোন বন্ধন সৃষ্টি হয় না। বরং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম করিলে সঞ্চিত কর্ম ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং নূতন কোন কর্ম সঞ্চীয়মান হয় না এবং ঈশ্বরানুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা নিষ্কাম কর্ম ও ভগবানে কর্মফল সমর্পণের উপদেশের সুপরিচিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ:

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥[২০]

২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২,৪৭-৫১

মানুষের কর্মেই অধিকার আছে, কর্ম-ফলে তাহার অধিকার নাই। যখন এই প্রতীতি জন্মে তখন, মানুষের সফলতা-নিষ্ফলতা বিষয়ে সমত্ব জ্ঞান আসে। ইহারই নাম যোগ। ইহাই কর্মবন্ধন ছেদনের কৌশল।

৫। ভারতীয় দর্শন বিশ্বাস করে যে, এই জগৎ কর্মক্ষেত্র—তপস্যার ক্ষেত্র। এই সংসারেই কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়া মোক্ষ বা মুক্তির জন্য সাধনা করিতে হয়। এই জগৎ অলীক নয়, মিথ্যা স্বপ্ন নয়। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক—সকলেই এ জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছে। অদ্বৈত বেদান্তই কেবল বলিয়াছেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু—জগৎ মায়া। কিন্তু মায়া অর্থ মিথ্যা ও অলীক স্বপ্ন নয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগতের সত্যতা স্বীকার না করিলেও, বেদান্ত সাংসারিক দৃষ্টিতে জগৎকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। যোগাচারবাদী বৌদ্ধরাই একমাত্র জগৎকে জ্ঞাতার ভাব মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, জ্ঞাতার চেতনার বাহিরে জগদ্বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই। তাঁহাদের মত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্কলে-র অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

কর্তব্যকর্ম সম্পাদন ও মোক্ষলাভ

এই জগৎ আকস্মিক ও বিশৃংখল নয়। যে ঋত (the rule of law) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালনা করিতেছে, তাহা এই জগৎকেও শাসন করে। দেশ, কাল, কার্য-কারণ বিধি এই বিশ্বব্যাপী ঋত-এরই প্রকাশ। জগৎ শুধু প্রাকৃতিক শক্তির শাসনাধীন নয়, ইহা নৈতিক বিধি দ্বারাও অনুশাসিত। প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন অমোঘ, নৈতিক বিধিও তেমনি অলংঘ্য। ইহাকেও বলা হইয়াছে অদৃষ্ট বা কর্মফল। এই জগতের সৃষ্টি, বিকাশ ও লয়ও ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত।

জগতে শৃংখলার রাজত্ব

৬। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানই সমস্ত বন্ধনের হেতু। সুতরাং ভারতীয় দর্শন সত্যজ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্তির সন্ধানকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মিথ্যাজ্ঞানই বন্ধনের হেতু

৭। সত্যজ্ঞানলাভ সাধনাসাপেক্ষ। ইহার জন্য দেহ-মনের উপযুক্ত প্রস্তুতি চাই। ব্রহ্মচর্য, সংযম, প্রাণায়াম, আসন ইত্যাদি সদভ্যাস গঠন দ্বারা দেহকে শুচি না করিলে, গুরুর নিকট হইতে সত্যজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে না। যোগদর্শনে এই প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তরের কথাই পুংখানুপুংখ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। দেহকে যেমন বিশুদ্ধ করিতে হইবে, মনকেও তেমনি প্রস্তুত করিতে হইবে—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা সত্যকে আত্মস্থ করিতে হইবে। যম, নিয়ম,

সত্যজ্ঞানলাভ সাধনাসাপেক্ষ

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যেমন দেহকে সুস্থ ও পবিত্র করিবার উপায়, তেমনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগযুক্ত হইবারও উপায়। ভারতীয় দর্শন জ্ঞানকে শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করে না। ইহা সমগ্র জীবনব্যাপী তপশ্চর্যার ফল। ভারতীয় দর্শন পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছে যে, বাসনা-কামনা-প্রবৃত্তিই সত্যদর্শনের পথে প্রবলতম বাধা। ভোগের দ্বারা কখনই প্রবৃত্তির অবসান হইতে পারে না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো প্রবৃত্তি ভোগের দ্বারা কেবলই বর্ধিত হয়।

ন জাতু কামঃ কামানমুপভোগেন সাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্ধতে ॥

তাই সমস্ত ভাবতীয় শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি-সংযমনের উপদেশ। আত্মসংযম দ্বারা সমাধিস্থ হইতে পারিলে তবেই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

৮। ভারতীয় সাধক জীবনের চরম সার্থকতা বাহিরে খোঁজেন নাই।

মনুষ্য জীবনেব সার্থকতা অন্তবের পরিপূর্ণতায়

মানুষের সুখ ও শান্তি উপকরণ সংগ্রহে নয়, সাংসারিক ঐশ্বর্য ও সম্পদ আহরণে নয়, তাহার অন্তরের পরিপূর্ণতায়। যোগদর্শনে এই আত্মস্থ হইবার উপদেশ।[২১]

ভারতীয় দর্শন বলিয়াছে সাংসারিক সুখ ও আরাম নয়—অমৃতত্ব লাভই সমস্ত জিজ্ঞাসা, সমস্ত অনুসন্ধানের শেষ উদ্দেশ্য। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আশ্রমত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা-গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাব পত্নী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে বণ্টন করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব শ্রবণে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামীকে প্রশ্ন করিলেন—"যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাংন্বহং তেনামৃতা ?"—"এই সমুদায় পৃথিবী যদি বিত্ত দ্বারা পূর্ণ হয়, আমি কি তাহা দ্বারা অমৃত হইতে পারিব ?" উত্তরে ঋষি জানাইলেন যে বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বের কোন আশা নাই। তখন মনস্বিনী মৈত্রেয়ী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় দর্শনেরই মর্মকথা :

২১। মধ্যযুগের বৌদ্ধদোহার সাধকদেরও একই কথা।—

এথু সে সুরসরি জমুনা এথু সে গঙ্গা সাঅরু।
এথু পআগ বাণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু।

এই দেহের মধেই গঙ্গা যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর সংগম, এখানেই প্রয়াগ, বারাণসী, এখানেই চন্দ্র-দিবাকর। আবার আর এক দোহায় বলা হইয়াছে—

"ঘরে রইল তত্ত্ব বাহিরে মরি পুছে' পুছে'।" দোহাকোষ ১৫, ৪৭ এবং ১৭, ৬২

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?"—"যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা দিয়া আমি কী করিব?" ভারতীয় দর্শনেরও এই অসংশয় প্রত্যয়—সংসার ও মৃত্যুর পাশ ছেদনই সমস্ত জ্ঞান সমস্ত উদ্যমের শেষ লক্ষ্য।

ভারতীয় জীবনসাধনা অমৃতত্ব লাভের সাধনা

৯। ভারতীয় দার্শনিকের মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসা শুধু মাত্র অলস মনের বিজৃম্ভন নয়। যে বীর্যবান নয়—সে নিয়ত কৌতূহলী নয়, যে অগ্রসর হইয়া চলিতে ভয় পায়, সিদ্ধি তাহার জন্য নয়। ভারতীয় দর্শনের উৎসাহসূচক বাণী—চরৈবেতি চরৈবেতি।[২২]

সংক্ষিপ্তসার

মহামতি মাক্স্ মূলের ভারতীয় জীবনচর্চায় দর্শনশাস্ত্রের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। সাধারণতঃ পল্লবগ্রাহিতার জন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় জীবনসাধনা ও দর্শনচিন্তার মধ্যে যে আত্যন্তিক যোগটুকু রহিয়াছে তাহা আবিষ্কারে অক্ষম হইয়াছেন। ভারতীয় দর্শনে বেদের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা কেউ কেউ ভারতীয় দর্শনমতকে 'ডগম্যাটিক্' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানে বুদ্ধির আলোকে বৈদিক সিদ্ধান্তগুলির যে মূল্যায়ন হইল, পশ্চিমদেশীয় দার্শনিকেরা অনেকেই তাহার খবর রাখিলেন না। অতএব তাঁহাদের অভিমত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদেশদর্শী হইয়া পড়িল।

২২। রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল চলিয়া শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য যখন ঘরের দিকে চলিয়াছেন তখন পথে তাঁহাকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র পর-পর পাঁচবার বলিলেন—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম
পাপো নৃষদ্ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি
পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।
আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।
কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি॥
চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি॥

ভারতীয় জ্ঞানচর্চায় একদিকে যেমন রহিয়াছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অন্যদিকে আবার কৃষিকর্ম, শিল্পচর্চা, বৈজ্ঞানিক তথ্যান্বেষণেরও অসদ্ভাব নাই। পরা ও অপরা—এই উভয়বিধ বিদ্যাই উপনিষদে আপন আপন যথাযথ মর্যাদায় স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ইহারা হইল অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হইল সেই বিদ্যা যদ্দারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়।

বেদ জুড়িয়া বহিয়াছে প্রাণের আবেগ। অপ্রমত্ত হইয়া ভোগ করিতে বেদের কোথাও নিষেধ নাই। অভয় শান্তির বাণী সমগ্র বেদের বিরাট বিস্তার জুড়িয়া ধ্বনিত হইয়াছে। ত্যাগের দ্বারা ভোগ সীমিত ও পরিশীলিত হইবে, ইহাই বৈদিক নির্দেশ। জীবনে ত্যাগ ও সংযমের কথা বৈদিক সূত্রে বারবার ধ্বনিত হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিরা জীবনকে 'যজ্ঞ' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। জীবনের যাহা কিছু বিশেষ বিশেষ ঘটনা—জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন, বিবাহ, সকলই যজ্ঞ-চিহ্নিত। কিন্তু ভারতীয় দর্শনকে শুধুমাত্র অধ্যাত্ম-দর্শন বলিলে, আমরা অনৃত ভাষণের দায়ভাগী হইব। এতদ্দেশেই আস্তিক্য দর্শনমতের পাশাপাশি নাস্তিক দর্শনমতও প্রাধান্য পাইয়াছে। এই উভয়বিধ দর্শনমতই আবার মানুষের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই দেশের মাটিতেই সম্যগ্‌দর্শনের ধারণার বীজ উপ্ত হইয়া বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে। সে দর্শন কখনও জীবন হইতে নিযুক্ত হইয়া পড়ে নাই।

এতদ্দেশীয় সকল দর্শনচিন্তার আকর গ্রন্থ হইতেছে বেদ। ভারতের বুকে যত ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছে, সকলেরই মূল উৎস হইতেছে বেদ। বেদ চারিখানি—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। যজুর্বেদ আবার দুইখানি—শুক্ল ও কৃষ্ণ। ভারতীয় চিন্তাসাধনার ক্ষেত্রে বেদের ঘটনা অসামান্য। বেদের অপৌরুষেয়তায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলা হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসের সহিত ভারতীয় আস্তিক্যবাদী দর্শন-ধারণার কোন সম্পর্ক নাই। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন প্রমুখ দর্শনমত বেদের অপৌরুষেয়তায় অবিশ্বাসী বলিয়া, ইহাদের নাস্তিকদর্শন আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। পরমতসহিষ্ণুতা আমাদের নিত্যকালের বৈশিষ্ট্য। তাই ভারতবর্ষে কখনও একে অপরকে পুড়াইয়া মারিবার কথা কল্পনা করে নাই। এই আস্তিক্যবাদী দর্শনমত বেদানুসারী হইলেও, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে এই দর্শনমত অন্ধভাবে কোথাও বেদের অনুসরণ করে নাই। যুক্তি ও বুদ্ধি, বিচার ও প্রমাণ সহযোগে আস্তিক্যদর্শন বেদ-বিদ্যার মূল্যায়ন করিয়াছে, তাহার প্রতি বিজ্ঞানসম্মত সমর্থন জানাইয়াছে। তাই আস্তিক্যবাদী দর্শনমত আমাদের মতে 'ডগম্যাটিক' নহে।

ভারতীয় দর্শনে মানবপ্রকৃতির আত্যন্তিক প্রভেদকে স্বীকার করা হইয়াছে, এবং সেই কারণেই অধিকারবাদকেও স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্নমুখী দর্শনচিন্তার উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ। বিভিন্ন দর্শনমত এই মোক্ষলাভের পথনির্দেশও করিয়াছে। এই দর্শন-আলোচনা বিভিন্নমুখী হইলেও পরস্পরের মধ্যে কোথাও শ্রদ্ধাহীনতা পরিলক্ষিত হয় নাই। ভারতীয় দর্শনে বিরুদ্ধমত সকল সময়েই শ্রদ্ধেয়। ভারতীয় চিন্তা সর্ববিধ সমস্যার সামগ্রিক ও সম্যক পর্যালোচনা করে। তাই যখন দুঃখবাদের আলোচনা হয়, তখন ভারতীয় দর্শন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলে। ইহা এতদ্দেশীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এতদ্প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নহে। এই দর্শনচিন্তায় আমরা

যে অদৃষ্টের ধারণা পাই, তাহা আমাদের আপন কর্মফলপ্রসূত। ভারতীয় দর্শনমত জগতের নৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বাস করে। 'ঋত' বা বিশ্বব্যাপী নীতি-সংস্থায় ভারতীয় মন বিশ্বাস করে। এই নীতি ব্যক্তির কার্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাই বলা যায় যে ভারতীয় দর্শন-ধারণা ব্যক্তির কর্মফলকে কেন্দ্র করিয়া উদ্বর্তিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে আমরা এই কর্মের বিভিন্ন শ্রেণীকরণ করিয়াছি। ইহা বিভিন্ন সংস্থার পণ্ডিতজনস্বীকৃত। ইঁহারা বলিলেন যে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পথেই মোক্ষলাভ করা যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কর্মাশ্রয়ী, তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল হইল নীতিগর্ভে প্রোথিত। এই নীতি-ধারণায় বিশ্ব-বিবর্তনে সহায়তা করিতেছে, প্রেরণা দিতেছে। জগৎ শৃংখলার রাজত্ব। এই শৃংখলা হইল নীতি-শৃংখলা। এই জগদ্ব্যাপারে আমাদের সত্যজ্ঞান লাভ হইলে, আমরা মোহমুক্ত হই, বন্ধনমুক্ত হই। সত্যজ্ঞান লাভ না ঘটিলে ব্যক্তির বন্ধনমুক্তি ঘটে না। মিথ্যাজ্ঞানই বন্ধনের হেতু। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সত্যকে আত্মস্থ করিতে হয়। এই সত্যলাভ হইলে অন্তরের পরিপূর্ণতা লাভ করা ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য হয় এবং এই আন্তর পরিপূর্ণতালাভেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, এ তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত। এই সামগ্রিক ভারতীয় জীবনচর্যা, অমৃতত্ব লাভের দুরূহ সাধনায় ব্রতী।

প্রশ্নমালা

1. Is Indian Philosophy divorced from life? Discuss.
2. State and explain the main tenets of Indian Philosophy in general.
3. Is Indian Philosophy Āstika in character? Discuss.
4. Is Indian Philosophy dogmatic in character? Discuss fully.

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাস্তিক দর্শন : চার্বাকবাদ

ভারতীয় দর্শনের দুঃসাহসী বিদ্রোহী চিন্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চার্বাকবাদ। চার্বাকবাদীরা নাস্তিক—বেদকে প্রমাণ হিসাবে তাঁহারা গ্রহণ করেন না। বেদ অপৌরুষেয় নয়, মনুষ্যসৃষ্ট ; সুতরাং বেদ অভ্রান্ত নয়। তাঁহারা নিরীশ্বর—ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। তাঁহারা পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করেন না, আত্মার অমরত্বে তাঁহাদের আস্থা নাই। তাঁহারা জড়বাদী। তাঁহাদের মতে জগৎ জড় অণু-পরমাণু হইতে স্বতঃই সৃষ্ট। ইহা কোন মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রতিফলন নয়। তাঁহারা খোলাখুলি ভাবে ভোগবাদী। মৃত্যুর পর যখন আর কোন পরলোক নাই, তখন বুদ্ধিমান মানুষ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ভোগকেই একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। চার্বাকবাদীদের দর্শনে ঈশ্বর বা দেবতার তো কোন স্থান নাই-ই, এমন কি কোন সাধুসন্ত-মহাপুরুষেরও কোন স্বীকৃতি নাই। অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে যুক্ত আছে মঠ-মন্দির, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচরণশাস্ত্র ; কিন্তু চার্বাক দর্শন এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। ভারতীয় দর্শনের মূল ধারা হইতে চার্বাকবাদ বিচ্ছিন্ন। বাস্তবিক ইহাকে দর্শন না বলিয়া একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী, আদর্শবাদী, ত্যাগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত চার্বাক দর্শনের বিরোধ এতই প্রবল যে ভারতীয় দর্শনে চার্বাকবাদ কঠিন ধিক্কৃত—অসুর বলিয়া চার্বাকবাদীরা নিন্দিত। তথাপি ভারতীয় জীবনে চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার ইহা অসংশয়িত প্রমাণ যে চার্বাকের মত নিন্দিত হইলেও উপেক্ষিত নয়। অন্যান্য সমস্ত প্রস্থান চার্বাক মতকে যথোচিত মর্যাদা দিয়াছেন—ধীর ভাবে তাহাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বিপরীত মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তার সজীবতা ও সুস্থতারই ইহা লক্ষণ।

চার্বাক দর্শন বেদ-বিরোধী ও নাস্তিক

সাধারণতঃ বৃহস্পতিকে চার্বাক মতের স্থাপয়িতা বলিয়া বলা হয়। তৎ-কর্তৃক রচিত অল্প কয়েকটি শ্লোক বা সূত্র বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। সুসংবদ্ধ সম্পূর্ণ চার্বাক দর্শন কোথাও মেলে না। চার্বাক কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চার্বাক নামে আদৌ কোন ব্যক্তি ছিলেন কি না, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা নিঃসংশয়

নন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চার্বাক কোন ব্যক্তির নাম নয়, 'চারু-বাক' হইতেই 'চার্বাক' কথার উদ্ভব। চার্বাকের মতবাদ আপাতরমণীয়, সহজবোধ্য, সমস্ত কৃচ্ছ্রতা-বিরোধী,—সুতরাং স্বল্পবুদ্ধি ইতরজনের কাছে ইহার আকর্ষণ প্রবল। সেই জন্য চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত মত বলা হয়। আবার কেহ বলেন চার্বাক জড়বাদ ও ভোগবাদের সাধারণ নাম (√চর্ব—চর্বণ করা)।[১]

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ

চার্বাকপন্থীরা বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রমাণ অস্বীকার করিয়াছেন। অনুমান, উপমান ইত্যাদি অন্য কোন উপায়েই নিশ্চিত সত্যজ্ঞান লাভ করা যায় না। অনুমান দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনিৰ্ভরযোগ্য। কারণ অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিসম্বন্ধ (invariable universal relation)। ধূম ও অগ্নির মধ্যে যে নিয়তসম্বন্ধ তাহাই ব্যাপ্তিসম্বন্ধ। যতদূর আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে দেখিয়াছি যে যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানেই বহ্নি। এখন পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। কিন্তু সর্বক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করিলেই কেবলমাত্র এ সিদ্ধান্ত করা চলে যে এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল। কিন্তু তাহা তো অসম্ভব। তাই অনুমানের ভিত্তি সম্পূর্ণ দৃঢ় নয়। একমাত্র প্রত্যক্ষই নির্ভুল জ্ঞানের নির্ভর-যোগ্য ভিত্তি। প্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তাকে ব্যাপ্তিসম্বন্ধে বিশ্বাসের হেতু বলিয়া মনে করা হয়। অগ্নির ইহা অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি যে ইহা উত্তাপ দান করে। কিন্তু অগ্নির প্রকৃতি যে ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হইবে না, তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। যাহা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার বর্তমান সত্যতায় বিশ্বাস করা যায়। এই প্রত্যক্ষের বহির্ভূত অন্য কিছুই নিশ্চিত সত্য নয়।

প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অস্বীকৃত

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি

বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের বাক্যকে ন্যায় দর্শনে শব্দপ্রমাণ বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ প্রমাণের ভিত্তি হইল প্রত্যক্ষজ্ঞান। বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যাহা জানিয়াছেন, তাহা যখন তিনি নির্ভুলভাবে বর্ণন করেন তখনই তাহা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নহে।

জড়বাদ

প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মা, অদৃষ্ট, স্বর্গ, নরক, পরলোক, ঈশ্বর কিছুই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং চার্বাকমতে এই সবই অগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা যে

১। Dakshinaranjan Shastri—A Short History of Indian Materialism

সমস্ত বস্তুকে দেখি, তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে চারিটি ভূত—ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি ও বায়ু প্রত্যক্ষ করা যায়। আকাশ আর এক ভূত বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু আকাশ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সুতরাং চার্বাকমতে আকাশ অস্বীকৃত।

আত্মা অস্বীকৃত

চার্বাক স্বীকার করেন যে অন্তর্প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা চেতনার অস্তিত্বের সন্ধান পাই। কিন্তু সমস্ত চেতনার পশ্চাতে আত্মাবস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সুতরাং অস্বীকৃত। কিন্তু চেতনা তো পূর্বস্বীকৃত চারিটি উপাদান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু চার্বাকমতে জড়বস্তুর সংযোগে নূতন গুণের উদ্ভব সর্বদাই হয়—যেমন চুন ও চিনি দুই-ই ঠাণ্ডা, কিন্তু তাহাদের সংযোগে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। দেহ-অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। দেহ নশ্বর। আত্মা অবিনশ্বর হইতেই পারে না।

ঈশ্বর অস্বীকৃত

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ইত্যাদি জড় উপাদানের সংযোগ ও সংগঠন ঈশ্বরের শক্তিদ্বারাই সম্ভব। কিন্তু চার্বাকমতে জড় উপাদানগুলি স্বভাব অনুযায়ী স্বতঃই পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথিবীর নানা জটিল বস্তু গঠন করিতে পারে (যদৃচ্ছাবাদ)। জগতের বস্তুগুলি কোন মঙ্গল-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন অদৃশ্য ইচ্ছাদ্বারা চালিত, এমন কোন প্রমাণ নাই।

ভোগবাদ

মীমাংসকদের মতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা স্বর্গলাভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু চার্বাকবাদীরা স্বর্গ অস্বীকার করেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের শক্তিও অস্বীকার করেন। "যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে যায় তবে যজমান যজ্ঞে নিজের পিতাকে বলি দেয় না কেন? মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিলে যদি তাহার তৃপ্তি হয় (শ্রাদ্ধে দত্ত দ্রব্য যদি মৃত ব্যক্তি পাইতে পারে) তাহা হইলে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় পাথেয় সংগ্রহের প্রয়োজন কি? গৃহে অন্ন রন্ধন করিয়া নিবেদন করিলেই তো সেই দূরস্থিত ব্যক্তি পাইতে পারে। স্বর্গে অবস্থিত পিতা যদি পৃথিবীতে দত্ত দান প্রাপ্ত হন তাহা হইলে পৃথিবীতে অবস্থিত পিতাকে অবস্থিত পিতাকে প্রাসাদোপরি রাখিয়া নিম্নে দান করিলে, তিনি তাহা পান না কেন?"[২] চার্বাকপন্থীদের মতো মার্কসবাদীরাও বলেন যে স্বর্গ-নরক ইত্যাদি লোভী

২। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭

পুরোহিতদেরই সৃষ্ট কল্পনা। পুরোহিতদের সম্বন্ধে চার্বাক বহু গ্লানিকর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন্—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরাঃ জর্ঝরী তুর্ঝরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।" আবার বলা হইয়াছে—"অগ্নিহোত্রঃ ত্রয়ো বেদাঃ ত্রিদন্ডং ভস্মগুণ্ঠনং বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাং জীবিতো ইতি বৃহস্পতিঃ" ইত্যাদি।

ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিকেরা সংসারচক্র ছেদন দ্বারা মুক্তিকেই বলিয়াছেন জীবনের শেষ উদ্দেশ্য। দেহে অবস্থানকালে সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক অবসান অসম্ভব। আবার দেহান্তে আত্মা সর্বদুঃখমুক্ত হয়, ইহাও অসম্ভব কল্পনা। কারণ মরণান্তে আত্মা বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই বৃহস্পতিসূত্র বলিতেছেন, মরণমেব অপবর্গঃ—দেহের মৃত্যুতেই অপবর্গ বা মুক্তি।

জীবনে অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং মানুষের কর্তব্য জীবনে যতটা সুখ সংগ্রহ করা যায় এবং দুঃখ পরিহার করা যায় তাহারই চেষ্টা করা।

সুখান্বেষণই পুরুষার্থ

দুঃখ সমস্ত সুখ ও উদ্যমের নিয়ত সঙ্গী ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সুখের আহরণে উদ্যোগী না হওয়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। কাঁটা আছে বলিয়া কি গোলাপ তুলিতে মানুষ বিরত হইবে? নরকের ভয়ে অথবা স্বর্গের আশায় এই জীবনে সুখভোগে বিরত থাকাও চরম নির্বুদ্ধিতা। এই জীবনের সুখদুঃখ নিতান্ত প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু দেহান্তে স্বর্গ বা নরক তো নিতান্তই কবিকল্পনা। দেহান্তে কেহ তো স্বর্গ বা নরকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ফিরিয়া আসে না। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য বলিয়া যখন কিছুই নাই, এই মুহূর্তের জীবনই যখন সত্য, তখন এই ক্ষণিক মুহূর্তের সুখসম্ভোগ লুটিয়া নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ—আজ যে সুযোগ আসিয়াছে, কাল হয়তো সে সুযোগ আর আসিবে না—অতীতের জন্য হা-হুতাশ করা বৃথা, তাহা আর ফিরিবে না; ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া থাকাও মূর্খতা—কারণ ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সুতরাং চার্বাকের উপদেশ হইল,—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ তাবন্ মৃত্যোরগোচর
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥[৩]

৩। পরবর্তীকালে গ্রীস্ দেশে, রোমে, পারস্যে এবং অন্যান্য দেশে এই ভোগবাদের প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাইয়াছি—To look before and after, were to defeat the end of life, to miss that pleasure which is essentially a thing of the present. The very fact that we are the children of time, and not of eternity, makes the claim of the present, even of the momentary present,

ভারতীয় দর্শনে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের কথা বলা হয়। চার্বাকবাদীরা অর্থ ও কামকেই কেবলমাত্র স্বীকার করেন। অর্থও কামনা পূরণেরই উপায় মাত্র। সুতরাং বলা যায় কাম বা সুখান্বেষণই পুরুষার্থ অথবা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র লোকায়ত দর্শনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগবিজ্ঞান বলা যায়। তবে বাৎস্যায়ন কামকেই সর্বপ্রধান মানিলেও এই কামের অনুকূল হিসাবে অর্থ ও ধর্মকেও পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন পরবর্তী গ্রীক্ এপিকিউরিয়ানদের মতো নগ্ন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকে সুখের উপায় মনে করেন নাই, তাঁহার মতে অর্থ ও কাম ধর্মের পথেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।[৪]

জগৎ ও জীবন জড়ের সংযোগের আকস্মিক ফল

এই জগৎ ও জীবন কোন বিশ্বাত্মার মঙ্গলময় ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত নয়, ইহা জড়েরই সংযোগের আকস্মিক ফল, এই বিশ্বাস আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বৈশিষ্ট্য বলিয়া কখনো কখনো দাবি করা হয়। কিন্তু সেই সুদূর অতীতে এ প্রকার চিন্তার ভারতবর্ষে উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা ভারতীর সতেজ মননশীলতারই লক্ষণ।

ভোগবাদ ও ক্ষণিকবাদ জড়বাদের অবশ্যম্ভাবী ফল

ভোগবাদ, ক্ষণিকবাদ ও জড়বাদের প্রায় অবশ্যম্ভাবী ফল। মানুষ যখন জগৎ ও জীবনকে জড়ের আকস্মিক স্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে করে, যখন বর্তমানকেই একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তখন প্রতি মুহূর্ত হইতে যতটা পরিমাণ সুখ ও সম্ভোগ লুণ্ঠন করিয়া নেওয়া যায় তাহার দিকেই মানুষ সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই লুব্ধ তস্করবৃত্তি পলায়ন ও পরাজয়ের মনোবৃত্তিরই প্রকাশ। মানুষের কাছে জীবনের তাৎপর্য

---

imperious and supreme. A life of feeling, pure and simple, heedless and unthinking, and undisturbed by reason—such is the Cyrenaic ideal. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 84

Some for the Glories of this World; and some
Sigh for the Prophet's Paradise to come;
Ah! take the Cash, and let the Credit go!
Nor heed the rumble of a distant Drum.
Come, fill the cup, and in the fire of Spring
Your Winter-garments of Repentence fling:
The Bird of time has but a little way
To fly—and lo! the bird is on the wing

* * *

Oh threats of Hell and hopes of Paradise!
One thing at least is certain—this life flies;
One thing is certain. and the rest is lies;
The Flower that once has blown for ever dies.

Rubaiyat of Omar Khayyam—Tr. Fitzerald

৪। Vatsāyana's Kamasutra (K. S. S.), 1929. 1. I.

যেদিন হারাইয়া যায়, সেদিনই সে ক্ষণিক ভোগের জন্য লালায়িত হয়। বাস্তবিক পক্ষে ভোগবাদ কাপুরুষেরই দৃষ্টিভঙ্গী, ইহা নিতান্ত অগভীর জীবনদর্শন এবং ইহার বাস্তব ফল সমস্ত নৈতিক মূল্যের অস্বীকৃতি। সেই জন্যই যাহারা এ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা জীবন চালনা করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'অসুর' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। তাহারা নিজের ও অপরের দুঃখ ও অমঙ্গলেরই হেতু। তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জানে না যে ধর্মে প্রবৃত্তিই বা কি আর অধর্ম হইতে নিবৃত্তিই বা কি, অর্থাৎ তাহাদের ধর্মাধর্ম, কর্তব্যজ্ঞান নাই। অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার বা সত্য কিছুই নাই। এই আসুর প্রকৃতির লোকেরা বলিয়া থাকে যে, এই জগতে সত্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সকলই অসত্য; জগতে ধর্মাধর্মেরও কোন মূল্য নাই এবং ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাপক ঈশ্বর বলিয়াও কোন বস্তু নাই। ইহা কেবল স্ত্রী-পুরুষ অন্যান্য সংযোগে জাত। স্ত্রী-পুরুষের কামই ইহার একমাত্র কারণ, ইহার অন্য কারণ নাই। এই প্রকার দৃষ্টি যে নিরীশ্বরবাদীরা অবলম্বন করে, তাহারা বিকৃতমতি, অল্পবুদ্ধি এবং ক্রূরকর্মা। এই ব্যক্তিগণ সর্বদাই অহিতাচরণে প্রবৃত্ত। তাহারা জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।[৫]

ধর্ম ও সত্য অস্বীকৃত

সংক্ষিপ্তসার

চার্বাক দর্শন বেদ-বিরোধী ও নাস্তিক দর্শন রূপে সুপরিজ্ঞাত। ইহারা বেদের অপৌরুষেয়-তায় বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে ইহারা অবিশ্বাসী। পুনর্জন্মবাদ ও আত্মার অমরতায়ও ইহাদের অবিশ্বাস। ইহারা ভোগবাদী। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য প্রস্থানগুলি চার্বাক-মতকে উপেক্ষা করে নাই। চার্বাকমত খণ্ডন করিয়া তাহারা আপন আপন মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

চার্বাক দর্শনমতের স্থাপয়িতা সম্পর্কে বাদানুবাদের অন্ত নাই। অনেকে বৃহস্পতিকে চার্বাকমতের স্থাপয়িতা বলিয়া গণ্য করেন। আবার অনেকে বলেন যে চার্বাক কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। চারু-বাক্ হইতেই 'চার্বাক' কথার উদ্ভব। আবার কাহারও কাহারও মতে চার্বাক জড়বাদ ও ভোগবাদের সাধারণ নাম।

ইহাদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষই নির্ভুল জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিসম্বন্ধ ও প্রত্যক্ষগোচর নহে। তাই তাহা এই দর্শনে অস্বীকৃত। বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তিদের প্রত্যয়লব্ধ জ্ঞান গ্রাহ্য। অন্যথায় তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই। প্রত্যয়লব্ধ জাগতিক বস্তুর জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা চারিটি

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৬/৭—৯ (জগদীশচন্দ্র ঘোষ সংস্করণ)

ভূতের সন্ধান পাই ; ইহারা হইল ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি ও বায়ু। চার্বাক দর্শনে ইহাদের মূল উপাদান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। চার্বাকবাদীরা ঈশ্বর, স্বর্গ, আত্মা প্রমুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নৈতিক ক্ষেত্রে ভোগবাদের প্রতিষ্ঠাকে সহজসাধ্য করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, সুখান্বেষণই একমাত্র পুরুষার্থ। মানুষের কর্তব্য হইল জীবনে দুঃখ পরিহার করিয়া সর্বাধিক সুখ লাভের জন্য চেষ্টা করা। মুহূর্তের জীবনই সত্য ; সুতরাং সুখ-সম্ভোগই হইল বুদ্ধিমানের কাজ। জগৎ ও জীবন কোন মঙ্গলময় ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত নহে। ইহারা জড়ের সংযোগের আকস্মিক ফলমাত্র। এই জড়বাদে বিশ্বাস করার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে চার্বাকবাদীরা ভোগবাদ ও ক্ষণিকবাদে বিশ্বাসী। তাহাদের দর্শনে ধর্ম ও সত্যকে স্বীকার করা হয় নাই। তাই চার্বাকবাদীদের 'আসুর ভাবাপন্ন' বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার বা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কিছুই নাই।

প্রশ্নমালা

1. State and explain the main tencts of Cārvāka philosophy.

2 What do you understand by Āstika darśan? Is Cārvāka philosophy Āstika in character? Discuss.

3. Write a short note on Cārvāka hedonism and trace it to the central Cārvāka metaphysics.

তৃতীয় অধ্যায়

নিরীশ্বরবাদ : জৈন দর্শন

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই দর্শনই নাস্তিকবাদী। ইহারা বেদকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন না—দুইই নিরীশ্বরবাদী। তাঁহারা মনে করেন, জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা জীবনের নৈতিক আদর্শ নির্ণয়ে তাঁহারা আগ্রহী। ভারতীয় চিন্তায় আদর্শ হিসাবে অহিংসাকে ইঁহারা শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়াছেন। জৈন ধর্মে কৃচ্ছ্রতা ও অহিংসার অনুসরণ একেবারে চরমে উঠিয়াছে।

জৈন দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন

জৈন দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করে না, কিন্তু চব্বিশজন 'জীন' (যাঁহারা সর্ব কামনা-বাসনা জয় করিয়াছেন) বা তীর্থংকর বা মহাপুরুষকে জৈনগণ তাঁহাদের ধর্ম-প্রবর্তক বলিয়া বিশ্বাস করেন। ঋষভদেব এই গুরুদের মধ্যে সর্বপ্রথম এবং বর্ধমান বা মহাবীর সর্বশেষ। মহাবীর খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন, এ প্রকার লোকপ্রসিদ্ধি আছে।[১] এই জীনদের পবিত্র জীবনই জৈনধর্মাবলম্বীদের নিকট শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। জৈন দর্শনও বিশ্বাস করে যে জীবন দুঃখময় এবং দুঃখপাশ ছেদনের একমাত্র উপায় হইল তীর্থংকরদের উপদেশ অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ জীবনযাপন ও তত্ত্বজ্ঞান-লাভ। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ চেষ্টা ও নিষ্ঠাদ্বারা তীর্থংকরদের পথ অনুসরণ করিয়া মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতা অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারে, ইহাই জৈন ধর্মাবলম্বীদের অসংশয় প্রত্যয়।[২] জৈনদের দুই সম্প্রদায়—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। তাঁহাদের মধ্যে মূলতত্ত্ববিষয়ে পার্থক্য নাই। দিগম্বর সম্প্রদায় অধিকতর কৃচ্ছ্রপন্থী। দিগম্বরমতে সন্ন্যাসীগণ সমস্ত পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করিবেন, কোন খাদ্য গ্রহণ করিবেন না এবং বস্ত্রও পরিধান করিবেন না। তাঁহারা মনে করেন, নারী মোক্ষলাভের অধিকারিণী হইতে পারে না। প্রতি জীবে শ্রদ্ধা জৈন-

জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী

১। Mrs. Stevenson—The Heart of Jainism, Ch. IV

২। Jacobi—Jaina Sutras, Part I (Sacred Books of the East Series)

দর্শনের যেমন বৈশিষ্ট্য, তেমনি প্রতি মানুষের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাও আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। জৈন দর্শন এই পৃথিবীকে সত্য বলিয়াই জানে এবং জগৎ ও জীবনের বৈচিত্র্যকেও তাহা মানে। সত্যের বহু রূপ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি একই সত্যকে বিভিন্ন দিক হইতে জানে—তাই প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই সত্যের আভাস আছে। সুতরাং প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গীই শ্রদ্ধা ও বিবেচনার যোগ্য। জৈন দর্শনের এই উদার মত অনেকান্তবাদ ও স্যাদ্‌বাদ নামে খ্যাত।[৩]

জৈন দর্শনে জগৎ সত্য

দার্শনিক মত

জৈন দর্শন জীব এবং অজীব এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব স্বীকার করে। শুধুমাত্র পশু ও মানুষই জীব নয়। উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, অপ্‌-ও জীব-চিরন্তন ও অবিনশ্বর। ইহা অজড় বস্তু। দেহ হইতে দেহান্তরে জীব গমনশীল। অ-জীব হইল জড় বস্তু। ইহা সমস্ত গতি, স্তব্ধতা, দেশ ও কালেব কারণ। অজীব বা জড় অণু, অথবা একাধিক অণুর সমবায়। সমস্ত অণুই এক জাতীয়, তাহাদের মধ্যে গুণগত প্রভেদ নাই। অজীব হইতে জীব, অথবা জীব হইতে অজীব সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জগৎ চিরন্তন ও স্বয়ম্ভূ। কোন ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নন্। জৈন দর্শন ছয়টি দ্রব্য স্বীকার করে: ১। জীব (life); ২। ধর্ম (the principle of motion); ৩। অধর্ম (the principle of rest); ৪। আকাশ (space); ৫। কাল (time); ৬। পুদ্গল (matter)। পৃথিবীকে সংখ্যাতীত বস্তু, এবং বহু তাহাদের রূপ ও গুণ। ইহাই হইল অনেকান্তবাদ। প্রত্যেক বস্তুই অনন্তধর্মী।[৪] সুতরাং বস্তু সম্বন্ধে যে কোন বিবরণই আপেক্ষিক। তাই জৈন দার্শনিক মতে প্রত্যেক বর্ণনার পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দ ব্যবহার করা উচিত। 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ—'হয়তো' বা 'হইতে পারে'। 'ঘট অস্তি' বলিলে সর্বকালে, সর্ব স্থানে, ঘট আছে বুঝায়! কিন্তু তাহা তো সত্য নয়। সুতরাং বলা উচিত 'স্যাৎ ঘট অস্তি'। ইহার অর্থ বর্তমান কালে এক বিশেষ স্থানে ঘটের আকৃতিবিশিষ্ট ও গুণবিশিষ্ট বস্তু আছে। ইহাই স্যাদ্‌বাদ। প্রত্যেক জীবের জ্ঞানই সীমিত। অনন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন জীবই কেবলমাত্র কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভে সমর্থ। মানুষের জ্ঞান সর্বদাই আপেক্ষিক, স্থান-কাল দ্বারা খণ্ডিত। প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধে

জীব ও অজীবের ধারণা

স্যাদ্‌বাদ

৩। Mallisena—Syādvāda-Manjari (Commentary—Hemchandra —Chowkhamba Sanskrit Series)

৪। অনন্তধর্মকম্ বস্তু—হরিভদ্র। ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়। ৫৫

অসংখ্য জ্ঞানের মধ্যে কোন ব্যক্তির বিশেষ স্থান-কাল সাপেক্ষ পরামর্শকে (Judgment) জৈন দর্শনে 'নয়' বলা হইয়াছে। ইহাই নয়বাদ।[৫] জৈন দর্শন মতে নয় সপ্তভঙ্গী।[৫] বিভিন্ন দার্শনিক মতই অনন্তধর্মী সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে আংশিক দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত। প্রত্যেকটি দার্শনিক মতই নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সত্য, সুতরাং উপযুক্ত শ্রদ্ধার যোগ্য।

গ্রীক্ দার্শনিক পিরোর দর্শনেব সহিত জৈন দর্শনেব তুলনা

অ্যারিস্টট্‌লের সমকালে গ্রীস দেশে পিরো (Pyrrho) নামে এক গ্রীক্ পণ্ডিতের উদ্ভব হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের সমস্ত বিচারই দেশ-, কাল-, অবস্থা-, দৃষ্টিভঙ্গী-সাপেক্ষ, সুতরাং সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞান মানুষের পক্ষে অনায়ত্ত। সুতরাং আমাদের কখনও এমন বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়, যথা—'আমটি মিষ্ট।' বলা উচিত 'আমার মনে হয়, (অথবা, সম্ভবতঃ) আমটি মিষ্ট।' আপাতদৃষ্টিতে পিরোর মতের সঙ্গে জৈন দর্শনের স্যাদ্‌বাদ বা নয়বাদেব মিল আছে। কিন্তু আর একদিক হইতে দুই মত সম্পূর্ণ বিপরীত। জৈন দর্শন বলিলেন, সমস্ত বিচারই কোন না কোন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সত্য। কিন্তু পিরো বলিলেন, সমস্ত বিচারই কোন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা মিথ্যা। পিরো সংশয়বাদী, আর জৈনরা বাস্তববাদী।

জৈন দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব

জৈনমতে চেতনা জীবের অচ্ছেদ্য ধর্ম। চার্বাক মত হইল, জড় অণুর সংযোগে অকস্মাৎ জীব ও চেতনার উৎপত্তি। এই মত জৈনরা গ্রহণ করেন না। জ্ঞানকে

৫। নয়তি প্রাপয়তি সংবেদনম্ আরোহয়তি ইতি নয়ঃ প্রমাণ প্রবৃত্তে রুত্তর কালভাবী পরামর্শঃ সিদ্ধসেন দিবাকর—ন্যায়াবতার—29. (Eng. tr. by S. C. Vidyabushana—The Indian Research Society)

(১) স্যাৎ অস্তি (২) স্যাৎ নাস্তি (৩) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ (৪) স্যাৎ অব্যক্তবাম্ (৫) স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যং চ (৬) স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ (৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ—এই সাত নয়ের কোনও একটি ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনা করিতে হয়, অন্য রূপ নাই। প্রথম নয়ে কোন বস্তু সম্বন্ধে বলা হয় যে সে বস্তু স্বরূপে, স্বদ্রব্যে, স্বক্ষেত্রে, স্বকালে অবস্থিত। দ্বিতীয় নয়ে বলা হয় যে, যে কোনও দ্রব্য তাহার স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে পরদ্রব্যে, পরক্ষেত্রে, পরকালে 'নাস্তি'। প্রত্যেক বাক্যেরই দুই রূপ—অস্তিরূপ ও নাস্তিরূপ। তাহা সদ্‌সদাত্মক। বস্তু যাহা তাহাই, যাহা নহে তাহা নহে (Laws of Identity and of Contradiction)। নঙ্‌বাচনের এই মতে একটি ভাবরূপ আছে। যাহাই চিন্তার বিষয় হইতে পারে, এক অর্থে তাহার অস্তিত্ব আছে, অন্য অর্থে নাই। আকাশকুসুমের একটি ভাব-বাচক ভিত্তি আছে। আকাশ ও কুসুম উভয়ই সত্য, যদিও উভয়ের সংযোগ অসত্য; চিন্তার জন্য ভেদের প্রয়োজন। কোনও বস্তু হইতে যাহার ব্যাহৃতি নাই, তাহার চিন্তাও অসম্ভব। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩-২০৪

জৈনরা সূর্যালোকের মতো স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। কোন বাধা না থাকিলে জ্ঞান তাহার বস্তুকেও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।[৬] বাধা আছে বলিয়াই জীব সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। এই বাধার কারণ হইতেছে বিভিন্ন প্রকারের কর্ম। দেহ, ইন্দ্রিয়, মনস্ ইত্যাদি সবই কর্ম দ্বারা গঠিত এবং কর্মই জীবের সর্বজ্ঞতায় বাধা দেয়।

জ্ঞান দুই প্রকারের—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান অথবা মন দ্বারা অন্তঃপ্রত্যক্ষ অপরোক্ষ (immediate) জ্ঞান। অনুমান দ্বারা যে জ্ঞান তাহা, পরোক্ষ। জৈন দর্শনে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের মধ্যেও পার্থক্য করা হয়।

জ্ঞান দ্বিবিধ—
অপরোক্ষ ও পরোক্ষ

ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা যে অপরোক্ষ জ্ঞান সাধারণ মানুষ লাভ করে তাহা ব্যবহারিক। কিন্তু সেই জ্ঞান কর্মের দ্বারা বাধিত। কর্মের বাধা অপসারিত হইলে, তবেই কেবল পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হইতে পারে। পারমার্থিক অপরোক্ষ জ্ঞান আবার তিন প্রকারের—অবধিজ্ঞান, মনপর্যায়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান। কেবলজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ জ্ঞান। জীনগণ এই জ্ঞানের অধিকারী এবং প্রত্যেক জীবেরই ইহা আদর্শ।

জৈনগণ অপরোক্ষ জ্ঞান, অনুমান ও শ্রুত, এই তিন প্রকার প্রমাণকে স্বীকার করেন। শ্রুত হইল বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান। শ্রুত জ্ঞান অবশ্য

প্রমাণ ত্রিবিধ

বিশ্বস্ত ব্যক্তির অপরোক্ষ জ্ঞান-নির্ভর এবং তাহার বিশ্বস্ততা-নির্ভর। এই সমস্তই ব্যবহারিক জ্ঞান এবং ইহারা কর্মের বাধা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত ভুল হইতে পারে।

চার্বাক কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানকেই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জৈনগণ তাহার সমালোচনা করিয়া বলেন চার্বাকপন্থীদের যদি প্রশ্ন করা যায় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই একমাত্র প্রমাণ কেন, তাহা হইলে তাঁহারা হয় নিরুত্তর থাকেন, অথবা এই প্রকার কোন যুক্তি দেখান যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, সুতরাং তাহা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ

জ্ঞান পরস্পর-
বিরোধিতা হইতে মুক্ত

করিতে তাঁহাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। জৈনগণের জ্ঞানবাদ সাধারণ বুদ্ধি-সমর্থিত। তাঁহারা বলেন, যে জ্ঞান পরস্পর-বিরোধিতা হইতে মুক্ত (free from self-contradiction) তাহাই সত্য।[৭]

ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চারিটি স্তর—(১) অবগ্রহ। এই স্তরে বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শের ফলে প্রথম যে বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞান

৬। জ্ঞানম্ স্ব পর-ভাসী

৭। প্রমেয়-কমল-মার্তণ্ড (Nirnaya Sāgar Press), Ch. 2

(just awareness of mere beingness) ; (২) ঈহা—অবগ্রহের পরই প্রশ্ন জাগে বস্তুটির কি বিশিষ্ট গুণ আছে ? অবগ্রহের স্তরে শুধু এই জ্ঞান হইয়াছিল—চোখের সামনে একজন মানুষ আছে। ঈহা স্তরে প্রশ্ন জাগে, মানুষটি কি কর্ণাটক, লাত বা অন্য কোন দেশের অধিবাসী ? (৩) অভায় স্তরে প্রত্যক্ষ বস্তুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবিয়া তাহার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়, যেমন লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা হইল যে, যে ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে সে কর্ণাটকবাসীই বটে। (৪) সর্বশেষ স্তর হইল ধাবণা—এই স্তরে বস্তুটিকে মনোযোগ সহকারে একাধিকবাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সম্বন্ধে এমন নিশ্চিত জ্ঞান জন্মে যে ভবিষ্যতে তাহাব সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করা যায় এবং সেই বস্তু স্মৃতিব বিষয় হইতে পারে।

ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্তবভেদ

অনুমান সম্পর্কে জৈন দর্শনের মত ন্যায় দর্শনেরই অনুরূপ। তাঁহারাও মনে করেন যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধের উপর নিভর করিয়া সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যেব মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। ন্যায় দর্শনের মত জৈনগণ পঞ্চাবয়ব ন্যায় কেবলমাত্র অল্প-বুদ্ধিদের জন্যই স্বীকার কবেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমানদের জন্য দুইটি অবয়বই যথেষ্ট যথা, (১) পর্বতো বহ্নিমান্ (সিদ্ধান্ত) (২) যতঃ পর্বতো ধূমবান্ (হেতু)। সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেব জন্য আর একটি অবয়ব প্রয়োজন যথা, (৩) যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নি, যথা স্থালী (দৃষ্টান্ত)।[৮]

জৈন দর্শনে অনুমানের প্রকৃতি

বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায তাহা হইল শ্রুত। শ্রুত ব্যবহারিক ও পাবমার্থিক, এই দুই প্রকার। সাংসারিক সফলতার জন্য সাধারণ বিশ্বস্ত মানুষদের কথা আমরা বিশ্বাস করি। পারমার্থিক বিষয়ে তীর্থংকরদের বাক্য গ্রাহ্য।

শ্রুত জ্ঞান ব্যবহাবিক ও পাবমার্থিক

জৈন দর্শনে নীতি

বুদ্ধ দর্শনের মতো জৈন দর্শনেও দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষা নৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। জীবে দয়া এবং নির্মল আচরণ জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মনের ভাব হইতেই মানুষের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, সুতরাং ভাবসম্বরই নৈতিক জীবনের ভিত্তি। এই জন্য ব্রত, সমিতি, গুপ্তি, ধর্ম, অনুপ্রেক্ষা, পরিষহজয় এবং চারিত্র এই সাতটির প্রয়োজন।[৯]

৮। প্রমাণানয়তত্ত্বালোকালংকার

৯। কুন্ত কুণ্ডাচার্য—পঞ্চস্তি কায়সময়শর

(১) ব্রত হইতেছে কতগুলি নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক প্রতিজ্ঞা। ইহারা হইতেছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য হইতে নিবৃত্তি হওয়া), ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ (কাহারও নিকট কোন দ্রব্য যাচ্ঞা না করা অথবা কোন দ্রব্যে লোভ না করা)। যোগ দর্শনেও ঠিক এই গুণগুলির উল্লেখ আছে। গৃহী বা শ্রাবকদের জন্য ব্রতের আচরণ তত কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে, তাই তাহাদের নাম অনুব্রত। কিন্তু শ্রমণ বা সন্ন্যাসীদের জন্য এই ব্রতের বিধান অত্যন্ত কঠোর ও আয়াসসাধ্য, তাই তাহাদের নাম মহাব্রত। তীর্থংকরগণ এই পঞ্চ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াই মহৎ জীবন লাভ করিয়াছেন।

ব্রত

(২) অসাবধানতার জন্য যাহাতে জীবের কোন ক্ষতি না হয়, সেই মনোভাব ও অভ্যাসকেই সমিতি বলা হয়। সেই জন্যই জৈনগণ পথ চলিতে সাবধান, যাহাতে কোন জীব পদতলে পিষ্ট না হয়, তাঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করেন, এমন কি যাঁহারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান তাঁহারা নাক-মুখ সূক্ষ্ম বস্ত্রে আচ্ছাদন করেন, যাহাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কোন জীবের হানি না হয়।[১০] জৈন সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষাজীবি, কৌপীনবন্ত ও মুণ্ডিতমস্তক, ভিক্ষা-পাত্র ও যষ্টিমাত্র সম্বল। দিনের অধিকাংশ সময় কৃত পাপের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, ধ্যান ও অধ্যয়নে তাঁহারা ব্যয় করেন। দিনে তিন ঘণ্টার বেশী নিদ্রা যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। গৃহীদের সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে প্রাণি-হত্যা না হয়। কৃষি বা যে সব জীবিকায় প্রাণিহত্যার সম্ভাবনা আছে, তাহা তাঁহারা সযত্নে পরিহার করেন। এইজন্য অধিকাংশ জৈনই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে রত হন।

সমিতি

(৩) গুপ্তি হইল দেহ, বাক্য ও মনের উপযুক্ত সংযমন। আত্মশুদ্ধির জন্য ইহা অত্যাবশ্যক।

গুপ্তি

(৪) ধর্ম কথাটি জৈন দর্শনে দুই সম্পূর্ণ পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয় ইতিপূর্বে দেখিয়াছি ধর্ম বলিতে গতির শক্তিকে (the principle of motion) বুঝায়। এখানে কিন্তু ধর্ম বলিতে পরিপূর্ণ ক্ষমা, বিনয়, সরলতা, পরিচ্ছন্নতা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, নির্লোভিতা ইত্যাদি দশটি প্রধান নৈতিক গুণ বোঝায়। ধর্ম অনুসরণ না করিলেই মলিন পুদ্গল বা বস্তুকণা জীবকে আচ্ছন্ন করে। এই কর্মসঞ্চয় দ্বারা জীবের বন্ধন হয়; ধর্ম অনুসরণ কর্মবন্ধন ক্ষয় করিয়া মুক্তির পথ সুগম করে।

ধর্ম

১০। উমাস্বামী—তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র

(৫) অনুপ্রেক্ষা হইল নৈতিক জীবনের ভিত্তি সম্পর্কে গভীর চিন্তন। এই চিন্তাগুলি হইতেছে,—জগৎ অনিত্য; সত্যই মানুষের একমাত্র আশ্রয়; পার্থিব অভিজ্ঞতা চক্রবৎ আবর্তিত হয়; নিজ কর্মের শুভ ও অশুভ ফলের দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের; জীব অজীব হইতে,—দেহ, মন, আত্মীয় বন্ধু সকলের হইতেই পৃথক; দেহ মল, ইত্যাদি অশুচি পদার্থপূর্ণ; প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া সুখান্বেষণে রত হইলেই কর্ম জীবকে বন্ধ করে; কি করিয়া আত্মশাসন ও সদভ্যাস গঠন দ্বারা কর্মের অবসান করা যায়; এই পৃথিবীর প্রকৃতি কি; বন্ধনমুক্তির জন্য প্রয়োজন সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান, সত্য আচরণ; কিন্তু এই পথে কি কি বাধা এবং মুক্তির প্রকৃত পথ কি—এই দ্বাদশ প্রকার মৌলিক বিষয়ে পুনঃ পুনঃ ও গভীর ধ্যান। এই চিন্তন দ্বারাই কর্তব্য সম্পাদন-বিষয়ে শৈথিল্য দূর হয় এবং নৈতিক জীবনের জন্য উপযুক্ত উদ্যম সৃষ্টি হয়।[১১]

অনুপ্রেক্ষা

পরিষহজয়

(৬) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, রোগজনিত নানা দুঃখকে উপেক্ষা দ্বারা ও ধৈর্য দ্বারা জয়ের অভ্যাস—ইহাই হইল পবিষহজয়।

পঞ্চব্রত

(৭) পঞ্চব্রত (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ) উদ্‌যাপনই সম্যক চারিত্র গঠন। চারিত্র গঠন দ্বারাই জীব কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

জৈন দর্শনে মোক্ষ

জীবের প্রকৃতি হইতেছে **অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত শক্তি** ও **অনন্ত আনন্দ**। কিন্তু কর্মের দ্বারা জীবের এই প্রকৃত গুণগুলি আচ্ছাদিত হয়। কর্ম বা কামনার শক্তি দ্বারা জড় বস্তুকণা বা পুদ্গল আকৃষ্ট হইয়া আত্মার স্বাভাবিক গুণগুলিকে মলিন আবরণে আবৃত করে। ইহাই কর্মবন্ধন। কিন্তু ইহা জীবের প্রকৃত অবস্থা নহে। তীর্থংকরদের জীবন ও উপদেশ নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া **সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান** ও **সম্যক্‌চারিত্র** এই **ত্রিরত্ন** লাভ করিয়া জীব সমস্ত বন্ধন ক্ষয় করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে।[১২]

সম্যগ্‌দর্শন

সম্যগ্‌দর্শন বলিতে জৈন ধর্মের মূলনীতি যথা—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্যরা এবং মোক্ষ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বিশ্বাস বোঝায়।

১১। সর্বার্থসিদ্ধি তত্ত্বসংগ্রহ—৯, ৪, ৬, ৭

১২। দ্রব্যসংগ্রহ—৩৯-৪০

সম্যগ্ জ্ঞান

সম্যগ্ জ্ঞান বলিতে সমস্ত সংশয়, অনিশ্চয়তা ও মোহ দূর করিয়া জীব ও অজীবের পার্থক্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ প্রতীতি বোঝায়।

সম্যক্ চারিত্র

সম্যক্‌চারিত্র দ্বারা পঞ্চ মহাব্রত উদ্‌যাপন নির্দেশ করে। এই ত্রিরত্নের সমন্বয় ঘটিলেই কামনা-বাসনা ধ্বংস হয়, কর্মের বন্ধন ক্ষয় হয়, এবং দগ্ধীভূত বীজ হইতে আর যেমন অঙ্কুরের উদ্গম হয় না, তেমনি জন্মমৃত্যুর সংসারচক্র ছিন্ন হয়। এই কর্মবন্ধন ও সংসারচক্র হইতে মুক্তিই মোক্ষ। এ বিষয়ে বৌদ্ধ দর্শন ও যোগ এবং অন্যান্য হিন্দু দর্শনের সঙ্গে জৈন দর্শনের মতের মিল লক্ষণীয়।[১৩] মোক্ষলাভ হইলে জীব তাহার স্বভাব লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

জৈন দর্শনে নিরীশ্বরবাদ ও পুরুষকার

ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে

জৈন দর্শন বলে যে অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। কেহই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে নাই, করিতে পারে না—কারণ ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। অনুমান দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ন্যায় দর্শনের যুক্তি হইতেছে যে, এই জগৎ সাবয়ব অর্থাৎ বহু অংশবিশিষ্ট, সুতরাং তাহার স্রষ্টা (architect) একজন কেহ থাকা দরকার—যিনি বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন করেন। কেবল মাত্র সরল বস্তুই নিত্য। কিন্তু নৈয়ায়িকদের যুক্তির মধ্যে সঙ্গতি নাই। তাঁহারা আকাশকে নিত্য বলেন, অথচ তাহাকে সাবয়ব বলিয়াও স্বীকার করেন। তাহা ছাড়া, সাবয়ব বস্তুর অবয়ব বা অংশগুলির সংযোগ সাধন করিতে হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরের তো কোন দেহ নাই বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, সুতরাং তিনি কি করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন ?

জগৎ সৃষ্টবস্তু নহে

জগৎ যে সৃষ্ট বস্তু, তাহারই বা প্রমাণ কোথায় ? আকাশে মেঘ বা ইন্দ্রধনু অথবা পৃথিবীর বুকে ঘাস আপনা হইতেই জন্মায়। তাহাদের জন্য কোন স্রষ্টা স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

আবার জগৎ যদি সৃষ্টিই হয় তবে তাহার একজন মাত্র স্রষ্টা না থাকিয়া বহু স্রষ্টাও তো থাকিতে পারেন ! নৈয়ায়িকেরা বলেন, একাধিক স্বাধীন স্রষ্টা স্বীকার করিলে বিশৃংখলা দেখা দিবে এবং সৃষ্টি ধ্বংস হইবে—সুতরাং কেবলমাত্র একজনই

১৩। তত্ত্বার্থাধিগম সার ৮—২, ৪, ৭

স্রষ্টা থাকিতে পারেন। ইহাও সুযুক্তি নয়। কারণ বহু মৌমাছি একত্র পরিশ্রম করিয়া সুন্দর ও পরিপাটি মৌচাক গড়িয়া তোলে।[১৪] একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ স্বীকার করিলে বিভিন্ন পৃথক বস্তুর পৃথক পৃথক কারণ আছে তাহা অস্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্পষ্টতঃই বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন পৃথক কারণ আছে।

জগৎ কি নিরপেক্ষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ?

পৃথিবীতে যে বৈচিত্র্য, সুখদুঃখ ভোগে যে পার্থক্য তাহা নিরপেক্ষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, ইহা প্রমাণ করে না। এক নিরপেক্ষ ঈশ্বরের পরিবর্তে বিভিন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাহাদেরই প্রত্যেকের অদৃষ্ট বা কর্মফল অনুযায়ী ঘটিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করাই সঙ্গত। সুতরাং জৈনগণ কর্মফলের অতিরিক্ত কোন ঈশ্বর স্বীকার নিষ্প্রয়োজন মনে করেন।

জীনদের পূজা বিধেয়

জৈনগণ বিশ্বাস করেন প্রত্যেক জীবের মোক্ষ তাহার নিজ চেষ্টা ও নিষ্ঠার ফল। তীর্থংকরদের পূত জীবন প্রত্যেক জীবের মোক্ষের পথপ্রদর্শক। জৈনগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না, কিন্তু 'অনন্ত চতুষ্টয়'—সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান, সম্যক্‌চারিত্র ও সম্যক্‌আনন্দের অধিকারী সিদ্ধ জীনদেব ধ্যান ও পূজার নির্দেশ তাঁহাদের শাস্ত্রে আছে। জৈনগণের পক্ষে প্রত্যহ 'পঞ্চ পরমেষ্টি'র (অর্হত, সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায় এবং সাধু) ধ্যান ও উপদেশ অনুসরণ বিধেয়। ঈশ্বর বা মহাপুরুষদের কৃপা মোক্ষের হেতু নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ মোক্ষ অর্জন করিতে হইবে।[১৫] বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ কালে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে অনুরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন, 'আত্মদীপা ভব'। উপনিষদেও একই কথা আছে—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী সত্য, কিন্তু চার্বাকবাদীদের মতো

জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী হইলেও নীতিহীন ও ধর্মহীন নহে

ইহা নীতিহীন ও ধর্মহীন নহে। সমস্ত জীবের প্রতি শ্রদ্ধা, পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন যাপন, সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার, বিনয় ও শুদ্ধাচার ও পুরুষকার জৈন ধর্মের বিশেষ প্রশংসনীয় লক্ষণ। জৈনধর্ম নীতিভিত্তিক ও আশাবাদী।

দেবতায় জৈনদের বিশ্বাস

জৈন দর্শনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী উচ্চপ্রশংসার যোগ্য, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) ও অধিবিদ্যার (metaphysics) ভিত্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। জৈন দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু দেবতা বিশ্বাস করে। বাস্তবিক পক্ষে মোক্ষপ্রাপ্ত সমস্ত জীবই দেবতা। এক পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা জৈনরা বিশ্বাস করেন। পরমেশ্বর

১৪। হেমচন্দ্র—স্যাদবাদ মঞ্জরী, পৃঃ ২৭-২৮

১৫। নেমিচন্দ্র—দ্রব্যসংগ্রহ পৃঃ ৫০-৫৪

যিনি তাঁহার তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই—কাজেই তিনি কখনও সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণসম্পন্ন তীর্থংকরগণই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মানুষকে তাঁহারা সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু এক বিশ্বব্যাপী সচেতন শক্তি ব্যতীত জগদ্ব্যাপারের সুব্যাখ্যা সম্ভব নয়। জৈনরা এক বিশ্বব্যাপী নৈতিক শক্তি বা কর্মকেই জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য এবং জীবের সুখদুঃখ ভোগের যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ন্যায় দর্শন ঠিকই

সমালোচনা

বলে যে কর্মফল বণ্টনের জন্য এক সচেতন বিশ্বশক্তি স্বীকার করিতে হয়। জৈনগণ জীব এবং অজীবের প্রভেদ অথচ পরস্পরের প্রভাব স্বীকার করেন এবং একথাও বলেন যে এককে সম্পূর্ণ করিয়া জানিলে অন্যকেও জানা যায়।[১৬] কিন্তু জীব ও অজীবকে যুক্ত করিবার জন্য এই দুই হইতে মহত্তর এক ঐক্যের শক্তিকে জৈন দর্শন স্বীকার করে না। ইহা একটি ত্রুটি বলিয়াই মনে হয়। জৈন দর্শন বহুবস্তুবাদী (pluralist)—একদিকে ইহা বহু জীব স্বীকার করে, অন্যদিকে ইহা বহু অণুর অস্তিত্বও স্বীকার করে। কিন্তু কি করিয়া এই বহু সত্তা ঐক্যবন্ধনে যুক্ত হয় সে সম্বন্ধে জৈন দর্শনে কোন সুব্যাখ্যা মেলে না। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এই অসম্পূর্ণতা লক্ষণীয়। সপ্তভঙ্গী নয়বাদে আমরা দেখি জৈন দর্শন প্রত্যেক বিষয়ে সাত প্রকার আংশিক বিচার স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সমন্বয় দ্বারা এক অখণ্ড সত্যে উপনীত হইবার কোন ব্যবস্থা নাই। পরমত সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়, কিন্তু বহু আংশিক সত্যেই দার্শনিক আলোচনা শেষ হইতে পারে না, একটি সম্পূর্ণ সমন্বয়ে পৌঁছা প্রয়োজন।[১৭] বাস্তবিক পক্ষে জৈন দর্শন জীবনের নৈতিক আদর্শ নির্ণয়ে যতটা আগ্রহী দার্শনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ততটা নয়।[১৮]

১৬। একো ভাবঃ সর্বথা যেন দৃষ্টঃ, সর্বে ভাবাঃ সর্বথাঃ তেন দৃষ্টাঃ
সর্বে ভাবাঃ সর্বথা যেন দৃষ্টাঃ, একো ভাবঃ সর্বথাঃ তেন দৃষ্টঃ
Jacobi—Jaina Sutras, Part I, P. 34

১৭। The truth is that the primary aim of Jainism is the perfection of the soul, rather than the interpretation of the universe—a fact which may be supported by the old statement that āsrava and samvara constitute the whole of Jaina teaching, the rest being only an amplification of them. As a result we fail to find in it an ultimate solution of the metaphysical problem.

Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy, P. 172-73

১৮। আস্রবোভব হেতুঃ স্যাত সংবরো মোক্ষকারণমঃ
ইতীয়ম আর্হতি দৃষ্টিরন্যদস্যাঃ প্রপঞ্চনম্
Madhvacharyya—Sarva-darsana samgraha

সংক্ষিপ্তসার

জৈন দর্শন জীবের নৈতিক আদর্শ নির্ণয়ে অধিকতর আগ্রহশীল। বৌদ্ধ দর্শনের মতোই জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী ; ইহারা উভয়েই বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করে। দৈনন্দিন জীবনে কৃচ্ছ্র সাধন ও জীবে অহিংসা জৈন দর্শনে চরমে উঠিয়াছে। জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী হইয়াও দেবতায় বিশ্বাস করে। বাস্তবিকপক্ষে মোক্ষপ্রাপ্ত সকল জীবই দেবতা। জৈন দর্শনে মোক্ষের ধারণা বহুশ্রুত। ইঁহারা জগৎ ও জীবনকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জীব হইল অজড় বস্তু। অ-জীব হইল জড় বস্তু। জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। অ-জীব হইল জড় অণু বা একাধিক অণুর সমন্বয়। জগৎকে জৈনরা চিরন্তন ও স্বয়ম্ভু বলিয়া বর্ণনা করেন। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। জৈনদেব সংখ্যাতীত বস্তুতে বিশ্বাস তাঁহাদিগকে 'অনেকান্তবাদী' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছে। তাঁহাবা বলেন যে, বস্তু সম্বন্ধে কোন কথাই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাই ইঁহাদিগকে 'স্যাদ্‌বাদী' ও বলা হয়।

জৈনরা অপরোক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান স্বীকাব করেন। তাঁহাদের মতে প্রমাণ হইল ত্রিবিধ —অপরোক্ষজ্ঞান, অনুমান ও শ্রুত। জ্ঞানকে পরস্পব-বিবোধিতা (self-contradiction) হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তাঁহাবা ব্যবহারিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্তরভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

অনুমান সম্পর্কে আলোচনায় জৈনবা নৈয়ায়িকদেব অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ব্যাপ্তিসম্বন্ধের উপব নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন কবা হয। বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেব নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রুতজ্ঞান আবার দ্বিবিধ— ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। পারমার্থিক ব্যাপারে তীর্থংকবদের মতই একমাত্র গ্রাহ্য।

জৈন দর্শনে নীতি-আলোচনা মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে। ইঁহাবা মনে করেন যে ভাবসম্বরই নৈতিক জীবনের ভিত্তি। ইহার জন্য জীবের ব্রত, সমিতি, গুপ্তি, ধর্ম, অনুপ্রেক্ষা, পরিষহজয় ও চারিত্র্য এই সাতটির প্রয়োজন। জীবেব প্রকৃতি হইতেছে অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দ। কিন্তু জীব আপন যথার্থ সত্তাটুকুকে উপলব্ধি করিতে পারে না, কেননা কর্ম জীবেব প্রকৃত গুণগুলি আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। জীবনে এই আচ্ছাদন অপনোদন করিতে হইলে তীর্থংকরদের জীবন ও উপদেশ নিষ্ঠার সহিত অনুসবণ করিয়া সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চরিত্র এই ত্রিরত্ন লাভ কবিতে হইবে। এইভাবে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবকে মোক্ষলাভ করিতে হয়।

জৈন দর্শনে নিরীশ্বরবাদ স্বীকৃত। জৈনবা পুরুষকারবাদী। তাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। জৈনরা জগৎকেও সৃষ্ট বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না। জগৎ যে একজন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, সে সম্বন্ধেও নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। বহু স্রষ্টাও থাকিতে পারেন। আবার জগৎ কি কোন নিরপেক্ষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট? এ সম্বন্ধেও জৈনরা সংশয়বাদী। তাঁহারা কর্মফলের অতিরিক্ত কোন কিছুতেই বিশ্বাস করেন না।

জৈনগণ বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক জীবের মোক্ষ তাহার নিজ চেষ্টা ও নিষ্ঠার ফল। তাই তাঁহারা পুরুষকারবাদী। তাই জৈনদর্শনে নীতিদর্শনের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ

করা হইয়াছে। জৈনরা নিরীশ্বরবাদী হইলেও নীতিহীন ও ধর্মহীন নহেন। ইঁহারা বস্তুর বহুত্বকে স্বীকার করেন; তাই ইঁহারা অনেকান্তবাদী। ইঁহারা 'ডগ্‌ম্যাটিক' নহেন। যে কোনও বিষয়ের আলোচনায় ইঁহারা আপনাদের মত ছাড়াও অপরবিধ মতবাদিতার সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেন। তাই ইঁহারা স্যাদ্‌বাদী। জৈন স্যাদ্‌বাদ আধুনিক মানসিকতার লক্ষণাক্রান্ত।

প্রশ্নমালা

1. Is Jaina Philosophy atheistic? Discuss.
2. Give a critical estimate of Jaina epistemology.
3. State and explain the main tenets of Jaina Ethics.
4. Is Jaina Philosophy anti-religious and unethical? Discuss with special reference to Jaina atheism.
5. Write short notes on:
   (a) Syādvāda
   (b) Anekāntavāda
   (c) Jīva and Ajīva
   (d) Vrata
   (e) Dharma
   (f) Moksa

চতুর্থ অধ্যায়

নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত

ধর্মনেতাদের জীবনকাহিনী সর্বদাই হৃদয়গ্রাহী ও গভীর নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ। সেই ধর্মজীবনের প্রাণপ্রদ কাহিনীগুলির মধ্যে করুণাবতার গৌতম বুদ্ধের জীবন-কাহিনী অতুলনীয়। তাঁহার সংসারত্যাগ, সত্যের অনুসন্ধান, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি, ধর্ম-চক্রপ্রবর্তন, ধর্মপ্রচার ও পরিনির্বাণ ইত্যাদি সমস্ত কাহিনীই অতীব মনোরম এবং শিক্ষাপ্রদ। অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার যে বাণী তিনি জগৎকে দান করিয়াছেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরঃ তাহা হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে আলোর পথ, মহৎজীবনের পথ দেখাইবে। তাঁহার তেজোময় জীবন ও উপদেশ পশুরক্তপ্লাবিত হিন্দুভারতকে গভীর মানবতার শিক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল। অন্ধ আচারের বন্ধনকে অস্বীকার করিবার প্রচণ্ড সাহস তাঁহার ছিল এবং ইহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায় যে বৌদ্ধধর্মের প্রচণ্ড আঘাত হিন্দুধর্মকে সচকিত করিয়া ভারতবর্ষেব জীবনে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল। তাই দৃষ্টিভঙ্গীর তীক্ষ্ণ বিরোধ সত্ত্বেও আজও হিন্দুধর্ম বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করে।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে গৌতম বুদ্ধের অলৌকিক জীবনকাহিনী যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত মনোজ্ঞভাবে রচিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের সমস্ত কাহিনীই সত্য

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে সিদ্ধার্থের জীবনকাহিনী

না-ও হইতে পারে, তবে তিনি যে ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন এবং বুদ্ধচরিত ও তৎকালীন অন্যান্য জীবনকাহিনীতে যে প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটামুটি সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কপিলাবস্তু রাজ্যের শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র কুমার সিদ্ধার্থ খ্রীঃ-পূর্ব ৬০০ হইতে ৫০০ সালের মধ্যে কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অনিন্দ্যকান্তি তরুণ রাজপুত্র রাজপ্রাসাদের বিলাস ও আরামের পরিবেশেই পরম আদরে লালিত হইয়াছিলেন। সেই যুগে বিদ্যাচর্চা ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তখনও লিখিত পুস্তকের প্রচলন হয় নাই। তাহা ছিল শ্রুতির যুগ—গুরুর উপদেশ শুনিয়া শিষ্যেরা তাহা কণ্ঠস্থ করিত। শিষ্যপরম্পরায় জ্ঞানের ধারা এই ভাবেই প্রভাবিত ছিল। বেদ-নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা বিত্তশালী ক্ষত্রিয়েরা পারলৌকিক সম্পদ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখনই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে

প্রতিক্রিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় উপনিষদের ব্রহ্মচিন্তায়। স্বভাবতঃই এই জ্ঞানের মার্গে তৃপ্তির পথ সর্বসাধারণের জন্য খোলা ছিল না। সুতরাং তরুণ সিদ্ধার্থের সময় বয়সোচিত প্রমোদ, ব্যসন, মৃগয়ায়ই ব্যয়িত হইত, জ্ঞানের চর্চা সামান্যই ছিল। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি পরমাসুন্দরী নিকট আত্মীয়া রাজকন্যা গোপাকে বিবাহ করেন। বহু বৎসর তাঁহাদের কোন সন্তানাদি হয় নাই। কিন্তু এই অলস বিলাস-ব্যসন ও সাংসারিক সুখ ও আরামের জীবনে এই চিন্তাশীল হৃদয়বান কুমার সিদ্ধার্থ অন্তরের তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইতে ছিলেন না। যিনি সর্বজীবের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জীবন কি তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে? তাঁহার নিজেরই অজ্ঞাতে তাঁহার অন্তর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—'কি এই জীবনের উদ্দেশ্য'? ভোগের সমস্ত উপকরণের মধ্যে থাকিয়াও তিনি অন্তরে জানিয়াছিলেন এই সুখ ও আরাম মিথ্যা—মানুষ এই স্বার্থকেন্দ্রিক ভোগের মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা পাইতে পারে না।[১] মনের এই অতৃপ্ত অশান্ত অবস্থায় তাঁহার জীবনে এমন কয়টি ঘটনা ঘটিল, যাহা তাঁহার জীবনের ধারায় আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিল।

সিদ্ধার্থের প্রশ্ন : জীবনের উদ্দেশ্য কি?

একদিন রথে চড়িয়া নগরভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন লোলচর্ম, শীর্ণ, চক্ষু নিষ্প্রভ ও কোটরগত, যষ্টিনির্ভর এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে। দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন। তিনি সারথি ছন্ন-কে (ছন্দক) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ব্যক্তির কি হইয়াছে?' ছন্ন উত্তর করিল, 'কুমার এই ব্যক্তি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হইয়াছে—জীবন যৌবনের এই পরিণতি।' এই দৃশ্যের স্মৃতি সিদ্ধার্থকে বিচলিত করিল। তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন। এই অবস্থায়ই আর একদিন ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন রোগযন্ত্রণায় বিকৃতমুখ এক ব্যক্তিকে। ছন্নকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—'রোগ দেহের অপ্রতিরোধ্য সঙ্গী! সকল মানুষকেই এই দুঃখ ভোগ করিতে হয়।' কুমার সিদ্ধার্থের মনে আর একটি গভীর রেখাপাত হইল! ইহার পরে আর একদিন তিনি দেখিলেন একটি বীভৎস শবদেহ বহন করিয়া, আত্মীয়স্বজন শোক-আর্তনাদ করিতে করিতে চলিয়াছে। কুমার সিদ্ধার্থ

তিনটি ঘটনা—সিদ্ধার্থের জীবনে পট পরিবর্তন

১। And it was amidst this life that a great discontent fell upon him. It was the unhappiness of a fine brain, that seeks employment. He lived amidst plenty and beauty, he passed from gratification to gratification, and his soul was not satisfied. It was as if he heard the destinies of the race calling to him. He felt that the existence he was leading was not the reality of life, but a holiday—a holiday that had gone on too long. H. G. Wells—The Outlines of History, Vol. I. P. 238

এমন দৃশ্য জীবনে পূর্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি অস্থির হইয়া ছন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ছন্ন বলিল, 'ইহা মৃত্যু, জীবদেহের ইহাই শেষ পরিণতি—ইহার হাত হইতে নিস্তার নাই।" সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সত্যই কি রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু—সংসারের এই সর্বব্যাপী দুঃখজাল ছেদনের কোন উপায়ই নাই ?

এমনই চিন্তায় মন যখন তাঁহার আলোড়িত, তখন একদিন দেখিলেন কৌপীন-বস্ত এক সন্ন্যাসী, সর্বঅঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, সম্বল শুধু ভিক্ষাপাত্র ও যষ্টি, কিন্তু বদন তাঁহার প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত—কোন সাংসারিক সম্পদে তাঁহার আকর্ষণ নাই, শীতগ্রীষ্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু জনতার শির এই রিক্ত সন্ন্যাসীর পায়েই শ্রদ্ধায় লুটাইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া সিদ্ধার্থের প্রতীতি জন্মিল, সংসারত্যাগই সংসারের সমস্ত আঘাত এড়াইবার একমাত্র উপায়। তিনি সংকল্প স্থির করিলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার কাছে সংবাদ পৌঁছিল, তাঁহার স্ত্রী এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজধানী দীপমালায় সজ্জিত হইল, নরনারী আনন্দে মত্ত হইল, সুবেশা নর্তকীদল রাজপ্রাসাদের সভাগৃহ বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নুপুরনিক্কণে মুখরিত করিয়া তুলিল। গৌতমের অন্তর বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল—"আর একটি নিগড় আমাকে বন্ধনের জন্য রচিত হইল।" রাত্রে তাঁহার নিদ্রা দারুণ দুঃস্বপ্নে ভাঙ্গিয়া গেল, যেন কেহ তাঁহাকে বলিল "ওরে তোর ঘরে আগুন লাগিয়াছে, ওঠ, পালা, পালা।" তিনি বুঝিলেন ডাক আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিবার উপায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যাতাগ করিয়া ছন্নকে ডাকিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে প্রবল বাসনা জন্মিল, একবার নিজ সন্তানকে বুকে নিয়া আদর করেন, প্রাণাধিক পত্নীর কাছে শেষ বিদায় চাহেন। বহু কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিলেন। গভীর অন্ধকারে বহুক্ষণ চলিয়া রথ নগরপ্রান্তে উপনীত হইল। অকস্মাৎ মার আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। মার সিদ্ধার্থকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন কর, আর অগ্রসর হইও না। আমি তোমাকে ধন দিব, রাজ্য দিব—তোমাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি করিব, বিপুল যশের অধিকারী করিব। আর যদি আমার বাক্যে কর্ণপাত না কর, তবে প্রতি পদক্ষেপে তোমাকে বাধা দিব, সাফল্যের শুভ মুহূর্ত যখন সমাগত, তখন ক্রোধ, লোভ, মোহ অতর্কিতে তোমাকে অভিভূত করিয়া তোমার সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। একদিন না একদিন, আমার বশ্যতা সকল মানুষের মতো তোমাকেও স্বীকার করিতেই হইবে। এখনও

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব

পুত্রের জন্ম

গৃহত্যাগ

সময় আছে, রাত্রি প্রভাত হইবার আগে ঘরে ফিরিয়া যাও।" কিন্তু সিদ্ধার্থ সংকল্পে অবিচল রহিলেন। রথ অগ্রসর হইয়া চলিল। রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া এক বালুকাপূর্ণ নদীতটে রথ থামিল। তিনি রথ হইতে অবতরণ করিয়া, তরবারি দ্বারা ঘন কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ছেদন করিলেন, দেহ হইতে সমস্ত অলংকার ও রাজপরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া সমস্তই ছন্নের হাতে অর্পণ করিয়া নদী পার হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। শীঘ্রই তিনি এক জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং নিজের বহুমূল্য পরিচ্ছদের পরিবর্তে ভিক্ষুকের দীনবাস অঙ্গে ধারণ করিলেন। ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিহারের অন্তর্গত রাজগীতে উপস্থিত হন। সেইখানেই গুহাবাসী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রথম ধর্মজীবনের পথ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আরও বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অনেক সাধুসন্তের উপদেশ গ্রহণ করেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার অন্তরের পিপাসার পবিতৃপ্তি হইল না। তাঁহার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া পাঁচজন ধর্মপিপাসু ব্যক্তি তাহাকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি এই পাঁচজন শিষ্য সমভিব্যাহারে বিন্ধ্য পর্বতের গুহায় সন্ন্যাসীদের উপদেশ অনুযায়ী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় রত হইলেন। তাঁহার এই কঠোর তপস্যার যশ "আকাশে বিলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির মতো" চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল। কিন্তু যে আলোকের সন্ধানে এই তপশ্চর্যা, সেই সত্যের আলোক তাঁহার অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল না। অনাহারে ও কঠোর তপশ্চর্যায় তাঁহার দেহ বিশুষ্ক হইল, তিনি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষে একদিন তাঁহার সম্বিৎ লুপ্ত হইল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, দৈহিক পীড়নের পথে আত্মার কল্যাণ মিলে না। তিনি তাঁহার অনুবর্তীদের কাছে খাদ্যগ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন এবং ঘৃণায় তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, গৌতম বনমধ্যে ভ্রমণকালে অস্পৃশ্য শবরকন্যা সুজাতার হস্ত হইতে পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। জাতিভেদ-জর্জরিত তৎকালীন ভারতে ইহা অসমসাহসিক সংস্কারমুক্ত মনের পরিচায়ক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার নিন্দায় দেশ ভরিয়া গেল। কিন্তু তিনি স্থির করিলেন, স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাপনই শ্রেষ্ঠ ধর্মের পথ—ইহাই তৎপ্রদর্শিত 'মঝ্ঝিমপন্থা (the middle path)। নিন্দা, প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি সত্যের সন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, জনে জনে সত্যের পথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং এমনই করিয়া তিনি পুণ্যতীর্থ

রাজগীতে আগমন

সিদ্ধার্থের তপশ্চর্যা

বারাণসীতে উপনীত হইলেন। সেখানে বহু সাধুসঙ্গ করিলেন—শেষে স্থির করিলেন, সত্যের কণ্টকাবৃত পথে সাথী মিলে না। একাই চলিতে চলিতে তিনি গয়ার নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষের তলে আসন স্থাপন করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'এই দেহ যদি ধ্বংস হইয়াও যায় তথাপি সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত আসন ত্যাগ করিব না—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

গয়ার নিকটে বোধিদ্রুমতলে তপস্যা

বোধিলাভে কৃতপ্রতিজ্ঞ সিদ্ধার্থ ধ্যানে মগ্ন হইলে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইল, কিন্তু সদ্ধর্মের রিপু মার সন্ত্রস্ত হইল। মার নানা উপায়ে ধ্যানের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত। এই মার-জয়ের অলৌকিক কাহিনী অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও ললিতবিস্তর গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে বুদ্ধচরিত গ্রন্থের অল্প কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি—"অতঃপর মার শাক্যমুনির শমতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, স্বীয় সৈন্যগণকে স্মরণ করিলেন। তখন বর্শা, প্রাস, গদা ও অসিহস্ত নানা আকৃতিযুক্ত অনুচর-সমূহ তাঁহাদের চতুর্দিকে আগমন করিল। তাহাদের কাহারো মুখ বরাহের ন্যায়, কাহারো মৎস্যের ন্যায়, কাহারো অশ্বের ন্যায়, কাহারো গর্দভের ন্যায়, কাহারো বা উষ্ট্রের ন্যায়, কাহারো ব্যাঘ্রবৎ, কাহারো ভল্লুকবৎ, কাহারো সিংহবৎ, কাহারো বা হস্তিবৎ! কেহ বা একচক্ষু, কেহ বা ত্রিশীর্ষ, কেহ বা বহুমুখ, কেহ বা লম্বোদর, কেহ বা পৃষোদর!

গৌতম কর্তৃক মার বিজয়

"...রাত্রির পূর্বভাগে শাক্যসিংহের সহিত মারের সেই যুদ্ধ দেখিয়া আকাশ নিষ্প্রভ হইল। পৃথিবী কম্পিত হইল! এবং চতুর্দিক সশব্দে জ্বলিয়া উঠিল।

"বায়ু সর্বত্র প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। নক্ষত্রগণ নিষ্প্রভ হইল! শশাঙ্ক দীপ্তিহীন হইল। রাত্রির অন্ধকার বিস্তৃত হইল এবং সমুদ্র-সমূহ সংক্ষুব্ধ হইল।

"...সেই বোধিবৃক্ষের মূলদেশ, হিংসাত্মক মারসৈন্যের দ্বারা সমাকীর্ণ দেখিয়া জগতের মোক্ষকারী ধর্মাত্মাগণ, অন্তরীক্ষে হাহাকার করিতে লাগিলেন।

"মহর্ষি কিন্তু ধর্মবিধির বিঘ্নকারী সেই মারসৈন্যকে অবস্থান করিতে দেখিয়া বিক্ষুব্ধ বা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি গোগণের মধ্যে সিংহের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন।

"...দেহ ও মনের দুঃখ ও সন্তাপরাশি, নিজের উপর বর্ষিত হইতে থাকিলেও শাক্যমুনি স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, আসন হইতে বিচলিত হইলেন না।"[২]

২। অশ্বঘোষ—বুদ্ধচরিত (অনুবাদ—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর), ত্রয়োদশ সর্গ, পৃ ৬৮-৭৯

মার তখন তাঁহাকে ধনরত্নের লোভ দেখাইয়া সংকল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল। বরবর্ণিণী লাস্যময়ী মোহময়ী নারীর রূপ ধরিয়া তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল। সংশয়রূপে তাঁহার অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করিল। অবশেষে সন্তানবতী জায়া যশোধারার মূর্তি ধরিয়া তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতেও সফল হইতে না পারিয়া, মার পরাজয় স্বীকার করিয়া বিরসবদনে পলায়ন করিল।[৩]

"অনন্তর ধৈর্য ও শমন্তনের দ্বারা মারবল জয় করিয়া সেই ধ্যানকোবিদ্ পরমার্থ-বিজিজ্ঞাসু হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

পূর্বজন্মকথা স্মরণ

"সর্বপ্রকার ধ্যানবিধিতে সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিলে রাত্রির প্রথম যামে তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের বিষয় স্মরণে আসিল। সংযতচিত্তে এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে 'কদলীগর্ভ নিঃসারের ন্যায় এই সংসার'—ইহাই তিনি স্থির করিলেন।

৩। Sir Edwin Arnold—তাঁহার প্রসিদ্ধ Light of Asia গ্রন্থে ইহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

Lo! Kāma waved his magic bow, and lo!
the band of dancers opened, and a shape,
Fairest and stateliest of the throng, came forth
Wearing the guise of sweet Yasodhara.
Tender the passion of these dark eyes seemed
Brimming with tears; yearning those outspread arms
Opened towards him: musical that moan
Wherewith the beauteous shadow named his name,
Sighing, "My Prince! I die for lack of thee!
What heaven hast thou found like that we knew
By bright Rohini in the Pleasure-house,
Where all these weary years I weep for thee?
Return Siddhartha! ah return. But touch
My lips again, but let me to thy breast
Once, and these fruitless dreams will end! Oh look!
Am I not she thou lovedst?" But Buddha said,
"For that sweet sake of her thou playest thus,
Fair and false Shadow! is thy playing vain;
I curse thee not who wearst a form so dear,
Yet as thou art so, are all earthly shows.
Melt to thy void again!" Whereat, a cry
Thilled trhrough the grove, and all that comely rout
Faded with flickering wafts of flame, and trail
Of vaporous robes.

Sir Edwin Arnold— The Light of Asia, P. 105-6

দিব্যচক্ষুলাভ

"দ্বিতীয় যাম অতীত হইলে, সেই অদ্বিতীয়-পরাক্রম, সর্ব-চক্ষুষ্মানগণের শ্রেষ্ঠ পরম দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন।

"অতঃপর সেই দিব্য, পরিশুদ্ধ চক্ষুর দ্বারা, নির্মল দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় জগৎকে তিনি দর্শন করিলেন।

"উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টকর্মা জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশ দর্শন করিয়া তাঁহার কারুণ্য বর্ধিত হইল।

* * * * *

"রাত্রির তৃতীয় যাম আগত হইলে, ধ্যানকোবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ সেই বোধিসত্ত্ব জগতের স্বরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

" 'হায় জীবগণ কেবল বৃথাই শ্রম করিতেছে, তাহারা বারংবার জন্ম, জরা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে!

" 'মোহ তাহাদের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়াছে। তাহারা অন্ধ হইয়া এই নিদারুণ দুঃখ হইতে নির্গমনের পথ দেখিতে পাইতেছে না! শির থাকিলেই শিরঃপীড়ার সম্ভাবনা! বৃক্ষ জন্মাইলেই তাহার পতন ও পাতন সম্ভব! সুতরাং জন্ম হইলেই জরা ও মৃত্যুর আগমন'—চিত্তে তাঁহার এই চিন্তা উদিত হইলে, তিনি জীবের উৎপত্তির হেতু এবং উহা নিরোধের উপায় সম্বন্ধে ভাবনা করিতে লাগিলেন।

গৌতমের বুদ্ধরূপে শান্তিলাভ

"অতঃপর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা তিনি সম্যক্‌ভাবে অবগত হইয়া, জগতের সম্মুখে বুদ্ধরূপে বিরাজমান হইলেন। তখন দগ্ধ-ইন্ধন অনলের ন্যায় তাঁহার পরম শান্তি লাভ হইয়াছে।"[৪]

এই বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁহার আলোকোদ্ভাসিত বদন হইতে এই উদান (inspired saying) ধ্বনিত হইল—

অনেকজাতিসংসারং সংধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খাজাতি পুনপ্‌পুনং।
গহকারক, দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসংখার গতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

এই সংসার আমাকে রুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে চিরকাল আমি অন্বেষণ করিয়াছি, দুঃখ বেদনাপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের এই আলয়ের যিনি নির্মাতা তাঁহাকে—এই

৪। অশ্বঘোষ—বুদ্ধচরিত (অনুবাদ—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর), চতুর্দশ সর্গ, পৃঃ ৮০-৮৫

অন্বেষণ ও সংগ্রামে ক্ষণকালের বিরতি ছিল না। হে গৃহকারক, পুনঃ পুনঃ এই জীবদেহের কারাগারের স্রষ্টা, তোমাকে আমি জানিয়াছি। আর তুমি বেদনার আলয় এই দেহ-কারাগারে আমাকে বন্দী করিতে পারিবে না—আর মায়া ও ছলনার আচ্ছাদনেও আমাকে আবদ্ধ করিবে না—এই গৃহের ভিত্তি আজ ধ্বংস—ইহার প্রাকার ধূলিসাৎ হইয়াছে—গৃহের আচ্ছাদনের নির্ভর গৃহকূট ভগ্ন—আজ আমি সংস্কারমুক্ত,—তৃষ্ণাসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।[৫]

"তাঁহার সেই ধ্রুবপদ লাভ হইলে, রাত্রির চতুর্থ যামে, চলমান ও অচল, সমস্তই নিশ্চল নিষ্কম্পরূপ ধারণ করিল। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টিপাত হইল। সমস্ত জগৎ যেন হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া গেল। কেহ কাহারও উপর রুষ্ট হইল না—কেহ পীড়িত রহিল না। কেহ কোনরূপ পাপাচরণ করিল না। সকলে শান্ত হইল। মনে হইল তাঁহার সহিত সমস্ত বিশ্বই যেন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

"সপ্তদিবস তিনি তাঁহার সেই সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। অতঃপর 'জগতে শান্তির বাণী প্রচার করিবেন'—তিনি তাঁহার এই সংকল্পের কথা স্মরণ করিলেন।"[৬]

* * * *

তিনি চিন্তা করিলেন, কাহার নিকট এই নূতন ধর্ম তিনি প্রচার করিবেন। প্রথমেই তাঁহার অরাড় কালাম ও উদ্রকের (ইহাদের নিকট হইতেই তিনি প্রথম ধর্মপথে চলিবার উপদেশ পাইয়াছিলেন) কথা স্মরণ হইল যে, ইহারাই তাঁহার নূতন গ্রহণ ধর্ম করিবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু ধ্যান-যোগে তিনি জানিলেন যে তাঁহারা উভয়েই মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার প্রথম পঞ্চশিষ্যের কথা স্মরণ করিলেন। ধ্যানে জানিলেন যে তাঁহারা বারাণসী আছেন। তখন "নবোদিত রবির ন্যায়, অজ্ঞান অন্ধকার দূরীকরণের জন্য শান্তির বাণী প্রচার করিতে, তিনি পুণ্য-ধাম বারাণসীতে গমন করিলেন।"

নূতন ধর্মের প্রচার

সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ প্রথমে ভগবান বুদ্ধকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্তি ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তাঁহাদের

৫। জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ;
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয় ॥
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বৌদ্ধধর্ম (২য় সং), পৃঃ ৩৫, ১৮৬

৬। অশ্বঘোষ—বুদ্ধচরিত (অনুবাদক—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) চতুর্দশ, সর্গ, পৃঃ ৮৫-৮৬

অন্তর জয় করিল। তাঁহারা নূতন ধর্ম গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধদেব পঞ্চ ভিক্ষুকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন? তাহা এই: "হে ভিক্ষুগণ! পরিব্রাজকগণ দুই অন্ত পরিত্যাগ করিবে। সেই দুই অন্ত কি? প্রথম, হীন গ্রাম্য ইতরজন-ভোগ্য, অনার্য, অনর্থসংযুক্ত কাম্যবস্তুর উপভোগ। দ্বিতীয়, দুঃখময়, অনার্য, অনর্থসংযুক্ত দেহ-নির্যাতন। এই দুই অন্ত অতিক্রম করিয়া তথাগত মধ্যমপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা সম্বোধ ও নির্বাণ লাভ করা যায়।"[৭] ভগবান বুদ্ধ-আবিষ্কৃত মধ্যমপন্থা (the golden mean) কি এবং তাহা কোন্ পথে, পরে তাহা আলোচনা করিব। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে দুই চরম পথকেই তিনি অনার্য বলিয়া ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজ প্রদর্শিত পন্থাকে আর্যপন্থা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের মতো তিনিও দাবি করিয়াছেন যে তিনি ধ্বংস করিতে আসেন নাই—পুরাতন পন্থাকেই পুনরাবিষ্কার করিয়া তাহার পরিপূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি একটি উপমা দিয়াছেন—"মনে কর, এক ব্যক্তি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুরাতন মার্গ, প্রাচীন পথ দেখিতে পাইল। প্রাচীন কালে এই পথে মনুষ্যগণ যাতায়াত করিত। তখনই সেই ব্যক্তি সেই পথ দিয়া গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে দেখিল যে, এক পুরাতন নগর, এক পুরাতন রাজধানী রহিয়াছে; প্রাচীনকালে বহু মানব এই স্থলে বাস করিত। এই নগর আরাম, উপবন ও পুষ্করিণী-সংযুক্ত এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তখন সেই ব্যক্তি রাজা ও রাজমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিল। তখন রাজা এবং রাজমন্ত্রী সেই নগরকে উদ্ধার করিলেন এবং কালে সেই নগর বহুজনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিযুক্ত, বর্ধিষ্ণু ও বিপুলতা প্রাপ্ত হইল; আমিও এই প্রকার পুরাতন পথ, পুরাতন মার্গ আবিষ্কার করিয়াছি। প্রাচীন কালে সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ এই পথে বিচরণ করিতেন।"[৮]

পঞ্চ ভিক্ষুর প্রতি উপদেশ

কোন কোন মূল বিষয়ে তাঁহার নূতন ধর্ম প্রাচীন হিন্দুধর্মেরই অনুসরণ করিয়াছে ইহা সত্য—(যেমন জন্মান্তরবাদ, দুঃখবাদ, যোগাভ্যাস দ্বারা দেহ ও মনের শুদ্ধি ও ধর্মপথের জন্য প্রস্তুতি)। কিন্তু কতগুলি বিষয়ে তাঁহার প্রবর্তিত পথ তৎকালীন প্রচলিত পথকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষকে নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছিল।

৭। সংযুক্ত নিকায়, ৫৬।১১।১-৪; বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ ১।৬।১৭,১৮

৮। সংযুক্ত নিকায়—১২।৬৫।১৯-২১ (অনুবাদ—মহেশচন্দ্র ঘোষ)

বুদ্ধ বেদের কর্মকাণ্ড এবং পশুবলির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। দেহের পীড়ন দ্বারা ধর্ম আয়ত্ত হয়, ইহাও তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। এক অচল, অটল, অপরিবর্তনীয় সত্যবস্তুতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না এবং আত্মার অমরতার আকাঙ্ক্ষাকেও তিনি মিথ্যা বন্ধন বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মে জৈন ধর্মের মতোই পুরুষকারের উপরই জোর। ভগবৎকৃপাদ্বারা এবং ভগবদ্‌পূজাদ্বারা মুক্তিলাভ হয়, ইহা তাঁহার শিক্ষা নয়। তাঁহার ধর্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক নয়, অন্ধ কর্মভিত্তিক নয়—তাহা নৈতিক আচরণভিত্তিক। তাঁহার ধর্ম বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ অথবা বিত্তশালী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য নহে—সর্বসাধারণের জন্য। এই ধর্ম জাতিভেদ স্বীকার করে না—পুরোহিত-তন্ত্র স্বীকার করে না। তাঁহার ধর্মোপদেশ তাই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নয়—ইতর সাধারণের বোধগম্য পালিভাষায়। তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মের অনেকগুলি নির্মম আচার ও বিশ্বাসকে কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করিয়া প্রাচীন হিন্দুধর্মের অচলায়তনে মুক্তির বাতাস বহাইয়াছিলেন। তাঁহার সাধনা ছিল সর্বমানবের মুক্তির জন্য—বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়। তাঁহার ধর্ম ছিল প্রেমের ও করুণার।

বুদ্ধ ছিলেন বৈদিক আচার-বিরোধী

সাংসারিক সুখ ও আরামের আকাঙ্ক্ষাকেই (তংহা বা তৃষ্ণা) সমস্ত দুঃখ এবং পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ বলিয়া তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সুতরাং কৃচ্ছ্রসাধনার পথ পরিহারের উপদেশ দিলেও বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার ধর্মে ত্যাগ ও সংসারবিমুখতার সুর অত্যন্ত প্রবল। ইহা এই ধর্মের ভবিষ্যৎ দুর্বলতার একটি প্রধান কারণ।[৯] এই ধর্মের আর একটি বিশেষত্ব ইহার সংঘবদ্ধতা। সংঘই এই ধর্মের কেন্দ্র। তাই

তংহা বা তৃষ্ণাই জন্ম ও দুঃখভোগের কারণ

৯। In certain other respects this primitive Buddhism differed from any of the religions we have hitherto considered. It was primarily a religion of conduct, not a religion of observances and sacrifices. It had no temples; and since it had no sacrifices, it had no sacred order of priests. Nor had it any theology. It neither asserted not denied the reality of the innumerable and often grotesque gods who were worshipped at that time. It passed them by.

...these differences between our general ideas and those Buddha must have possessed need not in any way prevent us from appreciating the unprecedented wisdom, the goodness and greatness of this plan of an emancipated life as Gautama laid it down somewhen in the sixth century before Christ...he did in practice direct his own life and that of his immediate disciples into one progressive adventure which was to spread the doctrine and methods of Nirvana or soul-serenity throughout our fevered world......One corruption was perhaps inherent in its teaching. Because the world of men had as yet no sense of the continuous effects of life, it was very easy to slip from the idea of renouncing self to the idea of renouncing active life....to lapse into mere monastic seclusion. H. G. Wells—The Outlines of History, Pp. 243-44

প্রত্যেক বৌদ্ধের প্রার্থনা—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।" বৌদ্ধধর্মের সহিত সংঘাতে হিন্দুধর্ম সচকিত হইয়া আত্মপরীক্ষায় রত হইয়াছিল। বুদ্ধপ্রচারিত মহামানবতার বাণী হিন্দু তাহার প্রাচীন উপনিষদের শিক্ষায় পুনরায় আবিষ্কার করিয়াছিল। কাজেই নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে সহায়ক হইয়াছিল।[১০]

বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সংস্কার

ক্রমেই বুদ্ধদেবের নূতন ধর্ম বহু মানুষকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে নিয়া কাশীর নিকটবর্তী সারনাথে এক মৃগবিরচিত কানন-(মৃগদাব) মধ্যে পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন। সেই আশ্রমে এক পুণ্য বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি শিষ্যদের কাছে তাঁহার সদ্ধর্মের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেন—ইহারই নাম ধর্মচক্র প্রবর্তন। তাঁহার শিষ্যেরা এবং তিনি নিজে দেশের দিকে দিকে তাঁহার নূতন ধর্মের বাণী প্রচারে বহির্গত হইতেন, এবং বর্ষাকালে সকলে পর্বতগুহায় একত্র মিলিত হইয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ভারতের বুকে যত ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে তাহার মধ্যে বুদ্ধধর্মই একমাত্র প্রচারধর্মী এবং সংঘকেন্দ্রিক। ক্রমশঃই এই নূতন ধর্ম জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিল এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরাও বুদ্ধের শরণ লইলেন। বুদ্ধদেব ভিক্ষুবেশে পিতা শুদ্ধোধনের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পিতা, মাতা, স্ত্রী যশোধরা ও পুত্র রাহুল সকলকেই নূতন ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমশঃ এই নূতন ধর্ম রাজসমর্থন লাভ করিল, এবং প্রচারকদের উৎসাহে দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। পরম পরাক্রান্ত সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম

ধর্মচক্র প্রবর্তন

১০। "ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল—'সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি—যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।'

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি মুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব-হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল।" রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব, পৃঃ ৪৮-৪৯

গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার আনুকূল্যে দক্ষিণে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, উত্তরে নেপাল, তিব্বত, চীন, পূর্বে শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, পশ্চিমে গান্ধার (আফগানিস্থান) ইত্যাদি বহু বিস্তৃত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করিল। ভগবান বুদ্ধদেব সার্ধশতাব্দী যাবৎ নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে (বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার কাসিয়া নামক গ্রাম) মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

ভগবান বুদ্ধের সহজ সরল নৈতিক জীবনভিত্তিক করুণার্দ্র মৈত্রীর শিক্ষা সহজেই লোকচিত্তকে জয় করিয়াছিল। তিনি দুর্বোধ্য দার্শনিক কূটতত্ত্বের উপর তাঁহার ধর্মকে স্থাপন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,

বুদ্ধের নীতিশিক্ষা সর্বজনগ্রাহ্য

সব্ব পাপস্স অকরণং কুশলস্স উপসম্পদা
সচিত্তপরিয়োদননম এতান্ বুদ্ধানুসাসনং।

সর্বপাপের অকরণ, কুশলকর্মের সম্পাদন ও স্বচিত্তপরিশোধন, ইহাই হইতেছে বুদ্ধগণের উপদেশ।[১১] মানুষের মুক্তির উপায়—যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন নয়। সমস্ত দুঃখের হেতু হইতেছে অনিয়ন্ত্রিত বাসনা-কামনা বিষয়তৃষ্ণা। ইহাই পুনঃ পুনঃ জন্ম ও সর্বপ্রকার দুঃখবেদনা, মোহ ও শৃংখলের কারণ। প্রত্যেক মানুষকেই তাহার কর্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং কামনা-বাসনা-তৃষ্ণার অবসানই দুঃখের মূল উৎপাটনের একমাত্র পথ। এই পথে চলিতে হইলে, সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সত্যআচরণ ইত্যাদি নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার মধ্যে অলৌকিক বা গুহ্য কিছু নাই। কামনা-বাসনার দাহের আত্যন্তিক অবসানই নির্বাণ বা মোক্ষ। এই পথ অনুসরণ করিলে প্রত্যেক মানুষই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা যেমন বন্ধন, সাংসারিক সম্পদলাভের আকাঙ্ক্ষা, এমন কি, পরকালে অমর জীবনলাভের আকাঙ্ক্ষাও তেমনি বন্ধন। জীবে দয়া—অহিংসা, মৈত্রী ও করুণাই বৌদ্ধধর্মের প্রাণস্বরূপ। ভগবান বুদ্ধের ধর্মপথ শুধু

বুদ্ধপ্রদর্শিত ধর্মপথ অস্তিবাচক

নেতিবাচক নয়—শুধুমাত্র কামনা-বাসনা ত্যাগ নয়—তাহা অস্তিবাচক—সমস্ত জীবকে সর্বাপেক্ষা আপন বলিয়া ভালবাসা, আপন বলিয়া চিন্তা করা, আপন বলিয়া মৈত্রী ও করুণার সম্পর্কে যুক্ত হওয়া। "এ তো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালার নাম 'মেত্তিভাবনা'—মৈত্রীভাবনা।

১১। ধম্মপদ, বুদ্ধবগ্‌গ ১৮৩

"প্রতিদিন এই কথা ভাবিতে হইবে : সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানংপরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

"সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধসম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক।"[১২]

কিন্তু এই মৈত্রীভাবনা হৃদয়ে ক্রোধ, লোভ, ভয় বা ঈর্ষা থাকিলে তো সত্য হইতে পারে না। তাই একটি একটি করিয়া পাঁচটি ব্রত বা শীল গ্রহণ, আচরণ ও উদ্‌যাপন করিয়াই তাহা সম্ভব। ইহাই বিখ্যাত পঞ্চশীল।[১৩] যাঁহারা এই সদ্ধর্মের পথিক (আর্যশ্রাবক) তাঁহারা প্রতিদিন এই শীলসমূহকে এই বলিয়া অনুস্মরণ করিবেন—

পঞ্চশীল

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি, ভুজিস্‌-সানি, বিঞ্ঞুপ্পসত্থানি, অপরামট্‌ঠানি, সমাধিসংবত্তনি-কানি।

অর্থাৎ, আমার শীল খণ্ডিত হয় নাই, ইহাতে ছিদ্র হয় নাই, আমার এই শীল অনিচ্ছাকৃতভাবে রক্ষিত হয় নাই, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নাই, এই শীল ধন মান ইত্যাদি কোন স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নাই এবং এই শীল মুক্তিপ্রদায়ক।

এইপ্রকার নিষ্ঠাযুক্ত সাধনা দ্বারা আর্যপন্থায় বিচরণ করিয়া সমস্ত তৃষ্ণার দাহনির্বাণ হইয়া হৃদয় সর্বপ্রাণীর প্রতি প্রেমপূর্ণ হইলেই মুক্তি। ইহাকে ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারও বলিয়াছেন।—"মাতা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজ আয়ু দ্বারা রক্ষা করেন, যাঁহার ব্রহ্মবিহার লাভ হইয়াছে তিনি সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস দ্বারা রক্ষা করিবেন।"

সর্বজীবে প্রেমই মুক্তির পথ—ইহাই ব্রহ্মবিহার

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বুদ্ধদেব

১৩। (১) পানং না হানে : প্রাণীকে হত্যা করিবে না—ইহা প্রথম শীল বা প্রতিজ্ঞা
(২) ন চ দিন্নমাদিয়ে : যাহা তোমার প্রাপ্য নয়, তাহা গ্রহণ করিবে না—ইহা দ্বিতীয় শীল
(৩) মুসা ন ভাসে : মিথ্যা কথা বলিবে না—ইহা তৃতীয় শীল
(৪) ন চ মজ্জপো সিয়া : মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিবে না—ইহা চতুর্থ শীল
(৫) ন কামেসু মিচ্ছাচারা : কামজনিত ব্যভিচারে রত হইবে না—ইহা পঞ্চম শীল।

এই পাঁচটি বিষয়ে শীলগ্রহণ খুদ্দকপাঠে এইভাবে দেওয়া হইয়াছে :

(১) পানাতিপাতা বেরমণী সিকখাপরং সমাদিযামি।
(২) আদিন্নাদানা " " "
(৩) কামেসু মিচ্ছাচারা " "
(৪) মুসাবাদা " " "
(৫) সুয়ামেরয়—মজ্জ পমাদট্‌ঠানা "

"অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন, সেই রকম ভালোবাসা।"

"ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে ; এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে তো ব্রহ্মবিহার হল না।" "যিনি ব্রহ্মবিহার লাভ করেন তিনি শান্তি লাভ করেন, তিনি সরল, শক্তিমান্, মিষ্টভাষী, মৃদু, নম্র ও নিরভিমানী হন। তিনি সন্তুষ্টহৃদয়, নিরুদ্বেগ, স্বল্পভোজী, শান্তিপ্রিয়, সদ্‌বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ ও সংসারে অনাসক্ত হন। তিনি এমন কোন সামান্য অন্যায় আচরণও করেন না, যাহার জন্য অপর কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারে। তিনি অবিরত কামনা করেন—সকল প্রাণী সুখী হোক্, নিরাপদ হোক্, সুস্থ হোক্।"[১৪]

উপনিষদের ব্রহ্মবিহারের আদর্শ

ইহা সহজেই বুঝা যায় এই ব্রহ্মবিহারের আদর্শ উপনিষদের আদর্শ হইতে যেমন অভিন্ন—আধুনিক যুগের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিতও ইহার সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে।[১৫]

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার উপদেশ ও আলোচনা সাধারণের বোধগম্য পালিভাষায় মুখে মুখে প্রচার করিয়াছিলেন। সেকালে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার বাণী নানা দেশে প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ধর্মগুরুর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু কাল্পনিক ও অলৌকিক আখ্যায়িকা পরে যোগ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের সহজ সরল উপদেশ, তাঁহারা সব সময় সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া, নিজেদের মনগড়া মত, বুদ্ধের মত বলিয়া তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন। এমন করিয়া বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বহু প্রক্ষিপ্ত ও বিকৃত মত প্রাচীন বুদ্ধমতকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। সুতরাং বুদ্ধের পরিনির্বাণের অত্যল্পকাল

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বুদ্ধদেব

১৫। চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত ধম্মপদের (১ম সং, ১৯০৪) ভূমিকাতে পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন "অনেক স্থলে মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের বচনের সঙ্গে ধম্মপদ প্রভৃতি পালি গ্রন্থের বচনের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়। ধম্মপদের কোধবগ্‌গে আছে

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং

ধম্মপদ ১৭।৩

পরেই বুদ্ধের উপদেশ ও দার্শনিক মতগুলি সংকলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। "এই সংকলন কার্যের সূত্রপাত হয় রাজগৃহের মহাসংগীতিতে (খ্রীঃ-পূঃ ৪৭৭), এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বুদ্ধদেবের বিশ্বস্ত শিষ্য সম্প্রদায়। কিন্তু তখন সংকলন কার্য স্পষ্টতঃই সম্পূর্ণ হয় নি এবং মতভেদেরও অবসান ঘটে নি। তাই আরও একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসংগীতি (খ্রীঃ-পূঃ ৩৭৭) আহ্বানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর তৃতীয় মহাসংগীতি আহূত হয় পাটলিপুত্রে, প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে, (খ্রীঃ-পূঃ ২৪৭)। এই তৃতীয় কিস্তিতে বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য যে রূপ ধারণ করে, বৌদ্ধগণের মতে তাই রাজপুত্র (মতান্তরে রাজভ্রাতা) মহেন্দ্র তাম্রপর্ণী অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে নিয়ে যান। সেখানে এই বিপুল সাহিত্য আরো দুশো বৎসর মুখে মুখেই সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয় এবং অবশেষে সিংহলরাজ বট্টগামনির (খ্রীঃ-পূঃ ৮৮-৭৬) শাসনকালে স্থায়িভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত এবং ত্রিপিটক নামে পরিচিত। এর ভাষার নাম পালি।··· ত্রিপিটকের তিনটি বিভাগের নাম যথাক্রমে বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। বিনয়পিটকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অনুশাসনাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। সুত্তপিটকে আছে বুদ্ধের বাণী ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের বিবরণ। আর অভিধম্মপিটকে আছে ওই ধর্মের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। ইতিহাসের বিচারে পিটকত্রয়ের মধ্যে সুত্তপিটকের মূল্যই সবচেয়ে বেশি।···বুদ্ধের জীবন চরিত ও বাণী, তাঁর প্রচারিত ধর্ম এবং তাঁর প্রধান শিষ্যবর্গের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্বনই এই সুত্তপিটক।"[১৬] বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা ধম্মপদ গ্রন্থটিও এই সুত্তপিটকের অন্তর্গত।

বুদ্ধের উপদেশ ও ধর্মমত সংকলন

ভগবান বুদ্ধের প্রাচীন মত দক্ষিণে সিংহল এবং ক্রমে সেখান হইতে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোডিয়ায় প্রসারলাভ করে। বৌদ্ধধর্মের এই শাখা হীনযান নামে খ্যাত।

মহাভারত উদ্‌যোগ পর্বে অবিকল সংস্কৃত অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্।

মহাভারত, উদ্‌যোগ পর্ব, ৩৮।৭৩-৭৪

মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে "নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে কেবল অবর বিষয়ে তাহা নহে, মৌলিকতত্ত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই, নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।" মহেশচন্দ্র ঘোষ—বুদ্ধের ধর্মে ব্রহ্মের স্থান ও বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ, প্রবাসী, ১৩১৮ শ্রাবণ ও ভাদ্র

১৬। প্রবোধচন্দ্র সেন—ধম্মপদ পরিচয়, পৃঃ ৮-৯

ইঁহাদের সমস্ত গ্রন্থই প্রায় পালি ভাষায়। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন মতের প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে, দর্শন ও অধিবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রধান। জীবনের প্রধান সমস্যা, দুঃখ এবং এ দুঃখ জয়ের উপায় এবং নৈতিক জীবনের পথ প্রদর্শন। তাহার আবেদন ছিল সাধারণ মানুষের কাছে, কাজেই তাহার ভাষা ছিল ইতরজনের ব্যবহৃত ভাষা পালি। কিন্তু যখন পণ্ডিত হিন্দু দার্শনিকদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইল, তখন বৌদ্ধধর্মের দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিতর্কমূলক বৌদ্ধ-দর্শনের পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এবং নূতন ধর্মের জন্য শিষ্যসংগ্রহের উৎসাহে ভগবান বুদ্ধের প্রাচীন ধর্মমতের অনেক পরিবর্তন ও ঘটিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের এক নূতন শাখার উদ্ভব হইল, তাহার নাম মহাযান। এই ধর্মমত নেপাল, ভুটান, তিব্বত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, চীন ও জাপানে প্রসারলাভ করে। বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া যাওয়াতে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় বিশ্বাস, আচার, পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে এবং বহু শতাব্দী যাবৎ ক্রমবিকাশের ফলে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বহু বিকার, বহু স্বতঃ-বিরোধিতা, এবং বহু অলৌকিক কুসংস্কার, ইহার প্রাচীন রূপটিকে আচ্ছন্ন করে। শ্রীশংকরাচার্যের প্রভাবের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পালি ত্রিপিটকও ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হারাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ইত্যাদি দেশ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিতে প্রচারিত হীনযানকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এবং বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের চেষ্টায়ই অনুবাদের মধ্য দিয়া ত্রিপিটকের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। অনুরূপভাবে মহাযানী বৌদ্ধ দর্শনের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ নেপাল, ভুটান, তিব্বত হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে।[১৭] কিন্তু ভগবান বুদ্ধের প্রাচীন সরল, সুন্দর, মানব-কল্যাণকর মত বুঝিতে হইলে ত্রিপিটকের সুত্তপিটকই আমাদের পক্ষে প্রধান উপাদান। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম মানুষকে এবং মানুষের মুক্তিকেই সর্বোচ্চ মূল্য দিয়াছে—পুরুষকার দ্বারা, ব্যক্তিগত সাধনা দ্বারা, সৎজীবন যাপন দ্বারা মানুষ দুঃখ-ক্লেশের বন্ধন ক্ষয় করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে পারে, ইহাই ছিল বুদ্ধের শিক্ষা। তাই প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে আত্মনিষ্ঠার উপরে সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। পরিনির্বাণের পূর্বে বুদ্ধ প্রধান শিষ্য আনন্দকে

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার

হীনযান ও মহাযান

১৭। Humphreys—Buddhism

এই উপদেশ দিয়াছিলেন—

অত্তদীপা, অত্তসরণা, অনঞ্ঞসরণা বিহরথ
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা বিহরথ।

নিজেই নিজের পথ দেখাইবার প্রজ্জলিত দীপশিখা হও (অথবা আত্মার ও ধর্মের দ্বীপ রচনা করিয়া তাহাতে আশ্রয় নাও), আত্মা ও ধর্মেরই শরণ নাও, আর কাহারও নয়।[১৮] এই আত্মনিষ্ঠা ও নৈতিক আচরণের প্রতি জোর হীনযানে অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন ও অতি কঠোর আত্মপীড়নে পরিণত হয়। মহাযানে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শুধু নৈতিক উপদেশ, শুষ্ক এবং শূন্যবাদ সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারে না। হীনযান বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবির ধর্ম। মহাযান এই অভাব পূর্ণ করিয়া হৃদয়াবেগ ও পূজাভক্তিকে ধর্মজীবনে মস্ত স্থান দিয়াছে। বুদ্ধ দেবপূজা বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাযান বুদ্ধকেই দেবতার স্থানে বসাইল; পূজা, অর্চনা, অলৌকিক কাহিনী দ্বারা সাধারণ মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিল। অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মের প্রচার, গুরুবাদ ও নামমাহাত্ম্য ইত্যাদি দক্ষিণে দ্রাবিড় সভ্যতা হইতেই ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সম্ভবতঃ দ্রাবিড় সভ্যতা ও পরবর্তীকালের বৈষ্ণব-ধর্ম বৌদ্ধধর্ম দ্বারাই গভীরভাবে প্রভাবিত। বৌদ্ধমন্দিরে এককালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত, তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া বৈষ্ণবেরা দাবি করিয়াছে এবং রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণ নিজেদের উৎসব করিয়া নিয়াছেন।

"বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনেরই পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ আদর্শ, তবু দেশ কাল পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে সে আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন ইহার কোন একটা দিকই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। হীনযান ও মহাযানে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজাভক্তি বুঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোন মহৎসত্তাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে—আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ ও রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।"[১৯]

বৌদ্ধধর্মের ত্রিমুখ—
বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ

১৮। দীঘনিকায়, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত। ধম্মপদেও অনুরূপ উপদেশ আছে—নিজেই নিজের আশ্রয়, অন্য আশ্রয় আর কে হইবে? নিজেকে দমযুক্ত অর্থাৎ সংযত করিলেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ হয়। অত্তবগ্গ ৪

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বুদ্ধদেব, পৃঃ ৩৫

হীনযান আত্মশক্তিতে মানুষকে বলিষ্ঠ করিয়া নিজ মুক্তিসাধনার কথা বলিয়াছিল। হীনযান কথার অর্থই হইল প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মুক্তির জন্য সাধনা করিবে। যে পথে তাহা সম্ভব হইবে, তাহারই উপদেশ আছে হীনযানে। কিন্তু ইহারই প্রতিক্রিয়া দেখি মহাযানে। মহাযান বলে, করুণাময় বুদ্ধের আশ্রয়গ্রহণ দ্বারাই সর্বজীবের মুক্তি। তিনিই মহাযান। হোনেন স্পষ্টই বলিয়াছেন, "কখনোই ইহা মনে করিও না যে আমরা স্বকর্মের বলে নিজের নিজের সাধনায় ও চেষ্টায় পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি। নিতান্ত যে অসাধু সে-ও বুদ্ধের অমিত করুণা ও শক্তির প্রভাবে পরমগতি লাভ করে।"[২০] বাস্তবিক পক্ষে দীর্ঘ বহু শতাব্দাব্যাপী ও বহু বিভিন্ন দেশে প্রচারিত এই ধর্মে বহু বিচিত্র এবং কখনও কখনও বিরুদ্ধ উপাদান ও মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যায় হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। তাই বৌদ্ধমতের সম্পূর্ণ আলোচনা অত্যন্তই কঠিন। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলিই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন

ভগবান বুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষের জীবনের মূল সমস্যা দুঃখ- ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি। কিন্তু জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ আশু সমস্যা সমাধানে তত্ত্বকথার ততটা প্রয়োজন নাই—যতটা প্রয়োজন সংযত জীবনযাত্রার। কিন্তু জীবন নিয়ন্ত্রণের সত্য পথ কি, তাহা স্থির করিতে হইলেও দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাই সুত্তপিটকে ভগবান বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের সঙ্গেই অভিধম্মপিটকে দার্শনিক নানা তত্ত্বের আলোচনা আছে।

বুদ্ধ ছিলেন তত্ত্ববিমুখ

বুদ্ধদেব ইহা জানিয়াছিলেন যে, অধিকাংশ মানুষই সত্যকে আংশিক ভাবে জানে মাত্র, অথচ তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহার ফলে নানা প্রমাদে পতিত হয়। তিনি অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তী-দর্শনের

২০। মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার ও দর্শনের ব্যাখ্যার জন্য Mr. D. K. Suzukiর Outlines of Buddhism ও Mrs. Suzukiর Mahāyāna Buddhism দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অধিকাংশই মহাযান সম্পর্কেই গবেষণা করিয়াছেন। মহাযানীরা তাঁহাদের মতকেই প্রাচীন বৌদ্ধমত বলিয়া বিশ্বাস করেন।

সুপরিচিত কাহিনী তাঁহার শিষ্যদের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক অন্ধ ব্যক্তিই হস্তীর বিভিন্ন অঙ্গ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ বলিয়াছিল, যে হাতী থামের মতো, কেহ বলিল, না, হাতা কুলার মতো ; আবার আর একজন বলিল, হাতী দেয়ালের মতো : এবং চতুর্থ আর একজন বলিল, হাতী দড়ির মতো। ইহারা কেহই হাতীকে সত্য করিয়া জানে নাই। তেমনি বুদ্ধ বলিলেন, প্রাচীন দার্শনিকেরা আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে এক এক জনে এক এক রকম কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা কেহই সত্যকে জানেন না। এ সমস্তই বৃথা জল্পনা-কল্পনা।[২১] বুদ্ধদেব মনে করেন, আত্মার স্বরূপ, ভগবানের প্রকৃতি ইত্যাদি দশটি প্রশ্ন আছে, যাহাদের আলোচনা জীবনের মূল সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্যই করে না, সুতরাং এই প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ফল। এই প্রশ্নগুলিকে তিনি 'অব্যাকতানি' আখ্যা দিয়াছেন।[২২] তিনি একটি আখ্যায়িকা দ্বারা তাঁহার বক্তব্য আরও স্পষ্ট করিয়াছেন। এক রাজা একদা বনে শিকার করিতে গিয়া তাঁহার বন্ধু ও অনুগামীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। সহসা একটি শর আসিয়া অতর্কিতে তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হয় এবং সাংঘাতিক আহত হইয়া তিনি চীৎকার করিতে থাকেন। তাঁহার চীৎকারে সঙ্গের লোকজন ছুটিয়া আসিলে, ক্ষত হইতে সেই শর উৎপাটনের চেষ্টা ও ক্ষতমুখে রক্তমোক্ষণ বন্ধের কোন চেষ্টা না করিয়া তিনি নানা অবান্তর প্রশ্ন করিতে থাকেন : কোন্ দিক হইতে এই শর নিক্ষিপ্ত হইল ? যে এই শরসংযোগ করিয়াছে, তাহার জাতি, কুল, পদবী কি ? ইত্যাদি। ফলে অবিলম্বেই সেই রাজার মৃত্যু ঘটিল।[২৩]

বুদ্ধদেব বলিলেন, দার্শনিকেরাও এই নির্বোধ রাজার মতো ভবরোগের নিদান অনুসন্ধান না করিয়া নিতান্ত অবান্তর নানা কূট প্রশ্ন নিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিতেছেন।

বুদ্ধ যে চারিটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন, তাহা হইল, জীবনের মূল সমস্যা ও তাহার সুসমাধানের উপায়। এই চারিটিকে তিনি বলিলেন, **চত্বারি আর্যসত্যানি**। প্রথম হইল দুঃখ,—এই জগৎ দুঃখময়। দ্বিতীয় হইল দুঃখ সমুদায়,—দুঃখের কারণ-

বুদ্ধ-আবিষ্কৃত চারিটি সত্য

২১। Rhys Davids—Dialogues of Buddha I, Pp. 187-8
২২। " " —Potthapada Sutta, Dialogues, Pp. 254-5; also সংযুত্ত নিকায়—অব্যাকতা সংযুত্ত
২৩। মজ্‌ঝিম নিকায় ৬৩।

শৃংখল আছে। তৃতীয় দুঃখনিরোধ, দুঃখের যেমন কারণ আছে, তাহার অবসানও আছে। চতুর্থ দুঃখনিরোধমার্গ, দুঃখনিরোধের উপযুক্ত পথও আছে। এই প্রশ্নগুলিই জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম।[২৪]

প্রথম আর্যসত্য : দুঃখ

সমস্ত জগৎ জুড়িয়া মানুষের এই হাহাকার—"যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না!" ইহা শুধু মানবের আর্তনাদ নয়, সমস্ত জীবেরই এই ক্রন্দন। রক্তসাগরে জীবের জন্ম, অশ্রুসাগরে তাহার বিদায়। জন্ম দুঃখময়, জরা দুঃখময়, ব্যাধি দুঃখময়, মৃত্যু দুঃখময়, প্রেমের পশ্চাতে থাকে উদ্বেগ, ভোগের পশ্চাতে থাকে অবসাদ। প্রিয়জনবিরহে দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগে দুঃখ; আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ জীর্ণ করে, কামনার উত্তেজনা আয়ুক্ষয় করে। চার্বাক বলিয়াছিলেন যথাসম্ভব দুঃখ এড়াইয়া সুখ ভোগ করিতে। কিন্তু

দুঃখ

যাঁহারই দূরদৃষ্টি আছে, তিনিই জানেন দুঃখের মূল্যেই জীবনের সম্ভোগ ক্রয় করিতে হয়—দুদিনেই ভোগের বস্তুর অবসান ঘটে।[২৫] এ দুঃখবাদ জীবন সম্বন্ধে গভীর অভিনিবেশ- ও চিন্তা-সম্ভূত। ইহা ভারতীয় দর্শনের একটি মূল সুর। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী, কিন্তু নিরাশাবাদী নয়। জীবনের আদিতে দুঃখ, কিন্তু জীবনের সার্থকতা এই দুঃখজয়ে—ইহাই ছিল সিদ্ধার্থ গোতমের পণ। এবং সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

২৪। দীঘনিকায় সুত্ত, ২২ (Tr. Warren, P. 368)

২৫। আধুনিক যুগে সোপেনহাউয়ের-ও এই প্রাচীন মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, The life of most men is but a continuous struggle for existence,—a struggle which they are bound to lose at last. Every breath we draw is a protest against the d eath which is constantly threatening us, and against which we are battling every second. But death must conquer after all, for we are his by birth, and he simply plays with his prey a little while longer before devouring it. We however take great pains to prolong our lives as far as we can, just as we blow soap bubbles as long and as large as we can, though we know with absolute certainty that they must break at last. Schopenhauer—The World as Will and Idea.

দ্বিতীয় আর্যসত্য : দুঃখ সমুদায়

বুদ্ধ এই দুঃখের সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, দুঃখ তো একটি কার্য, এবং ইহা যখন কার্য, তখন ইহার কারণও নিশ্চয়ই আছে। সোপেন্‌হাউয়ের বলিয়াছিলেন, জীবনের মধ্যেই আছে দুঃখের বীজ। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ আরও বহু গভীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, জীবনেরই বা হেতু কি? বর্তমান জীবন তো অতীত বহু জীবনের কর্মের ও সংস্কারের ফল। আবার বর্তমান জীবনের কর্ম ও আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের ভোগের বীজ বপন করে। এমনি করিয়া অনন্তকাল কার্য-কারণের অবিচ্ছিন্ন শৃংখল পরিব্যাপ্ত। সুতরাং দুঃখের পশ্চাতে একটি মাত্রই নির্দিষ্ট কারণ নাই—রহিয়াছে বহুজন্মব্যাপী দীর্ঘ কারণ-শৃংখল। ইহাই হইল বৌদ্ধদর্শনের মূলতত্ত্ব—**প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ**। গভীর চিন্তা দ্বারা বুদ্ধ স্থির করিলেন, যে প্রত্যেক দ্রব্য বা অবস্থা পূর্ববর্তী কোন দ্রব্য বা অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাহা আবার তৎপূর্ববর্তী অবস্থার উপর নির্ভরশীল। শেষ এবং সম্পূর্ণ স্থির কারণ বলিয়া কিছু নাই। কিছুই ধ্রুব নয়। সবই সমুৎপাদ। সবই ক্ষণিকস্থায়ী—সবই শূন্য। সর্বং দুঃখং দুঃখং, সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, সর্বং শূন্যং শূন্যং।

দুঃখের কারণ কী?

বহুজন্মব্যাপী কারণ-শৃংখলই দুঃখের হেতু

বুদ্ধের শিক্ষার একটি মূলতত্ত্ব ক্ষণিকবাদ। প্রতীত্যসমুৎপাদ এই ক্ষণিকবাদেরই ব্যাখ্যা। কার্য যেমন ক্ষণিক, তেমনি কারণও ক্ষণিক। কারণ ধ্বংস হইয়াই কার্যের উৎপত্তি। কারণের শক্তিই কার্যে পরিণতি লাভ করে, ইহা বৌদ্ধরা স্বীকার করেন না। ক্ষণিকবাদ যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদ দুয়েরই বিরোধী। এই জগৎ কতগুলি জড় উপাদান হইতে অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে ইহা যেমন সত্য নয়, তেমনি প্রত্যেক কার্য বস্তুর স্বভাব হইতেই সঞ্জাত এবং যাহা হইয়াছে তাহা অনিবার্য, ইহা ঘটিতেই হইত,—ইহাও সত্য নয়। হিন্দুচিন্তা স্বভাববাদ দ্বারা রঞ্জিত, কিন্তু এক অদৃশ্য বিশ্বশক্তি পৃথিবীর এবং মানবজীবনের সমস্ত ঘটনা অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, ইহা বুদ্ধের চিন্তার বিরোধী। মানুষই নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করে। তাহার নিজ কর্মফলই তাহার সুখদুঃখের জন্য দায়ী। ইহা আকস্মিক নয়, আবার অনিবার্যও নয়।[২৬] দুঃখের বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিলেন দ্বাদশ নিদান বা দ্বাদশটি কারণ-শৃংখল দুঃখের কারণ সমুদায়। চক্রাকারে ইহারাও পুনঃ পুনঃ জন্ম ও দুঃখের সৃষ্টি করে। তাই কারণ-শৃংখলকে 'ভবচক্র' বলা হয়। এই বিশ্লেষণ দ্বারা বুদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত দুঃখের পশ্চাতে

অবিদ্যাই কার্য-শৃংখলের মূল

২৬। Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy, Pp. 103-4 and 143-44

রহিয়াছে অনিয়ন্ত্রিত তৃষ্ণা বা কামনা। এবং এই কর্মশৃংখলের মূলে রহিয়াছে **অবিদ্যা**। দ্বাদশ কারণ-শৃংখল এইরূপ—

১। **অবিদ্যা**—ইহাই পুনঃ পুনঃ জন্ম ও দুঃখের মূল কারণ।

২। অবিদ্যা হইতে **সংস্কার**-এর উদ্ভব হয়। সংস্কার অর্থ পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি (impressions of the experience of past life)।

৩। সংস্কার হইতে **বিজ্ঞান**-এর উদ্ভব হয়। গত জন্মের শেষ অবস্থায় পূর্ব জন্মের যাবতীয় কর্মের সংস্কার বা স্মৃতি হইতেই নূতন জন্মের বিজ্ঞান বা অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ("ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে"।)

৪। বিজ্ঞানই অবশেষে **নামরূপ** বা দেহমনের জন্ম দেয়।

৫। নামরূপ হইতে **ষড়ায়তন**—পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের সৃষ্টি।

৬। ইন্দ্রিয় ও মন অর্থাৎ ষড়ায়তন সৃষ্টি হইলে **স্পর্শ** বা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়।

৭। স্পর্শ বা এই প্রকার ইন্দ্রিয়-সংযোগ হইতে **বেদনা** বা ইন্দ্রিয়বোধের উৎপত্তি হয়।

৮। বেদনা বা ইন্দ্রিয়বোধ স্বভাবতঃই **তৃষ্ণা** বা আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

৯। তৃষ্ণাই **উপাদান**-এর মূল। জাগতিক বস্তু সাগ্রহে আঁকড়াইয়া থাকাই উপাদান।

১০। উপাদান হইতেই **ভাব** বা জন্মের ইচ্ছার উদ্ভব।[২৭]

১১। ভাব বা জন্মের ইচ্ছার পরিণতি হইতেছে **জাতি** বা জন্ম।

১২। জন্ম হইতেই **জরা, মরণ** ও **দুঃখ**।

প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বকে বুদ্ধ এত মূল্যবান মনে করিতেন যে তিনি এই তত্ত্বকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আদিতে কি ছিল, অন্তিমে কি হইবে, সে প্রশ্ন তুলিব না; ধর্ম কি তাহাই আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। এইরূপ হইলে উহার উৎপত্তি হয়। উহার উৎপত্তি হইতে ইহার আবির্ভাব হয়। উহার অভাব হইলে, ইহা ঘটে না, উহার অভাব হইতে ইহার অভাব ঘটে।" "প্রতীত্যসমুৎপাদ যে দেখিতে পায়, সে ধর্ম দেখিতে

প্রতীত্যসমুৎপাদই হইল ধর্ম

২৭। চন্দ্রকীর্তি ভাব শব্দের অর্থ করিয়াছেন, কর্ম, পুনর্ভব-জনক কর্মঃ। Das Gupta, History of Indian Philosophy. Mrs. Rhys Davids' rendering of this word as the disposition for becoming is better than its ordinary rendering as 'existence' which is nearly meaningless in this context. Chatterjee & Dutt—An Introduction to Indian Phoilsophy, P. 122.

পায়, যে ধর্ম দেখিতে পায়, সে প্রতীত্যসমুৎপাদ দেখিতে পায়। সোপানশ্রেণীর সহিত বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদের উপমা দিয়াছেন। ইহাতে আরোহণ করিয়া লোকে বুদ্ধের দৃষ্টিতে জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমতাই যাবতীয় দুঃখের নিদান।"[২৮]

তৃতীয় আর্যসত্য : দুঃখ নিরোধ

বুদ্ধ চিন্তা করিলেন, দুঃখের কারণ-শৃংখল যখন জানা গেল, তখন নিশ্চয়ই তাহার নিরোধও সম্ভব। দুঃখের উৎপত্তিরোধ এবং তাহার বিনাশসাধনই হইল দুঃখনিরোধ। তৃষ্ণা হইতেই জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি (উপাদান), এই উপাদান হইতে ভাব বা জন্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা। এবং ইহা হইতেই পৃথিবীতে জন্ম, দুঃখ, মরণ ইত্যাদি। সুতরাং, তৃষ্ণার নির্বাপণ দ্বারাই দুঃখের মূলোৎপাটন সম্ভব। ইহাই দুঃখনিরোধ, ইহাকেই বৌদ্ধদর্শনে 'নির্বাণ' বলা হইয়াছে। বুদ্ধমতে অবিদ্যা নিরসন দ্বারা, এই জীবনেই নির্বাণলাভ সম্ভব।

দুঃখনিরোধ ও তাহার পন্থা

কিন্তু এই নির্বাণ কি? এ বিষয়ে বুদ্ধ বহু বার বহুভাবে বলিয়াছেন এবং তাঁহার বিভিন্ন উক্তির মধ্যে প্রভেদ আছে।

নির্বাণের সাধারণ অর্থ হইল নির্বাপণ। কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, অগ্নির মতো দাহক। যখন ব্যক্তি উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা নিজের অশান্ত বাসনা-কামনা, সংযত করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহাদের দাহিকা শক্তি নির্বাপিত হয়। তৃষ্ণাই জন্ম, জরা, মরণের মূল কারণ। তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ হইলেই দুঃখনিরোধ সম্ভবপর। ধম্মপদে একস্থানে আছে—তণ্‌হক্খয়ো সব্বদুক্খং জিনাতি—তৃষ্ণাক্ষয় সব দুঃখকে জয় করে।[২৯] সংযুত্ত নিকায়-তে একাধিকবার বলা হইয়াছে—ভবনিরোধো নিব্বাণং। ভব অর্থ জন্ম। ভবনিরোধ অর্থ পুনঃ পুনঃ জন্মের অতীত হওয়া, ইহাই নির্বাণ। আবার বলা হইয়াছে নিব্বাণং ভগবাআহু সব্ব-গন্থ-পমোচনং—অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই নির্বাণ।[৩০] সুত্ত নিকায়-তে আছে—তণ্‌হায় বিপ্পহানেন নিব্বাণ্ ইতি বুচ্চতি—তৃষ্ণার বিনাশই নির্বাণ, এইরূপ বলা হয়। বহুস্থানে নির্বাণকে একসঙ্গে পাঁচটি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে—

নির্বাণের ধারণা

২৮। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬

২৯। ধম্মপদ—তৃষ্ণাবর্গ, ২১, ৩৫৪

৩০। সংযুত্ত নিকায়—১।২১০

১। সমুদায় সংস্কারের উপশম; ২। সর্বপ্রকার উৎপত্তির যে উপাদান-সমূহ, সেই সমুদয় উপাদানের বিনাশ; ৩। তৃষ্ণাক্ষয়; ৪। বিরাগ; ও ৫। পুনঃ পুনঃ জন্মনিরোধ।[৩১] খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পটিসম্ভিদা গ্রন্থে আছে, পঞ্চ-স্কন্ধের নিরোধই নির্বাণ। পঞ্চস্কন্ধ হইল রূপ (দেহ), বেদনা (ইন্দ্রিয়বোধ), সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। এই পাঁচটি হইতেছে মানুষের ব্যবহারিক (empirical) অবস্থা। যখন এই পঞ্চস্কন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, যখন ইহার আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা দূর হয়, তখনই নির্বাণলাভ। বহু স্থানে উপনিষদের অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া নির্বাণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "ইদং অজরং, ইদং অমরং, ইদং অজরামরণ পদং অশোকং"। কোথায়ও নির্বাণকে "অভয়ং" এবং "অকুতোভয়ং"-ও বলা হইয়াছে।[৩২]

পঞ্চস্কন্ধ

কিন্তু নির্বাণ কেবল মাত্র অভাবাত্মক অবস্থা নহে। বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে নির্বাণকে অস্তিবাচক "শান্তং", "শিবং", "পরমং সুখম্", "ত্রাণ", "শরণ", "পরায়ণ", "দীপ" (জ্যোতি এবং দ্বীপ এই দুই অর্থেই), "পার" বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে উপনিষদের মত ও বৌদ্ধমতের কোনই প্রভেদ নাই।[৩৩]

নির্বাণ অভাবাত্মক অবস্থা নহে

সুতরাং নির্বাণ সম্পূর্ণ নেতিবাচক শূন্যাবস্থাও নহে, চির, অচল ধ্রুব সত্তাও নহে। ইহা সম্পূর্ণ আত্মসংযম, আত্মজ্ঞান ও পরিপূর্ণ শান্তির এক অনির্দেশ্য অবস্থা।[৩৪]

বুদ্ধ আত্মশাসন, কামনা-বাসনার সংযমকে নির্বাণ বলিয়াছেন, কিন্তু সন্ন্যাস বা সম্পূর্ণ কর্মত্যাগের উপদেশ কোথায়ও দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, কামনা-বাসনা দ্বারা তাড়িত কর্মই দুঃখ ও বন্ধের হেতু, কিন্তু অবিদ্যামুক্ত নিষ্কাম কর্ম দগ্ধবীজের মতো আর অঙ্কুরিত হয় না, দুঃখবন্ধনও সৃষ্টি করে না।[৩৫] ক্রমে ক্রমে চারিটি স্তরের সমাধির দ্বারা এবং তাঁহার নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া ব্যক্তি সমস্ত বাসনাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া অর্হত্ব লাভ করে। তাহাই নির্বাণ-অবস্থা। তাঁহার নিজ প্রচণ্ড কর্মময় মৈত্রী, করুণাস্নিগ্ধ জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩১। অঙ্গুত্তর নিকায়, ১।১৩৩, ২।১১৮; সংযুত্ত ১।১৩৬; মজ্ঝিম্ ১।১৩৬ ইত্যাদি

৩২। ইতিবুত্তক নিকায় ১১২

৩৩। মহেশচন্দ্র ঘোষ—নির্বাণ কি? প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯ ও নির্বাণতত্ত্ব, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪

৩৪। **Nirvāna is neither annihilation nor eternal existence. It is an ineffable state of perfect wisdom, perfect peace and perfect self-command. Sinha—Outlines of Indian Philosophy, P. 101**

৩৫। অঙ্গুত্তর নিকায় (Tr. Warren, Pp. 215-16)

নির্বাণকে বুদ্ধ নেতিবাচক শুষ্ক শূন্য অবস্থা কখনও মনে করেন নাই, তাহা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বৌদ্ধদর্শনেরই ইহা বৈশিষ্ট্য এমন মনে করা ঠিক নয়। বেদান্ত ও যোগদর্শনেও অনুরূপ চিন্তা দেখিতে পাই। তথাপি ডাঃ ডাহ্‌ল-ম্যান্‌-এর সঙ্গে আমরা একমত নই যে বৌদ্ধদর্শন হইতেই ইহা হিন্দুচিন্তায় সংক্রামিত হইয়াছে।[৩৬] ভগবান্ বুদ্ধের প্রাচীন সহজ ও সরল মতই পরবর্তীকালে চূড়ান্ত শূন্যবাদে পরিবর্তিত হইয়াছিল। উপনিষদের অচল, ধ্রুব, সনাতন, অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মত্বেও বুদ্ধ বিশ্বাস করেন নাই আবার কেবলই কারণহীন পরিবর্তনই সত্য ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন নাই।[৩৭] বুদ্ধের পরিনির্বাণের কয় শতাব্দীর পর বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন গ্রীসদেশের রাজা মেনাণ্ডর-কে (মিলিন্দ) শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নির্বাণের অপূর্ব শান্তির বিষয় বুঝাইতে গিয়া এই অবস্থা মহাসাগরের অতল গভীরতা, উত্তুঙ্গ পর্বত চূড়ার বিপুল উর্ধ্বগামিতা এবং মধুর, সুতীব্র মিষ্টতার সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৩৮]

চতুর্থ আর্য-সত্য : দুঃখনিরোধ মার্গ

কিন্তু যে বিষয়ের উপর বুদ্ধদেব সর্বাপেক্ষা জোর দিয়াছেন তাহা হইল, দুঃখ নিরোধের পথনির্দেশ। তিনি পুনঃ পুনঃ ইহা বলিয়াছেন যে দুঃখ নিরোধের নির্দিষ্ট পথ আছে, তাহা তিনি জানিয়াছেন। তাহা অনুসরণ করিয়া তিনি নিজে দুঃখ জয় করিয়াছেন ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রমণ ও গৃহী সকলেই এই মার্গ অনুসরণ করিতে পারে। তিনি বলিলেন, এই দুঃখনিরোধ-মার্গের আটটি অঙ্গ (অষ্টাঙ্গিক মার্গ)—ইহারা হইতেছে—সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

দুঃখনিরোধের পথ—অষ্টাঙ্গিক মার্গ

(ক) সম্যগ্ দৃষ্টি বা সম্মাদিট্‌ঠি—

অর্থাৎ সত্যজ্ঞান। অবিদ্যাই সমস্ত তৃষ্ণা ও দুঃখ জরামরণের কারণ। অবিদ্যার ফল মিথ্যা দৃষ্টি। জীব যখন নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয় হইতে অভিন্ন মনে করে, তখন তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তাই মিথ্যা জ্ঞান দূর করিতে হইলে প্রথমেই চারিটি আর্য্য-সত্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ

সম্যগ্ দৃষ্টি

৩৬। Nirvāna was one of the ideas that were in the air in India and it was worked out by Buddha as well as by Kapila and Badarāyana, but by each in his own fashion. Max Müller—Six Systems of Indian Philosophy, P. 296

৩৭। Buddha's theory strikes a mean between two extreme courses e. g., believing *neither in Being nor in non-Being, but in Becoming.* Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy, P. 151

৩৮। মিলিন্দ পন্‌হ

করিতে হইবে। অহং ভাবই সমস্ত তৃষ্ণা ও উপাদানের হেতু। আমরা ভাবি, আমাদের এই সংসারের সুখই বুঝি চিরন্তন। এই মিথ্যা দৃষ্টি দূর করিয়া সত্যকে না জানিতে পারিলে বারে বারে সংসারচক্রে আবর্তিত হইতে হইবে।

(খ) সম্যক্ সংকল্প বা সম্মা সংকপ্প—

সম্যক্ সংকল্প

সত্যজ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধির পরিতৃপ্তি নয়। জীবনে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠার সংকল্প ব্যতীত শুধুই সত্যজ্ঞান নিরর্থক। সংসারের প্রতি আসক্তি বর্জন, পরহিংসায় বিরতি, সকলের প্রতি করুণা ও মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহারের সংকল্পই সম্যক্ সংকল্প।

(গ) সম্যক্ বাক্ বা সম্মা বাচা—

সম্যক্ বাক্

নৈতিক জীবনের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হইতেছে বাক্‌সংযম ও সত্যবাচন। ইন্দ্রিয়ের সংযম দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কখনও কখনও এই বিষয়টির উপরই অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়। এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে মিথ্যা বাক্য, রূঢ় বাক্য, পরনিন্দা দ্বারা আমরা নিজের ও অপরের যে ক্ষতি করি, তাহা ইন্দ্রিয়ের অসংযম হইতে অনেক বেশী। অনাবশ্যক লঘু বিষয়ে আলোচনা বর্জনও সম্যক্ বাকেরই অন্তর্গত।

(ঘ) সম্যক্ কর্মান্ত—বা সম্ম কম্মান্ত—

সম্যক্ কর্মান্ত

সত্য সংকল্প শুভ কর্মে পরিণতি লাভ করিলে তবেই তাহা সার্থক। সত্য আচরণ বা কর্মান্ত হইল বাসনা-সংযম, পরদ্রব্য অপহরণ না করা, জীববহিংসা না করা, সর্ব জীবে মৈত্রী ও করুণা ইত্যাদি। বুদ্ধের দৃষ্টিতে অন্ধ আচারপালন মূল্যহীন, বিশুদ্ধ আচরণই প্রধান।[৩৯]

৩৯। কোন ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বাহুকা নদীতে স্নান করিলে পাপী পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে কিনা। উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, বাহুকাই হউক আর আধিকাই হউক, তাহাতে যতবারই স্নান করা যাউক না কেন, তাহাতে পাপ মুক্ত হওয়া যায় না। এই স্নান পাপীকে বা পরদ্বেষী মানুষকে পবিত্র করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ, সর্ব জীবে দয়া কর। তুমি যদি মিথ্যা না বল, জীবহিংসা হইতে বিরত থাক, কাহারও দান গ্রহণ না কর,তবে গয়ায় যাইবার তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি শুদ্ধ হইলে সমস্ত জলই তোমার নিকট গয়ার মতো পবিত্র। ক্রোধ, সুরামত্ততা, প্রতারণা, ঈর্ষা, এই সমস্তই অপবিত্র, মাংসভোজন অপবিত্র কর্ম নয়। যে ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে মুক্ত হয় নাই, উপবাস, বসনবর্জন, মস্তকমুণ্ডন, কৃচ্ছ সাধন, পুরোহিতকে দান অথবা দেবতা পূজন—কিছুই তাহাকে পাপমুক্ত করিবে না।

(ঙ) সম্যগাজীব বা সম্মা আজীব—

সম্যগাজীব

সংজীবন যাপন করিতে হইলে জীবিকার উপায়ও শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যে জীবিকা অপরের পক্ষে হানিকারক অথবা নিজের মনুষ্যোচিত আত্মসম্মান নষ্ট করে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। ব্যাধ, কুসীদ ব্যবসায়ী, কসাই, মদ্যবিক্রেতা ইত্যাদির জীবিকা ঘৃণ্য, কারণ তাহারা অন্যের ধ্বংস বা ক্ষতি করিয়া অন্ন সংগ্রহ করে। বিনোবাজী এই জাতীয় জীবিকাকে বলিয়াছেন 'মারক'। কিন্তু ভাঙ্গী বা মুচির কাজ, মানুষের সেবা। ইহাতে অন্যের কোন অপকার হয় না, উপকারই হয়; তাই এই জীবিকা বাস্তবিক ঘৃণ্য নয়।

(চ) সম্যক্ ব্যায়াম বা সম্মা ব্যায়াম—

সম্যক্ ব্যাযাম

নৈতিক জীবন নিরন্তর সংগ্রামের ও সতর্কতার জীবন। উন্নত জীবনযাপনের আগ্রহই যথেষ্ট নয়। সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, যাহাতে পুরাতন দৃঢ়মূল অসৎ চিন্তাসকল থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়ে উদিত না হয়—আর এ বিষয়েও সাবধান থাকিতে হয়, যাহাতে নূতন অসৎ চিন্তার উদ্রেক না হয়। ইহাই সম্যক্ ব্যায়াম। সর্বদা এই ভাবনা মনে রাখিতে হইবে 'আমি অপবিত্র'। 'আমি পবিত্র', 'আমি উন্নত' এ চিন্তা ব্যায়ামকে শিথিল করিয়া দেয়। ইহার জন্য বুদ্ধ পাঁচটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন : (১) নূতন শুভ চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করা; (২) অসৎ চিন্তার অশুভ পরিণতির কথা চিন্তা করা; (৩) অসৎ চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করা (৪) যে চিন্তা হইতে অসৎ চিন্তার জন্ম তাহার বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার শক্তি হ্রাস করা; এবং (৫) দেহ নিশ্চল করিয়া মনকে বশীভূত করা।

(ছ) সম্যক্ স্মৃতি বা সম্মাসতি—

সম্যক্ স্মৃতি

সত্যজ্ঞান যাহা আয়ত্ত হইয়াছে তাহার সর্বদা স্মরণই সম্যক্ স্মৃতি। সর্বদা ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে সমস্তই ক্ষণিক। এই ইন্দ্রিয়াদি, মন ইহা কিছুই আমি নহি। 'এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় চিন্তাতেই আসক্তি জন্মে। এই সকল ভাব এত দৃঢ়মূল যে ইহাদের

সম্যক্ কর্মান্তের জন্য প্রয়োজন শীল জ্ঞান ও সমাধি। তংহা-জট (তৃষ্ণা জট) আমাদিগকে ভিতরে-বাহিরে বাঁধিয়াছে। শীল অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা ভিন্ন এই জট হইতে মুক্তির পথ নাই। শীলের অনুষ্ঠান দ্বারাই কিলিশ (পাপ) বিদূরিত হয় এবং 'স্রোতাপন্ন ভাব' (সৎকর্মস্রোতে স্থাপিত হওয়া) এবং 'সকৃদাগামী ভাব' (যাহার মাত্র একটি জন্ম অবশিষ্ট আছে) প্রাপ্ত হওয়া যায়। শীল হইল প্রবৃত্তি আর দান হইল সক্রিয় প্রবৃত্তি। অহিংসা প্রভৃতি নিয়মপালন হইল শীল। আর আত্মত্যাগমূলক কর্ম, দুর্গত লোকের সাহায্য, সর্ব জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি হইল দান। শীলের পরে সমাধি, ইহা দ্বারা পুরাতন কিলিশের মূল উৎপাটিত হয়।

উৎপাটন সহজ নয়। সুতরাং পুনঃ পুনঃই স্মরণ করিতে হইবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি ক্ষণস্থায়ী, দেহ নশ্বর, পুরীষ, মূত্র, রক্ত, ক্লেদ ইত্যাদি ঘৃণ্য দ্রব্যে এই দেহ পূর্ণ, শৃগাল, শকুনের ভক্ষ্য মৃতদেহ—ইহাই জীবের পরিণতি। ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে দেহের প্রতি আসক্তি দূর হইবে।[৪০] ইহাই সম্যক্ স্মৃতি।

(জ) সম্যক্ সমাধি বা সম্মা সমাধি—

সম্যক্ সমাধি

উপরি-উক্ত সাতটি অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা অসৎ চিন্তা দমিত হয় এবং মনের গাঢ়তর ধ্যান বা মনঃ সমাধানের সামর্থ্য জন্মে। এই ধ্যান বা সমাধির চারিটি ক্রম।

সমাধির চারিটি পর্যায়

(ক) প্রথম স্তরে সাধক শান্তমনে ও বিশুদ্ধচিত্তে একটি শুভ চিন্তায় মনকে নিমগ্ন করেন। এই চিন্তাকালে তিনি বিচার ও বিতর্ক দ্বারা সত্য নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে তাঁহার বিষয়কলুষমুক্ত মন অপূর্ব শান্তি ও প্রসন্নতা লাভ করে।

(খ) দ্বিতীয় স্তরের ধ্যান গভীরতর। তখন আর বিচার-বিতর্কের আন্দোলন নাই। তখন চারিটি আর্যসত্যে দৃঢ় প্রত্যয় হৃদয়ে স্থির হইয়া বিরাজ করিবে। এই স্তরেও অপার শান্তি ও আনন্দের অনুভূতি হৃদয়কে অভিভূত করে।

(গ) তৃতীয় স্তরের ধ্যান আরও গভীর। এই স্তরে অন্তর সুখ ও আনন্দের অনুভূতি সম্পর্কেও নিস্পৃহতা লাভ করে। দেহ সম্পূর্ণ শান্ত, মন সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন হয়। এই স্তরেও অনুভূতি থাকে, তবে তাহার প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না।

(ঘ) চতুর্থ স্তরে ধ্যান গভীরতম। এই স্তরে শুধু স্পৃহা নয়, সমস্ত অনুভূতিও লুপ্ত হয়। সাধকের অহং এই স্তরে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সুতরাং সাধক সুখদুঃখ সমস্ত বিষয়েই সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পরম শান্তিতে বিরাজ করেন। এই স্তরে সমস্ত কামনা-বাসনা-তৃষ্ণার দাহ সম্পূর্ণ নির্বাণ লাভ করে এবং সাধক পরমপদ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাকেই যোগ দর্শনে বলা হইয়াছে নির্বিকল্প সমাধি। এই স্তরে ব্যক্তি সত্যের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিমগ্ন।

বৌদ্ধ সংঘের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দিনের কিয়দংশ ধ্যানে অতিবাহিত করিতে হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সকলের জন্যই উপদিষ্ট। এমন ভাবেই বুদ্ধের পরম করুণা ও প্রেম সমগ্র জগতে প্রসারিত করিয়া দেওয়ার উপদেশ।

ইহা খুবই স্পষ্ট যে বুদ্ধের উপদেশে নৈতিক জীবনের পথনির্দেশ সম্বন্ধে যতটা জোর, অধিবিদ্যা আলোচনায়, শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণে ততটা নয়। তথাপি

৪০। দীঘনিকায় সুত্ত ২২

বুদ্ধ এ কথা ভাল করিয়াই জানিতেন যে সত্যজ্ঞান ব্যাতিরেকে সৎ আচরণ সম্ভব নয়। তাই দেখিতে পাই বুদ্ধের চারিত্রনীতির তিনটি মূল, **প্রজ্ঞা, শীল ও ধ্যান**। অষ্ট অঙ্গের প্রথমেই সম্যগদৃষ্টি বা সত্যজ্ঞান। এই জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্তি ও তাহার অনিবার্য ফল মিথ্যা চিন্তার মূলোচ্ছেদ প্রথম প্রয়োজন। এই সত্যজ্ঞানকে কর্মে প্রয়োগের জন্যই সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতির প্রয়োজন। জ্ঞানের সকল বাধা এবং সমস্ত দৃঢ়মূল কুচিন্তার মূলোচ্ছেদ করিয়া সম্যক্ সমাধিতে বা ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হয়। স্তরে স্তরে এই ধ্যান দ্বারা ঊর্ধ্বগতি লাভ করিয়া জীবন ও জগতের রহস্য ভেদ হয়, তৃষ্ণা উন্মূলিত হয় এবং দুঃখের বীজ ভস্মসাৎ হইয়া নির্বাণলাভ হয়।

বুদ্ধের চারিত্র-নীতি—প্রজ্ঞা, শীল ও ধ্যান

বৌদ্ধ দর্শনে নিরীশ্বরবাদ

ভগবান বুদ্ধ জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অর্থাৎ কোন চির, অপরিবর্তনীয় ও ধ্রুব সত্তা স্বীকার করে নাই। ইহা তাঁহার দর্শনের একটি মূল ভিত্তি যে, পরিবর্তনই সত্য, সবই ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর সুতরাং এই নশ্বর কার্য-কারণ স্রোতের এক স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় মূল আছে, ইহা অসম্ভব। ব্রহ্মা অবিদ্যাবশতঃ নিজেকে সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞাত, সমস্ত সৃষ্টির মূল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মারও সৃষ্টি ও লয় আছে।[৪১] ত্রিবেদ পারঙ্গম ব্রাহ্মণেরা কেহই ব্রহ্মকে দেখেন নাই—প্রত্যেকেই অন্যের নিকট হইতে ব্রহ্মের বিষয় শুনিয়াছেন। লোকশ্রুতি কোন প্রমাণ হইতে পারে না—এ ক্ষেত্রে এক অন্ধ অন্য অন্ধকে বিভ্রান্ত করিতেছে।[৪২] পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থির হইয়া নাই, কোন কিছুই কেবলমাত্র কার্য বা কেবলমাত্র কারণ নয়। কোন কিছুই অকারণে ঘটে না, এবং এমন কিছুই নাই যাহা স্বয়ম্ভূ। কর্মের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে—ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদ (theory of dependent origination)। ইহাই ধর্ম। যাহা কিছু ঘটে, তাহা পূর্ববর্তী কোন অবস্থা হইতেই অনিবার্যরূপে ঘটে। কোন চিন্ময় বিধাতাপুরুষ এই জগৎ চালনা করিতেছেন, প্রতীত্যসমুৎপাদরূপ ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, ইহা চিন্তা করা নিরর্থক। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে কি কারণে বুদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই

নিরীশ্বরবাদের ব্যাখ্যা

৪১। দীঘনিকায়, পথিক সুত্ত ৩, ১,

৪২। „ „ তেবিজ্জ সুত্ত ১, ১২-১৫

তাহার বর্ণনা আছে। বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্য অনাথপিণ্ডদকে বলিতেছেন, এই বিশ্বসংসার যদি অব্যয়, ধ্রুব, ঈশ্বরসৃষ্ট হইত, তাহা হইলে জগতে কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হইত না, কোন ধ্বংসও হইত না। ঈশ্বরই যদি সমস্ত সৃষ্টির মূল হন, তবে ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ কিছুরই কোন প্রভেদ থাকিত না। মানুষের অন্তরের সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, হিংসা যদি তাঁহারই সৃষ্টি হয় তবে তিনি তো তাহাদের উর্ধ্বে নন—ইহাদের জন্য দায়িত্বও তো তাঁহারই। ঈশ্বরই যদি সর্বভূতকে চালনা করেন, তবে নীতি বা ধর্মসাধনাও নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বর যদি কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে বলিতে হয়, তাঁহার কোন অভাব বা অপূর্ণতা ছিল। আর যদি এজগতের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তাহা তো শিশু বা উন্মাদের কাণ্ড। জগৎ যদি সৃষ্টি নাও হয়, যদি ইহা চিরকাল ধরিয়াই চলিতেছে, ইহা স্বীকার করাও যায়, তথাপি সমস্ত ব্যক্ত জগতের মূল হিসাবে এক অসঙ্গ, কারণহীন, অজ্ঞেয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় কিনা—ইহা বিশ্বাস করা যায় কিনা যে এই জগৎ সেই অসঙ্গ, কারণহীন, অজ্ঞেয় সত্তারই প্রকাশ? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, অসঙ্গ ও কারণহীন বলিতে যদি যাবতীয় জ্ঞাত পদার্থের সহিত সম্বন্ধহীন কোন বস্তু বোঝায়, তবে যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী এমন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। অসঙ্গ যদি বহু হয়, তবে বহু কারণ হইতে সৃষ্ট বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ কি করিয়া স্থাপিত হয়? এবং যদি এক হয় তবে বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর এক কারণই বা কি করিয়া হয়? অসঙ্গ যদি নির্গুণ হয়, তবে তাহা হইতে সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই নির্গুণ হইত। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই যখন গুণসম্পন্ন, তখন তাহাদের নির্গুণ কোন কারণ থাকিতে পারে না। অসঙ্গ যদি অপরিণামীই হয়, তবে জগতের পরিণামী ও নশ্বর সমস্ত বস্তুর ইহা কারণ হয় কি প্রকারে? সর্ববস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অসঙ্গই যদি তাহাদের কারণ হয়, তবে সর্ববস্তুর স্বাভাবিক ক্ষয়, দুঃখ ইত্যাদি নিবারণ তো অসম্ভব।[৪৩] ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনায় বুদ্ধ বহু ক্ষেত্রেই মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে হাঁ বা না কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিবার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাছে জীবনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে এ প্রশ্নের আলোচনা নিরর্থক এবং এই প্রশ্নের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব নয়। পরবর্তী কালে নিরীশ্বরবাদ বৌদ্ধ দর্শনে অনেক স্পষ্টরূপ ধারণ করে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বর্ণিত যুক্তিগুলি সত্যই বুদ্ধই ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাহারও পূর্ববর্তী কালে

বুদ্ধচরিতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কারণ উল্লেখ

৪৩। অশ্বঘোষ—বুদ্ধচরিত

নাগসেনের (খ্রীঃ-পূঃ দ্বিতীয় হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে) 'মিলিন্দপন্‌হা'-তেও অনুরূপ যুক্তিবিস্তার দেখা যায়।[৪৪]

বুদ্ধদর্শনে নৈরাত্ম্যবাদ

অনাত্মবাদ বা নৈরাত্ম্যবাদের দুইটি প্রধান বক্তব্য : (১) আত্মা বলিতে, অধ্রুব, দেহ ও মনের কতগুলি পরিবর্তন-সমষ্টি মাত্র বোঝায় ; (২) এই জগৎ নশ্বর ও পরিবর্তনশীল।

নৈরাত্ম্যবাদের ব্যাখ্যা

অবিনাশী, ধ্রুব, অচল আত্মাবস্তু বলিয়া কিছু নাই। আছে শুধু চেতনা ও বিজ্ঞানের (cognitions) বহমান স্রোত। চেতনা ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী—এক চেতনা ধ্বংস হইয়া পর মুহূর্তে দ্বিতীয় চেতনার সৃষ্টি হইতেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, আছে এক unending stream of consciousness—ইহার আদিও নাই অন্তও নাই। এই চেতনাগুলিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য কোন বস্তুও নাই। দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়েরও সততই পরিবর্তন ঘটিতেছে। কিছুই নিত্য নয়। সমস্ত চেতনার ও অবচেতনার পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয়, আধার হিসাবে আত্মাবস্তু বুদ্ধের দর্শনে অস্বীকৃত। ওলডেন্‌বার্গের ভাষায়, 'there is no King Soul holding court with his processes of consciousness'। তিনি এবিষয়ে হিন্দু উপনিষদ এবং বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রভেদটি খুব তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। হিন্দুর অধ্যাত্মবাদে সমস্ত চেতনা 'সূত্রে মণিগণাইব' এক অব্যয় অক্ষয় আত্মাবস্তুর অনুসন্ধান করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণেরা সমস্ত 'ভবন' (becoming)-এর পশ্চাতে এক চিন্ময় অপরিবর্তনীয় বিশ্বসত্তাকে (unchanging Being) দেখিয়াছে আর বৌদ্ধেরা যাবতীয় প্রতীয়মান সত্তাকে (Substance) 'ভবন' (becoming) হিসাবে দেখিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা সত্তাকে দেখিয়াছেন সমস্ত কার্য-কারণের সম্বন্ধ ও পরিবর্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া (substance without causality)। আর বৌদ্ধগণ 'ভবন' বা পরিবর্তনকেই বলিয়াছেন সত্য—তাহার পশ্চাতে দ্রব্য বা সত্তাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইল causality

৪৪। বুদ্ধ যেখানে মৌনী, নাগসেন সেখানে স্পষ্ট 'না' বলেন। 'হাঁ' ও 'না' ইহার কোনও পক্ষেই যথেষ্ট প্রমাণের অভাবই বুদ্ধের মৌনের কারণ। কিন্তু নাগসেনের নিকট প্রমাণের অভাবই অবিশ্বাসের পর্যাপ্ত কারণ ; অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করা অপরাধ...নাগসেনের 'মিলিন্দপন্‌হা'-য় বুদ্ধের প্রকৃত মত কতটা ব্যক্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯

without substance।"[৪৫] কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য এতটা প্রখর নয়। উপনিষদ এবং বৌদ্ধদর্শন উভয়েই বিশ্বকে এক জীবন্তসত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন। উপনিষদ জগতের ঘটনাপ্রবাহকে সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা বলে না। তাহাদের মায়া বলে। কিন্তু যাহা মায়া তাহা সদ্‌বস্তুরই প্রতিভাস। সমগ্রভাবে সেই বিশ্বসত্তা অপরিণামী (পরিবর্তনবিহীন) কিন্তু তাহার বিভিন্ন বিভাবের পরিবর্তন আছে। এবং এই পরিবর্তন আকস্মিকও নয়, অকারণও নয়। বুদ্ধ অবশ্য এ কথা বলেন নাই যে সমস্ত পরিণামের তলদেশে এক পরিণামবিহীন সদ্‌বস্তু আছে, কিন্তু তিনি এ কথাও বলেন নাই যে পরিবর্তনই কেবল সত্য,—যদিও ইহা সত্য যে, তিনি জগতের সর্বক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ও ক্ষণিকতার উপরই বারে বারে জোর দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনুবর্তী নাগসেন বুদ্ধের উপদেশের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনই বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন, তদতিরিক্ত কোন বস্তু তিনি স্বীকার করেন নাই। সত্য কথা এই যে, বুদ্ধ সদ্‌বস্তু সম্পর্কে উদাসীন। তাঁহার দৃষ্টি ছিল এই প্রত্যক্ষ জগতে। তাই তিনি সমুৎ-পাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের ঋষির মতো এই প্রত্যক্ষ জগতের কেন্দ্রস্থিত এক বিশ্বসত্তা বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল না।[৪৬] কিন্তু বুদ্ধ সমস্ত চেতন ক্রিয়া ও কর্মের পশ্চাতে আত্মারূপ বস্তুকে স্পষ্ট স্বীকার কোথাও করেন নাই, কিন্তু কর্মফলের ঐক্য (continuity) এবং নিয়মানুসরণ (obedience to law) স্বীকার করিয়াছেন। তাই কর্মফল তিনি মানেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী

রাধাকৃষ্ণণের মতে, বুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও সতত পরিবর্তনশীল চেতনা, বেদনা, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু আছে তাহা স্বীকার করিতেন, অথচ জন্ম-জরা-মরণ-রহিত অপরিবর্তনীয় এক অক্ষয় আত্মাবস্তু তিনি কখনও স্বীকার করেন নাই। এ সম্বন্ধে বুদ্ধের মত ঠিক কি, তাহা বলা কঠিন। নাগার্জুন প্রজ্ঞাপারমিতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, তথাগত কখনও বলিয়াছেন আত্মার অস্তিত্ব আছে, কখনও বলিয়াছেন, আত্মার অস্তিত্ব নাই। যখন বলিয়াছেন, আত্মা আছে এবং জীব তাহার কর্মফল ভোগ করে, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য উচ্ছেদবাদীদের (nihilist) ধর্মবিরুদ্ধ মত হইতে মানুষকে রক্ষা করা। আবার যখন বলিয়াছেন পঞ্চস্কন্ধের[৪৭] সমবায়ের অতিরিক্ত কোন

বুদ্ধদেব কি আত্মাকে স্বীকার করিতেন?

৪৫। Oldenberg—Buddhism, P. 69

৪৬। Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. 1, P. 330

৪৭। স্কন্ধ পাঁচটি হইল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ হইল দেহ ও তাহার পরিবর্তন এবং বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হইল মানসিক বিভিন্ন অবস্থা।

আত্মা নাই বা স্বষ্টিকর্তা নাই, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য শাশ্বতবাদরূপ বিপরীত ধর্মবিরুদ্ধ মত হইতে মানুষকে রক্ষা করা। ঠিক অনুরূপ কথা সংযুত্ত নিকায়-এও দেখিতে পাই।[৪৮] সম্ভবতঃ তিনি আত্মা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু শাশ্বত, ধ্রুব, অপরিবর্তনীয় আত্মাবস্তুকে অস্বীকার করিয়াছেন। "তিনি বলিয়াছেন দেহ শাশ্বত আত্মা নহে, কেননা দেহ ভঙ্গুর। আমাদের রূপ (form), বেদনা (feeling), সংজ্ঞা (cognition), সংস্কার (memory), বুদ্ধি শাশ্বত আত্মা নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সংবিদ নশ্বর হইত না। যাহা ক্ষণস্থায়ী, অশুভ ও পরিণামী, তাহা শাশ্বত আত্মা নহে।"[৪৯] সুতরাং এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত যে "ভূত, ভবিষ্যত বা বর্তমান, দূর বা নিকটবর্তী, উচ্চ বা নীচ, বাহ্য বা অন্তের কোন রূপই 'আমি' নহে, অথবা আমার শাশ্বত আত্মা নহে। অজ্ঞ ও অধার্মিক লোক আত্মাকে দেহ বলিয়া ভ্রম করে, অথবা রূপবান কোন দৈহিক বস্তু বলিয়া মনে করে; অথবা মনে করে যে দৈহিক রূপ আত্মার মধ্যে অবস্থিত, বা বিপরীতভাবে মনে করে আত্মা দৈহিক রূপের মধ্যে অবস্থিত। কেহ বা ভ্রমক্রমে আত্মাকে বেদনা বা বেদনাযুক্ত বস্তু মনে করে, বেদনাকে আত্মার মধ্যে অথবা আত্মাকে বেদনার মধ্যে অবস্থিত মনে করে।"[৫০] অর্থাৎ 'আমি'কে বিশ্লেষণ করিয়া, দেহ বেদনা, সংস্কার, বুদ্ধিও পাওয়া যায়, কোথাও শাশ্বত আত্মাবস্তু বলিয়া কিছুর সাক্ষাৎ মেলে না। আবার এ কথাও বলিয়াছেন, যে বলে আত্মার অস্তিত্ব নাই সে ভ্রান্ত। কিন্তু 'আমি' বলিয়া চিরস্থায়ী, পরিবর্তনবিহীন, অনন্ত অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছেন (continuity of personal consciousness is denied)।

বুদ্ধদর্শনে কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ

হিন্দু দর্শনের মতো বৌদ্ধ দর্শনও কর্মফলে গভীরভাবে বিশ্বাসী। কর্মের ফল অমোঘ। প্রত্যেক কর্মই কোন না ফল উৎপন্ন করিবেই। এই কর্মফল অনুযায়ীই

৪৮। একদিন বচ্ছগোত্ত নামে এক শ্রমণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবাত্মা আছে কি?" তথাগত প্রশ্ন শুনিয়াও কোন উত্তর দিলেন না। এবার বচ্ছগোত্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি জীবাত্মার অস্তিত্ব নাই?" কিন্তু এবারও তথাগত কোন উত্তর দিলেন না। তখন বচ্ছগোত্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন। তখন প্রিয় শিষ্য আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন, "তথাগত, আপনি শ্রমণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেন?" তখন বুদ্ধ বলিলেন, "আমি যদি বলিতাম আত্মা আছে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের শাশ্বতবাদ সমর্থন করা হইত। কিন্তু তাহা ভ্রান্ত মত। আবার যদি বলিতাম আত্মার অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে উচ্ছেদবাদরূপ অন্য আর এক ভ্রান্ত মতকে সমর্থন করা হইত। সংযুত্ত নিকায় ৪।৫৪

৪৯। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০

৫০। বেদল সুত্ত

পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্য ও মানুষের সুখদুঃখভোগে এত প্রভেদ। কর্মই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, কর্মের দ্বারাই মানুষের জীবনের ভোগ-দুর্ভোগ।

বৌদ্ধদর্শন কর্মফলে বিশ্বাস

রথচক্র যেমন ধুর (axle)-এর উপর নির্ভরশীল, তেমনি জীবও কর্মের উপর নির্ভরশীল।[৫১] জড়জগতে কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিয়মের যে স্থান, নীতিজগতে কর্মের নিয়মেরও সেই স্থান। ব্যক্তি নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে; অদৃষ্ট তাহার কর্ম হইতে পৃথক বাহ্য কোন শক্তি নয়। মানুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের ফলই ভোগ করে। কিন্তু অতীত, যান্ত্রিক ও অন্ধভাবে বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে, এ কথা বুদ্ধ বলেন না। তিনি ব্যক্তির উদ্যমে—পুরুষকারে—বিশ্বাসী। তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা কেবলমাত্র অতীত কর্মের বোঝা বহন করিতে বাধ্য, ইহা বিশ্বাস করিলে দুঃখের ঐকান্তিক নাশের সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু কেহ যদি বলে যে মানুষের সুখদুঃখ ভোগ তাহার নিজ কর্মের সহিতই সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবেই ধর্মজীবন সম্ভব হয় এবং ব্যক্তি নিজ চেষ্টা দ্বারা দুঃখের ঐকান্তিক বিনাশে প্রবৃত্ত হইতে পারে।[৫২]

কিন্তু হিন্দু যে ভাবে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে, বুদ্ধ তাহা স্বীকার করেন না। তিনি কোন শাশ্বত আত্মা স্বীকার করেন না, সুতরাং এক দেহের মৃত্যুর পর জীবাত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে, ইহা তিনি স্বীকার করেন না।

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দু ধারণার সহিত পার্থক্য

মানুষের পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর নির্ভরশীল, সুতরাং দেহ বিনষ্ট হইলে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারও ধ্বংস হয়। কিন্তু কর্মফল মৃত্যুতে ধ্বংস হয়, বুদ্ধ ইহা বলেন না। বরঞ্চ তিনি স্বীকার করেন এই কর্মফল অবিচ্ছিন্নভাবে পরজন্মেও অব্যাহত থাকে। বিশুদ্ধিমার্গে অশ্বঘোষ পুনর্জন্মের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এই রূপ—মৃত্যুকালে জীবের রূপ ও বিজ্ঞান ধ্বংস হইলেও, তাহার কর্মফল লুপ্ত হইয়া যায় না—তাহা পরজন্মেও চলিতে থাকে। মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়ের শক্তি লোপ পায়। তখন বেদনা ও চেতনা ও হৃদয় মধ্যে অন্তিমদশায় উপনীত হয়। কিন্তু তখন কর্মসংস্কার বিজ্ঞানের অস্তিত্ব রক্ষা করে। তখন বিজ্ঞানের বিষয় হয়, বহু অভ্যস্ত গুরুতর কর্মের স্মৃতি, অথবা নূতন জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। কর্মের নিজস্ব শক্তি হইতেই এই আকাঙ্ক্ষার জন্ম। ইহাই উপাদান। এই উপাদানকে অবলম্বন করিয়াই বিগত জীবনের কর্মের ফল নূতন জীবনে প্রবাহিত হয়। পূর্ব বিজ্ঞানের তখন বিলুপ্তি.

৫১। কথাবত্থু (Eng. tr. P. 315)

৫২। অংগুত্তর নিকায় ২।৯৯

ঘটে। নূতন বিজ্ঞানের জন্ম হয়। কিন্তু পূর্ব কর্মফল অব্যাহত থাকে। ইহাই পুনর্জন্ম। উপরের বর্ণনা হইতে দেখা যায় জীবের মৃত্যুর পরে পূর্বজন্মের কর্মই কেবল অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু কোথাও কোথাও বিজ্ঞানও অবশিষ্ট থাকে বলা হইয়াছে। নির্বাণে কর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই বিলোপ হয়, তখন ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে।[৫৩] কিন্তু আত্মার অস্বীকৃতি এবং কর্মফলের অব্যাহত প্রবাহ, এই দুইটি ধারণার সুসঙ্গতি কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝা কঠিন। "পূর্বজন্মে যে কর্ম করিয়াছে, পরজন্মে তাহার অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই কর্মের পুরস্কার বা শাস্তির কোন অর্থই হয় না। যে পাপ ও পুণ্য করিয়াছে, সে যদি না থাকে, এবং নিজ কর্মের ফল ভোগ না করে তাহা হইলে সেই পাপপুণ্যের ফল পরজন্মে অন্যে ভোগ করিতেছে, বলিতে হয়।"[৫৪] বুদ্ধ অবশ্য বলিয়াছেন "একে কর্ম করিবে এবং অন্যে তাহা ভোগ করিবে ইহা সত্য নয়—কারণ তাহার স্কন্ধসমূহই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। আমি মধ্য পন্থাই প্রচার করিয়াছি এবং তাহা হইতেছে প্রতীত্য-সমুৎপাদ।"[৫৫] বুদ্ধ পুনর্জন্মকে সমস্ত রাত্রিব্যাপী প্রজ্বলিত প্রদীপ-শিখার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। প্রদীপের শিখা প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে এবং পূর্ব মুহূর্তের শিখাই পরবর্তী শিখার কারণ; তেমনি ব্যক্তির পূর্বজন্মের বিজ্ঞান লোপ পাইলেও, পরজন্মের ভ্রূণের বিজ্ঞানকে প্রজ্বলিত করিয়া যায়।[৫৬] বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের ঐক্য লোপ পায়।[৫৭]

বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ

সংক্ষিপ্তসার

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে গৌতম বুদ্ধের যে অলৌকিক জীবনকাহিনী আমরা পাঠ করি, তাহা আমাদিগকে নূতন জীবনচর্চায় অনুপ্রাণিত করে। হিন্দুধর্মের আচারগত ও প্রথাগত সংকীর্ণতাকে আঘাত করিয়া বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম হিন্দুধর্মের ক্ষীয়মাণ ঔদার্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

৫৩। Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. 1. Pp. 44-45

৫৪। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪

৫৫। সংযুক্ত নিকায় ২, ২০

৫৬। মঝ্‌ঝিম নিকায়।

৫৭। There is unbroken continuity in the series but no permanent identity. The psychic series continues in transmigration, but here is no identity of the permanent soul. The first conscious act in the new birth is produced by the last conscious act in the preceding birth, which is modified by the accumulated dispositions of all the psychoses of this birth. Sinha—Outlines of Indian Philosophy, P. 90

করিয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন কপিলাবস্তু রাজ্যের শাক্যবংশীয় রাজপুত্র। দুঃখ, বেদনা ও মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া গৌতম জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। জীবনের আত্যন্তিক মূল্য সন্ধান করিবার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। বাংলা দেশের সীমান্তবর্তী বিহারের রাজগীতে উপস্থিত হইয়া গুহাবাসী সন্ন্যাসীদের সহিত ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেন। তাহার পরে গয়ার সন্নিকটে বোধিদ্রুমতলে তাঁহার অনলস তপশ্চর্যার কাহিনী সুবিদিত। এইখানেই বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাহার মার বিজয়ের কাহিনী অশ্বঘোষ কর্তৃক বুদ্ধচরিত ও ললিতবিস্তর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণাঢ্য বর্ণনায় একদিকে যেমন গৌতমের অসামান্য নিষ্ঠার কথা প্রকট, অন্যদিকে আবার মানুষের মধ্যে দেবত্ব-লাভের যে তৃষ্ণা যুগ যুগ ধরিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত, তাহার সন্ধানও গোচরীভূত হয়। বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে গৌতম দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন। তাঁহার খ্যাতিতে দিগ্বিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। তিনি মধ্যপন্থার প্রচার করিলেন। 'মজ্‌ঝিম' পন্থার আদর্শ নূতন করিয়া পৃথিবীর সামনে তুলিয়া ধরিলেন কপিলাবস্তু নগরীর সর্বত্যাগী রাজকুমার। তিনি ছিলেন বৈদিক কর্মকাণ্ড ও পশুবলির বিরোধী। দেহের পীড়ন দ্বারা ধর্ম আয়ত্ত হয়, ইহা তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি পুরুষকারে বিশ্বাসী। তিনি প্রচার করিলেন যে, তংহা বা তৃষ্ণাই হইল দুঃখভোগের কারণ। তাঁহার দর্শনমত সামগ্রিক আবেদনে মণ্ডিত 'হইয়া না উঠিলেও তাঁহার নীতি-দর্শন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তিনি দুর্বোধ্য দার্শনিক যুক্তির উপর তাঁহার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। মানুষের দুঃখের হেতু হইতেছে তাহার বিষয়তৃষ্ণা। ইহাই পুনঃ পুনঃ জন্ম ও সর্বপ্রকার দুঃখ-বেদনা, মোহ ও শৃংখলের কারণ। এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভগবান বুদ্ধের ধর্মমত শুধুমাত্র নেতিবাচক নহে—ইহা অস্তিবাচক। তিনি মানুষকে ভালোবাসার কথা প্রচার করিলেন। এই ভালোবাসার মধ্য দিয়াই আত্মাকে সকলের অভিমুখে ব্যাপ্ত করিবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম হইল 'মেত্তিভাবনা' বা মৈত্রীভাবনা।

এই প্রকার নিষ্ঠাযুক্ত সাধন দ্বারা আর্যপন্থায় বিচরণ করিয়া সমস্ত তৃষ্ণার দাহ নির্বাণ হইয়া হৃদয় সকল প্রাণীর প্রতি প্রেমপূর্ণ হইলেই মুক্তি সম্ভব হয়। ইহাকে ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারও বলিয়াছেন। এই ব্রহ্মবিহারের আদর্শ উপনিষদের আদর্শ হইতে যেমন অভিন্ন, তেমনি আবার আধুনিক যুগের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিত ইহার সঙ্গতি আছে। বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত—বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। তাই ইহা ত্রিপিটক নামে পরিচিত। ইহা পালি ভাষায় রচিত। বিনয়পিটকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অনুশাসনাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। সুত্তপিটকে আছে বুদ্ধের বাণী ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের বিবরণ। আর অভিধম্মপিটকে আছে এই ধর্মের তত্ত্ববিশ্লেষণ।

বৌদ্ধধর্মের দুইটি শাখা—হীনযান ও মহাযান। আত্মনিষ্ঠা ও নৈতিক আচরণের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে হীনযানী সম্প্রদায় অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন ও অতি কঠোর আত্ম-পীড়নের ব্রত গ্রহণে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উদ্বুদ্ধ করে। মহাযানী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শুধুমাত্র শুষ্ক নৈতিক উপদেশ ও দুর্বোধ্য শূন্যবাদ সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারে না। হীনযানকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবির ধর্ম বলা হইয়াছে। মহাযান এই অভাব

পূর্ণ করিয়া হৃদয়াবেগ, পূজা ও ভক্তিকে ধর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্বয়ং বুদ্ধদেব দেবপূজা বর্জন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মহাযানী সম্প্রদায় বুদ্ধকেই দেবতার আসনে বসাইয়া দিল। সাধারণ মানুষের হৃদয়বৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য পূজা, অর্চনা, অলৌকিক কাহিনী প্রভৃতির যথাযোগ্য স্বীকৃতি দান করিল এই মহাযানী সম্প্রদায়। বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান স্তম্ভ—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ আদর্শ, তবু দেশ, কাল ও পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে এই পূর্ণ আদর্শের একটি অবয়বই প্রাধান্য লাভ করে। সেই প্রাধান্যটুকু আমরা হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। হীনযান আত্মশক্তিতে বলিষ্ঠ হইয়া মানুষের আত্মমুক্তি সাধনার কথা বলিল; মহাযান বলিল, করুণাময় বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ দ্বারাই সর্ব জীবের মুক্তি সম্ভব হইবে। আত্ম-চেষ্টার দ্বারা পুণ্যালোক প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এ কথা অনস্বীকার্য যে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ধর্মের অনলস প্রচারের ফলে বিভিন্ন দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধর্মে নব নব অনুশাসন সংযুক্ত হইয়াছে। বহু বিচিত্র ও স্ববিরুদ্ধ মতবাদও এই ধর্মের বিরাট কুক্ষিতে আশ্রয় পাইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে স্বয়ং বুদ্ধদেব ছিলেন তত্ত্ববিমুখ। মানুষের জীবনের মূল সমস্যা হইল, সমস্ত দুঃখ ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি। বুদ্ধদেব জানিয়াছিলেন যে অধিকাংশ মানুষই সত্যকে আংশিক ভাবে জানে মাত্র, এবং এই আংশিক জ্ঞানকেই পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করে। তাহার ফলে নানান ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয়। বুদ্ধদেব দার্শনিকদের নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দার্শনিকগণ ভবরোগের নিদান অনুসন্ধান না করিয়া, নিতান্ত অবান্তর নানা কূট প্রশ্নের আলোচনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন।

বুদ্ধদেব যে চারিটি আর্য সত্যের আবিষ্কার করেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, তাহারা হইল: (১) এই জগৎ দুঃখময়, (২) এই সামগ্রিক দুঃখের কারণ-শৃংখল বর্তমান, (৩) এই দুঃখের যেমন কারণ আছে তেমনি তাহার অবসান আছে এবং (৪) এই দুঃখনিরোধের উপযুক্ত পন্থাও আছে।

বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখকে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারের প্রয়াস পাইলেন। তিনি বলিলেন, দুঃখ তো একটি কার্য, অতএব ইহার কারণও নিশ্চয় আছে। বর্তমান জীবন অতীত বহু জীবন ও কর্মের সংস্কারের ফল। আবার বর্তমান জীবনের কর্ম ও আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের ভোগের বীজ বপন করে। এমনি করিয়া অনন্তকাল কার্য-কারণের অবিচ্ছিন্ন শৃংখল পরিব্যাপ্ত। এই শৃংখলই দুঃখের কারণ। এই কারণ-শৃংখলকে 'ভবচক্র' বলা হইয়াছে। অবিদ্যাই এই কর্মশৃংখলের মূলে রহিয়াছে। অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উদ্ভব হয়। সংস্কার হইতে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ বা দেহ-মনের উৎপত্তি। নামরূপ হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের সৃষ্টি। ইন্দ্রিয় ও মন (অর্থাৎ ষড়ায়তন) সৃষ্টি হইলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগ হইতেই ইন্দ্রিয়বোধের উৎপত্তি। তৃষ্ণা এই ইন্দ্রিয়বোধ হইতে লাভ হয়। তৃষ্ণা হইতেই উপাদান বা আসক্তি জন্ম নেয়। আবার উপাদান হইতেই ভাবের উদ্ভব। ভাব হইতে জন্ম এবং জন্ম হইতেই জরা, মরণ ও দুঃখের উৎপত্তি।

বুদ্ধদেব প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইহাকেই 'ধর্ম' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়াই, মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট। এই দুঃখের নিরোধের জন্য তৃষ্ণার মূলোৎপাটনের কথা বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন। এই দুঃখনিরোধকে বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ বলা হইয়াছে। অবিদ্যা নিরসন দ্বারা এই জীবনেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। এই নির্বাণকে বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে পাঁচটি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে—নির্বাণ হইল 'সমুদায় সংস্কারের উপশম', 'সর্বপ্রকার উৎপত্তির যে উপাদান সমূহ, সেই সমুদায়ের বিনাশ', 'তৃষ্ণাক্ষয়', 'বিরাগ' এবং 'পুনঃ পুনঃ জন্মনিরোধ'। এই নির্বাণ কেবলমাত্র অভাবাত্মক অবস্থা নহে; বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহাকে নেতিবাচক ধারণা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাকে অস্তিবাচক বলা হইয়াছে।

বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ নিরোধের জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলিয়াছেন। সম্যগ্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌ সংকল্প, সম্যক্‌ বাক, সম্যক্‌ কর্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক্‌ স্মৃতির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্য চিন্তা দমিত হয়, মনের ধ্যানসামর্থ্যের বৃদ্ধি ঘটে। এই ধ্যান বা সমাধির চারিটি ক্রম বা পর্যায়। প্রথম স্তরে মন শুভচিন্তায় নিমগ্ন হয়। ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্য দিয়া ধ্যান ক্রমে গভীরতর ও গাঢ়তর হয়। চতুর্থ স্তরে ধ্যান গভীরতম। এই স্তরে সমস্ত কামনা বাসনা তৃষ্ণার দাহ সম্পূর্ণ নির্বাণ লাভ করে এবং সাধক পরমপদ বা অর্হৎত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাকেই যোগদর্শনে নির্বিকল্প সমাধি বলা হইয়াছে। ইহা সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, বুদ্ধের উপাদেয় নৈতিক জীবনের পথনির্দেশটুকু অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধকথিত চারিত্রনীতির মূলে রহিয়াছে প্রজ্ঞা, শীল ও ধ্যান। জ্ঞানের সকল বাধা ও কুচিন্তার মূলোচ্ছেদ করিয়া ধ্যানে (সম্যক্‌ সমাধিতে) নিযুক্ত হইতে হয়। ইহার দ্বারাই তৃষ্ণা উন্মূলিত হয় এবং দুঃখের বীজ ভস্মসাৎ হইয়া নির্মাণ লাভ হয়।

ভগবান বুদ্ধ জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অর্থাৎ কোন অপরিবর্তনীয় বা ধ্রুব সত্তা স্বীকার করেন নাই। নিরীশ্বরবাদ বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি। কী কারণে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন তাহার সবিস্তার ব্যাখ্যা আমরা পাই অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'। বিশ্ব-সংসার যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে ইহার সকল অপূর্ণতার জন্য তিনিই দায়ী হইতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যদি তিনি আপনার কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকেন, তাহা হইলে ভগবান নিজে নিশ্চয়ই অপূর্ণ ছিলেন। এই ধরনের যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বুদ্ধদেব ঈশ্বর নামক চির, অপরিবর্তনীয় ও ধ্রুব সত্তাকে অস্বীকার করিয়াছেন। নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেব ছিলেন অনাত্মবাদী। অনাত্মবাদীরা বিশ্বাস করেন যে আত্মা বলিতে দেহ ও মনের কতকগুলি পরিবর্তনের সমষ্টিমাত্র বোঝায়। ইঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, পরিদৃশ্যমান এই জগৎ নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। মানবের সমগ্র চেতনা ও অবচেতনার পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয় আধার হিসাবে আত্মাবস্তু, অনাত্মবাদী বুদ্ধদেবের দর্শনে অস্বীকৃত হইলেও, বুদ্ধদেব আত্মায় বিশ্বাস করিতেন কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তবে আত্মাকে অস্বীকার করিলেও বুদ্ধদেব কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বলেন যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে। অবশ্য ডক্টর

রাধাকৃষ্ণণ এই পার্থক্যকে খুব প্রখর বলিয়া মনে করেন না। আত্মাকে অস্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে স্বীকার করিয়া বুদ্ধদেব জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলকে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুনিপুণ বিশ্লেষণে এই ব্যাখ্যা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

প্রশ্নমালা

1. What are the main tenets of Bauddha Philosophy? Discuss.

2. Is Bauddha Philosophy essentially ethical in character? Discuss.

3. State and explain the 'eightfold path' as enunciated in Bauddha philosophy.

4. Is Bauddha philosophy atheistic in character? Examine the arguments of Buddha against theism.

5. Explain Buddha's 'Law of Karma'. How does he uphold this Karma theory without believing in the permanence of the soul? Discuss.

6. State or explain Bauddha theory of dependent origination.

7. Write short notes on:

(a) Astāngik Mārga
(b) Nirvāna
(c) Samādhi
(d) Hinayāna
(e) Mahāyāna
(f) Pratityasamutpāda

পঞ্চম অধ্যায়

পরবর্তী বৌদ্ধদর্শন

বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়

ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভাগ—হীনযান ও মহাযান

ভারতভূমিতে যত ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্মই একমাত্র প্রচার দ্বারা ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসী। বুদ্ধ বোধ করিয়াছিলেন যে, যে নূতন আলোকের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, মানবকল্যাণে দিকে দিকে সে আলোক-বর্তিকা বহন করিয়া নিবার প্রয়োজন আছে। তিনি নিজে যতদিন জীবিত

বৌদ্ধধর্ম প্রচার

ছিলেন এবং তাঁহার পরিনির্বাণের পর তাঁহার অনুরাগী শিষ্যেরা তাঁহারই আদেশে পর্বত অতিক্রম করিয়া, উত্তরে তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান, পশ্চিমে গান্ধার, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, দক্ষিণে সাগর অতিক্রম করিয়া সিংহলে এই নূতন জীবনের বাণী বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন।[১]

মোটামুটি বলা যায় দক্ষিণে ও পূর্বেই বুদ্ধের বাণী প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা 'হীনযান' নামে পরিচিত। এই নামটি অবশ্য মহাযানীদের দেওয়া। মহাযানীরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে 'মহাযান' রূপ অধিকতর গৌরবজনক নাম দিয়াছেন। হীনযান সম্প্রদায়ের মতই তিব্বত, চীন, কোরিয়া ও জাপানে প্রচারিত। যদিও মহাযানীরা

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়

বিশ্বাস করেন যে তাঁহারাই সদ্ধর্মের সত্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতই প্রাচীনতর এবং মূল বুদ্ধমত, তথাপি অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে হীনযানই প্রাচীন মত। হীনযান শাস্ত্রগ্রন্থ সবই পালিতে—সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় রচিত। মহাযানীদের শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধিকাংশই সংস্কৃতে, পণ্ডিতজনদের জন্য লিখিত।

(১) হীনযানীরা প্রাচীনপন্থী, ও শুচিতা, কৃচ্ছ্রতা এবং শুদ্ধাচার কঠোরভাবে পালনের পক্ষপাতী। মহাযানীরা অন্যান্য ধর্মমত ও দেশাচারের সঙ্গে সংস্পর্শে

mankind, out of compassion for the world. Preach the doctrine which is glorious in the beginning, glorious in the middle, and glorious in the end, in the spirit and as well as in the letter. Proclaim to them a life of holiness. They will understand the doctrine and accept it." Oldenberg —The Essence of Buddhism, Ch. II.

আসার ফলে, সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল। (২) হীনযান বুদ্ধকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন; মহাযান বুদ্ধকে ব্যক্তি হিসাবে জ্ঞান করেন না—বুদ্ধ চিরন্তন, অলৌকিক বিশ্বব্যাপী মৈত্রী ও করুণার শক্তি। তাঁহার ত্রিবিধকায়, ধর্মকায় (Embodiment of law) রূপে তিনি সর্বজীবের নিয়ন্তা, সম্ভোগকায় (Bliss-body) রূপে তিনি পূর্ণানন্দ ঈশ্বর আর নির্মাণকায় (Transformation-body) রূপে তিনি ঈশ্বরের অবতারপুরুষ বুদ্ধ। তাঁহার এই তিন কায়ের দ্বারা তিনি সর্বজীবের উদ্ধারসাধন করেন। (৩) হীনযান এক বুদ্ধে বিশ্বাসী; মহাযান মতে পূর্ব জন্মান্তরে বহু বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বলাভের সংকল্প নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্বশেষ বোধিসত্ত্বই বুদ্ধদেব। (৪) হীনযান মতে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ মুক্তি বা অর্হৎত্ব লাভ। মহাযান মতে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য সর্বমানবের মুক্তি বা বোধিসত্ত্বত্ব লাভ। (৫) হীনযান মতে এক গোতম বুদ্ধই বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন; মহাযান মতে প্রত্যেক মানবের মধ্যেই পূর্ণ বুদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (৬) হীনযান মতে সংসারীর পক্ষে পূর্ণ নির্বাণলাভ সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহারা শ্রমণ বা সন্ন্যাসীকেই শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী বলিয়া মনে করেন; মহাযান মতে সংসারী গৃহস্থের পক্ষেও নির্বাণ অসম্ভব নহে এবং তাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমকে হীনজ্ঞান করেন না। (৭) হীনযান মতে সংসারচক্র ছেদন ও পুনঃ পুনঃ জন্মনিরোধকেই নির্বাণ বলা হয়; মহাযান মতে তদপেক্ষাও উচ্চতর স্তর—ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন বা শূন্যতাই নির্বাণের উদ্দেশ্য। (৮) হীনযান এই পৃথিবী ও তাহার বস্তুর সত্য অস্তিত্বে বিশ্বাসী। মহাযানীরা ভাববাদী বা বিজ্ঞানবাদী—এই জড় পৃথিবীর অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এক সর্বব্যাপী আলয়বিজ্ঞানই সত্য—এবং ব্যক্তির খণ্ড চেতনা ও জগতের বহু বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিভাস মাত্র, তাহা আলয়বিজ্ঞানেরই ছায়া। (৯) হীনযান পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার নশ্বরতায় বিশ্বাসী। পৃথিবীর কোন বস্তুই চিরন্তন নয়, মনেরও কোন অবস্থাও অপরিবর্তিত নয়। ইহাদের পশ্চাতে কোন সদ্‌বস্তু নাই; মহাযান মতে সমস্ত ঘটনা ও পরিবর্তনের পশ্চাতে শূন্যতারূপ সত্তা আছে।

হীনযানকে থেরবাদ বা স্থবিরবাদও বলা হয়। হীনযানের প্রধান কথা নিজ পুরুষকার দ্বারা ব্যক্তির মুক্তি; মহাযানের প্রধান কথা বুদ্ধের পরম করুণা দ্বারা সর্বজীবের মুক্তি।

দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের পার্থক্য সত্ত্বেও হীনযান এবং মহাযান উভয়েই কতগুলি মতে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসগুলিই বৌদ্ধধর্মের সাধারণ ভিত্তি: (১) সত্য

আলোকলাভ সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য—অবিদ্যা বিদূরণ দ্বারাই ইহা সম্ভব। (২) এই জগদ্ব্যাপার অনাদি ও অনন্ত, পৃথিবীর সর্বত্রই রহিয়াছে কার্য-কারণের অমোঘ ক্রিয়া। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদ-রূপ বিশ্বাস। (৩) সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, সমস্তই নশ্বর—জড়জগতে বা মনোজগতে কোথাও নিত্যবস্তু বলিয়া কিছু নাই। (৪) কর্মফল প্রতি জীবের নিজেরই সৃষ্টি—সকলকেই নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। এই নৈতিক শক্তি সকলকেই মানিতে হইবে। (৫) কর্মফল অনুযায়ীই পুনর্জন্ম। এই জগতে সমস্ত ক্রিয়ার ফলেই কর্মের সৃষ্টি। (৬) তৃষ্ণা ও অবিদ্যাই সমস্ত দুঃখ ও সংসারচক্রের মূল। (৭) অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ দ্বারাই অবিদ্যা ও দুঃখের মূলোচ্ছেদ সম্ভবপর।[২]

দার্শনিক মতের ভিত্তিতে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়

হীনযানীরা বাস্তববাদী, এবং দার্শনিক মতের ভিত্তিতে তাঁহাদের প্রধান দুই সম্প্রদায়—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। এই দুই সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করেন যে বাহ্য-জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, সেইজন্য সর্বাস্তিবাদীও (সর্ব+অস্তি=সবই আছে) বলা হয়। বৈভাষিকেরা পৃথিবী এবং মন এই দুইয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন, তাহারা প্রত্যক্ষের বিষয়। সৌত্রান্তিকেরা বলেন, বাহ্য পৃথিবী ও মনের অস্তিত্ব আছে এবং তাহা অনুমানের সাহায্যে জানা যায়। বৈভাষিক মতকে আমরা বস্তুবাদী হব্‌স্‌-এর মতের সঙ্গে এবং সৌত্রান্তিক মতকে অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) লক-এর মতের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি।

দার্শনিক মতানুযায়ী বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক

আবার মহাযানীদের মধ্যেও প্রধান দুই সম্প্রদায়—যোগাচার ও মাধ্যমিক। ইহারা উভয়েই ভাববাদী। যোগাচার মতে বিশ্বাসীরা জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, যাহাকে আমরা জড়জগৎ বলি, তাহা আমাদের বিজ্ঞান বা ভাব মাত্র। এই বিজ্ঞান বা ভাবই সত্য। ইহাদের মতকে আমরা ভাববাদী (idealist) বার্কলে-র মতের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। মাধ্যমিক মতে বিশ্বাসীরা শূন্যবাদী, তাঁহারা জগৎ বা বিজ্ঞান কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সমস্তই ক্ষণিক, নশ্বর ও মিথ্যা। সত্য কেবল শূন্যতা। এই শূন্যতা অভাব নয়। ইহা নিরুপাধিক নির্জ্ঞেয় চরমসত্তা (Absolute without pre-

যোগাচার ও মাধ্যমিক

২। Yamakami Sogen—Systems of Buddhistic Thought

dicates)। এ মতকে হিউম্ বা হারবার্ট স্পেন্সার-এর মতের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

এই চারিটি প্রধান দার্শনিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইলেও ইহাদের প্রত্যেকেরই বহু ভাগ ও উপবিভাগ আছে। সোগেন্ অন্ততঃ ত্রিশটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহা ভিন্ন আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসম্প্রদায় আছে।[৩]

বুদ্ধদেব নিজে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় খুব উৎসাহী ছিলেন না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার প্রধান চিন্তা ছিল দুঃখ ও সংসারচক্রের বন্ধন হইতে, কি করিয়া মানুষের ঐকান্তিক মুক্তি হইবে, তাহার উপায় চিন্তা করা। তাই নৈতিক চিন্তাই তাঁহার কাছে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু কোন ধর্মমতই দার্শনিক ভিত্তির দৃঢ়ভূমি ভিন্ন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারকামী। সুতরাং গোড়া হইতেই ইহাকে হিন্দুধর্মের প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতের প্রবল বিরুদ্ধতা খণ্ডন করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যৌক্তিকতা ও সাধারণ বুদ্ধির শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তাঁহার জীবিতকালেই বুদ্ধদেবকে মৌলিক ও গুরুতর দার্শনিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাঁহার দীর্ঘদিনের চিন্তায় নিশ্চয়ই ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তন আছে। কাজেই বুদ্ধের প্রাচীন ও মৌলিক চিন্তা বলিয়া যাহা প্রচারিত, তাহার মধ্যে বহু বিচিত্র এবং কখনও কখনও বিপরীত দার্শনিক চিন্তার বীজ লুক্কায়িত ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং তাঁহার জীবিত কালেই এবং বিশেষতঃ তাঁহার পরিনির্বাণের পর তাঁহার শিষ্যেরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী তাঁহার চিন্তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এবং তাহাদের সহিত সংঘর্ষের ফলেও নিশ্চয়ই বুদ্ধের প্রাচীন চিন্তা বহু বিচিত্র ও বিপরীত দার্শনিক মতে পরিবর্তিত ও পল্লবিত হইয়াছে।

বৌদ্ধচিন্তায় দুইটি প্রধান প্রশ্ন

সর্বদেশের দার্শনিক চিন্তায়ই এই দুইটি প্রধান প্রশ্ন: (১) সত্যবস্তু কি? এবং (২) কি ভাবে সত্যবস্তুকে জানা যায়? প্রথম প্রশ্ন হইল অধিবিদ্যা-বিষয়ক (metaphysical) এবং দ্বিতীয়টি হইল জ্ঞান-তত্ত্ববিষয়ক (epistemological)। বৌদ্ধচিন্তায়ও এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধেই উপরোক্ত চারিটি প্রস্থানভেদ (differentiation into schools of philosophy)। বুদ্ধের দীর্ঘ জীবনের

৩। Sogen—Systems of Buddhistic Thought, P. 3

বিভিন্ন চিন্তায় এই মতগুলির বীজ ছড়াইয়া আছে। সুতরাং সঙ্গতভাবেই প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি করেন যে তাঁহাদের মতই প্রাচীন ও আদিম বৌদ্ধমত। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা উপরোক্ত মতগুলির মধ্যে একটি ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

বৈভাষিক মত বা বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ

এই মত মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-সমর্থিত। এই মত অনুযায়ী এক বাহ্য বস্তুজগৎ আছে এবং তাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ই আমরা জানিতে পারি। তেমনি বহু মনও আছে এবং তাহাও আমাদের প্রত্যক্ষেরই বিষয়। একেবারে আধুনিক কালে Direct Realist-দের মতও এই প্রাচান মতেরই প্রতিধ্বনি।[৪] বাহ্যজগতের বস্তুকে প্রত্যক্ষ ভাবেই জানি। বস্তুকে যদি এমন প্রত্যক্ষ ভাবে নাই জানিতে পারিতাম, তবে আমাদের বাহ্যজগতের জ্ঞান যে বাহ্য সত্তারই প্রতিচ্ছবি, তাহাই বা আমরা কি করিয়া জানিতাম? অন্যের মনকেও অন্য কোন কিছুর মধ্য দিয়া জানি না, সোজাসুজিই জানি। অভিধম্মপিটকে বুদ্ধের দার্শনিক মতের যে আলোচনা আছে, তাহাই বৈভাষিক দর্শনের ভিত্তি। অভিধম্ম সম্বন্ধীয় 'বিভাষা' নামক ব্যাখ্যা অনুসরণ করে বলিয়াই এই মতকে বৈভাষিক বলা হয়।

বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ

সৌত্রান্তিক মত বা বাহ্যানুমেয়বাদ

এই মতও বস্তুজগৎ এবং জ্ঞাতার অতিরিক্ত অন্য মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, মানুষের মনের বিজ্ঞান বা ভাবই সত্য, বাহ্য বস্তু বা জগৎ বলিয়া যাহা মনে করা হয়, তাহা মায়া—তাহা প্রতিভাস মাত্র। কিন্তু সৌত্রান্তিকবাদীরা বলেন যে, বস্তুজগতের যদি কোন সত্তাই না থাকিত, তবে মায়া বা প্রতিভাসই বা কিসের? আমাদের বিজ্ঞানে "বাহ্যজগতের মতো কিছু প্রতিভাত হয়", এই কথা "বন্ধ্যারমণীর পুত্রের মতে" কথা যেমন অর্থশূন্য তেমনি অর্থশূন্য। বাহ্য বস্তু আমাদের বিজ্ঞান বা মনের ভাবনা মাত্র, তাহা হইতে অভিন্ন, এই যুক্তিও সত্য হইতে পারে না, কারণ যখন আমরা কোন বাহ্য বস্তুকে জানি, তখনই ইহা বোধ করি যে, তাহা আমার জ্ঞান হইতে পৃথক কিছু। জ্ঞানটা মানসিক অবস্থা সত্য, কিন্তু

বাহ্যানুমেয়বাদ

৪। Turner—A Theory of Direct Realism, P. 8

জ্ঞানের বস্তুটি মানসিক নহে। যদি আমার জ্ঞান ও জ্ঞানের বস্তু অপৃথক হইত, তবে আমি বলিতাম না, 'আমি গাছ দেখিতেছি', বলিতাম, 'আমিই গাছ'। এবং বস্তুর পার্থক্য স্বীকার না করিলে, জ্ঞানের পার্থক্যই বা কি করিয়া সম্ভব হইত? তাহা হইলে একথা বলা নিরর্থক হইত যে, 'আমি গাছ দেখিতেছি এবং গাছে ফুলও দেখিতেছি, এবং গাছের নিচে গরু চরিতেছে তাহাও দেখিতেছি।'

তবে গাছকে আমি প্রত্যক্ষ করি না, কারণ গাছ আমার ইন্দ্রিয় বা মনের মধ্যে প্রবেশ করে না। আমার মনে গাছের যে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহা হইতে **অনুমান করি** যে, গাছ বলিয়া বস্তু আছে। আমার গাছ-রূপ জ্ঞান অকারণ হইতে পারে না। গাছ-রূপ বস্তু আছে বলিয়াই, গাছ-রূপ জ্ঞান হয়। ইচ্ছা করিলেই গাছ যত্র-তত্র দেখিতে পারি না, গাছকে গরু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি না— সুতরাং বোঝা যায়, বাহ্য বস্তু আমাদের বাধ্য করে, তাহা যেমন সেই ভাবেই প্রত্যক্ষ করিতে— স্টাউটের ভাষায়—'there is an objective coercion of facts'।

কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে গেলে চারিটি জিনিস প্রয়োজন: (১) বাহ্য বস্তু (২) মন, (৩) ইন্দ্রিয় ও (৪) পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা। এ সব অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে, দ্রব্যের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি মনের মধ্যে গঠিত হয় এবং আমরা নিশ্চিত অনুমান করিতে পারি যে, মনের মধ্যে যে ছায়া, ছবি বা প্রতিবিম্ব (copy or representation) গঠিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ দ্রব্য বাহ্য জগতে অবশ্যই আছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বার্কলে-র ব্যক্তিনির্ভর ভাববাদ (subjective idealism) খণ্ডন করিয়া অধুনা মুর প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিক ঠিক এই একই যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে বাহ্যানুমেয়বাদ (বাহ্য+অনুমেয়) লক্-এর copy theory of ideas-এর সমগোত্রীয়। সৌত্রান্তিক মতে বিশ্বাসীরা সুত্তপিটককেই তাঁহাদের দর্শনের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহা হইতেই তাঁহাদের এই নামকরণ।[৫]

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তাহার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অবস্থা

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ

এই মত অনুযায়ী বাহ্য বস্তুজগতের কোন অস্তিত্ব নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা চিত্তেরই বিজ্ঞান মাত্র। সদা চলমান বিজ্ঞান-স্রোতের বাহিরে বাহ্য বস্তু বলিয়া কিছু

৫। Stcherbatsky—The Central Conception of Buddhism, Pp. 70-76

নাই। যাদুকরের মায়া প্রভাবে, আমরা যেখানে কিছুই নাই, সেখানেও বস্তু আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা যাহাকে বলি প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাও এক অবিচ্ছিন্ন মায়ার খেলা মাত্র। কোন বস্তুর অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ এই যে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু প্রত্যক্ষও বিজ্ঞান মাত্র (a subjective state)। বার্কলে-ও এ কথাই বলিয়াছেলেন—Esse est percipi—the essence of an object is that it is perceived। ধর্মকীর্তি যুক্তি দিয়াছেন যে নীল রং এবং নীল রংয়ের বোধ অভিন্ন, যেহেতু এ দুইকে কখনই পৃথক করা যায় না। মায়াবশতঃই, এই দুইকে আমরা পৃথক বলি, যেমন দৃষ্টির বিকার বশতঃই আমরা এক চন্দ্রকে দুইটি দেখি। কোন দ্রব্য আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, এ কথাই বলিতে হয় যে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রত্যক্ষ-বর্হিভূত কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণের কোন পথ নাই।

যোগাচার ও বিজ্ঞানবাদ

বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যোগাচারীরা নিম্নলিখিত যুক্তি দেন: বাহ্য বস্তু আছে ইহা যদি মানি, তবে স্বীকার করিতে হয়, ইহা পারমাণবিক ও অংশবিহীন (atomic and partless) অথবা ইহা যৌগিক ও বহু অংশপূর্ণ (composite, containing many parts)। যদি বস্তু পারমাণবিক হয়, তবে একই মুহূর্তে এই বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। আবার বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেক অংশই বা প্রত্যক্ষ করা যাইবে কি ভাবে, কারণ প্রত্যেক অংশ তো পারমাণবিক? কাজেই বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ যদি হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তবে সেই প্রমাণ সম্পূর্ণ নিরর্থক। আবার, বস্তুর **অস্তিত্বের পূর্বে** তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিশ্চয়ই অসম্ভব; আবার বস্তুর **অস্তিত্বের পরেই** বা সে বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় কি প্রকারে? কারণ যে মুহূর্তে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার পূর্বেই তাহার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, কারণ প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যেক বস্তুর পরিবর্তন ঘটিতেছে। বস্তু ও তাহার বিজ্ঞান পৃথক বলিয়া স্বীকার করিলেই, এই সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এ দুই যদি অভিন্ন হয়, তবে এই অসুবিধাগুলি থাকে না। এ মতকে বিজ্ঞানবাদ বলা হয়, কারণ ইহা বিজ্ঞানকেই (consciousness) একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করে। অবশ্য সমস্ত বিজ্ঞানের জ্ঞাতা (subject) বা আধার হিসাবে চিত্তকেও (mind) এই মত স্বীকার করে। ব্যক্তির বিজ্ঞান বা চেতনাই একমাত্র সত্য, ইহাই এই মতের বক্তব্য, এবং ইহা বার্কলে-র ব্যক্তিগত ভাববাদ (subjective idealism) মতেরই সমগোত্রীয়। যাহা সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান বা চেতনার আশ্রয় বা আধার যোগাচারীরা তাহাকে বলিয়াছেন,

আলয়বিজ্ঞান। ইহা কিন্তু হিন্দুদর্শনের আত্মাবস্তু-রূপ অব্যয় অপরিবর্তনীয় সত্তা নয়। এই সদাচঞ্চল চিত্ত বা আলয়বিজ্ঞানের চাঞ্চল্য বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিকমার্গ অনুসরণ করিয়া সংযত করিতে পারা যায় এবং ইহারই শেষ পরিণতি সমস্ত চিত্তবৃত্তির অবসান বা নির্বাণ।[৬]

বিজ্ঞানবাদের অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে যোগাচারীরা সচেতন। বিরুদ্ধবাদীরা (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক) এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, বিভিন্ন বস্তুই যদি না থাকিবে, তবে বিভিন্ন বিজ্ঞানই বা হয় কেন? জ্ঞাতার ইচ্ছানুযায়ী তো তাহার বিজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বস্তুর পরিবর্তন ঘটে না। উত্তরে যোগাচারীরা বলেন যে, চেতনার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, নিত্যই বিজ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতেছে। কিন্তু এই বিজ্ঞান-প্রবাহে সমস্ত অতীত বিজ্ঞানের সংস্কার (memory) মগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইলে, এই মগ্নচৈতন্য আত্মপ্রকাশ করে। তৎমুহূর্তে এক বিশেষ চেতনা বা বিজ্ঞান (impression) পরিপাক লাভ করে এবং আলোকিত চেতনায় ফুটিয়া ওঠে। কাজেই যে কোন মুহূর্তে যে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞান ঘটিতে পারে না। যে বিজ্ঞানের অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান, তাহাই শুধু আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।[৭]

বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ ও শান্তরক্ষিত যোগাচার দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। লঙ্কাবতার-সূত্রে এই মতের প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট নিপুণভাবে করা হইয়াছে। ষড়দর্শন সংগ্রহে ইহা বলা হইয়াছে যে, এই মতের অনুগামীরা যোগ (critical inquisitiveness) এবং আচারে (good conduct) অভ্যস্ত, তাই তাঁহাদের দর্শনের নাম যোগাচার। আবার সোগেন্‌-এর মতে যোগাচারীরা যোগাভ্যাস দ্বারা বাহ্য বস্তুর অনস্তিত্ব (কারণ তাহারা নশ্বর) বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন এবং আলয়বিজ্ঞানকেই (আত্মাবস্তু নহে) একমাত্র সত্য বলিয়া জানিয়াছেন।[৮]

মাধ্যমিক মত বা শূন্যবাদ

মাধ্যমিক দর্শনের মূল বক্তব্য হইল যে, পৃথিবীতে সমস্তই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। যেমন, তথাকথিত বস্তুজগৎ, তেমনি মনোজগৎ, কোথাও চিরন্তন সত্তা (Absolute Being) বলিয়া কিছু নাই। সর্বত্রই আছে দ্রুত পরিবর্তন। দুইটি মুহূর্তও

৬। Sogen—Systems of Buddhistic Thought P. 259

৭। cf. All knowledge is reminiscence (anamnesis) and all learning a reawakening. Plato. (Read the myth of the charioteer in the Phœdrus)

৮। Sogen—Systems of Buddhistic Thought, P. 213

কোন কিছুই স্থির হইয়া থাকে না—সবই ক্ষণিক, সবই শূন্য। মাধবাচার্য ষড়্দর্শন সংগ্রহে শূন্যবাদের পক্ষে নিম্নপ্রকার যুক্তি দিয়াছেন : জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এবং জ্ঞান পরস্পর-নির্ভর। ইহাদের কোন একটি মিথ্যা হইলে, অন্য দুইটিও মিথ্যা হয়। সন্তানের অস্তিত্ব যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির পিতৃত্বও মিথ্যা। তেমনি জ্ঞান যদি মিথ্যা হয়, তবে জ্ঞানের বস্তুও মিথ্যা হয়। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তখন ইহাও প্রমাণিত হয় যে, সেখানে সর্পের অস্তিত্ব নাই। এবং তাহা হইলে যে মনে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও মিথ্যা। এই জগতে যে বস্তুনিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করি, বাস্তবিক তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই, তাহারা মায়ামাত্র—স্বপ্নের বস্তুর মতোই সারশূন্য। আত্মা বলিয়া যাহা আমরা বিশ্বাস করি, তাহাও এমনই সারবিহীন—অর্থাৎ বাহ্য- এবং অন্তর-জগৎ দুইই শূন্য। এই যুক্তি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় (অন্ততঃ ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে) যে মাধ্যমিক মত অনুযায়ী, সমস্ত জগৎই মিথ্যা, মায়া, শূন্য—কোন কিছুরই সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এই মতকে সর্ব-বৈনাশিকবাদও বলা হয়। কিন্তু মাধ্যমিকবাদে বিশ্বাসী বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা মাধবাচার্য বা অন্যান্য হিন্দু পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন 'শূন্য' সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব বোঝায় না। 'শূন্য' অর্থ, এই দৃশ্যমান অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুজগতের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই—ইহা স্বপ্নের বস্তুর মতোই নিমেষে মিলাইয়া যায়। এই দৃশ্যমান অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের আধার কিছুই নাই, এমন নহে। সমস্ত পরিবর্তনের পশ্চাতে যে সত্তা আছে, তাহা অনির্বচনীয়—তাহাকে জড় বা মন কোন সংজ্ঞাই দেওয়া চলে না। তাহাকে মন বা বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করা চলে না, অথবা তাহার বিবরণও দেওয়া চলে না। তাহা আছে, কিন্তু জগতের বা মনের কোন বস্তুর মতো তাহা কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না। তাহা নিরুপাধিক ও নিরালম্ব, সুতরাং তাহা **অনির্বচনীয়** (unscrutable, indescribable, unconditioned, unknown and unknowable)। শূন্যতা এই অনির্বচনীয় সত্তাকেই বুঝায়। নাগার্জুন মাধ্যমিকবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁহার ব্যাখ্যা হইল যে, প্রতীত্যসমুৎপাদই হইল শূন্যতা। প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তন পূর্ববর্তী মুহূর্তের উপর নির্ভরশীল। ইহাই ধর্ম। প্রত্যেক বস্তুর এই ক্ষণিকতার ধর্ম, পূর্ব মুহূর্তের ধর্ম দ্বারা উৎপন্ন—সুতরাং ধর্মই শূন্যতা।[৯] সোগেন্ বলেন,

মাধ্যমিক মত বা শূন্যবাদ

শূন্যতা বলিতে কী বুঝায়?

৯। নাগার্জুন—মাধ্যমিক শাস্ত্র, চতুর্বিংশতি অধ্যায়, কারিকা ১৮, ১৯

শূন্য বলিতে ইহাই বোঝায় যে কোন কিছুরই নিজস্ব স্থায়ী অস্তিত্ব নাই, সবই নশ্বর, সবই ক্ষণভঙ্গুর, সবই পরিবর্তনশীল, সুতরাং সবই অনির্বচনীয়—অনির্দেশ্য।[১০] সুজুকি-ও বলিয়াছেন যে 'শূন্য' নাস্তিত্ব নয়,—শূন্য অর্থ, নশ্বরতা ও পূর্বমুহূর্ত-নির্ভরতা, সুতরাং অনির্দেশ্যতা।[১১]

কোন বস্তু বা অবস্থারই স্বভাব বলিয়া কিছু নাই (নিস্স্বভাব), সমস্তই পূর্ববর্তী-অবস্থানির্ভর (entirely relative)। চিত্তের বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। যদিও সাংসারিক জীবনে এই জগৎ ও বিজ্ঞানের সত্যতা ব্যবহারিকভাবে স্বীকার করিতে হয়, তথাপি ইহাদের পারমার্থিক নিজস্ব সত্তা বলিয়া কিছু নাই। এ বিষয়ে মাধ্যমিকের দৃষ্টিভঙ্গী অভিনব ও বৈপ্লবিক—কেন না অন্যান্য মতবাদ জগতের সত্যতা অস্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের সত্যতা অস্বীকার করে নাই। কিন্তু মাধ্যমিকবাদ সাহস করিয়া এ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিজ্ঞান-প্রবাহও (stream of consciousness) ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং অসত্য।[১২]

বৌদ্ধ দর্শনের সমস্ত বাদই প্রতীত্যসমুৎপাদকে একটি মূল সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু মাধ্যমিকদের শূন্যবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদের যে বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেন, তাহাতে কার্য-কারণ সম্বন্ধের সত্যতাও অস্বীকৃত হইয়া, তাহাও শূন্যে পরিণত হয়। নাগার্জুন তাঁহার প্রথম কারিকাতে বলিয়াছেন, "আমরা কোন বস্তুকে হয় নিজ হইতেই উৎপন্ন, না হয় অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করি। দুইই সমান মিথ্যা। আবার যদি বিশ্বাস করা যায় যে, কোন বস্তু নিজ হইতে এবং অন্য হইতে যুগপৎ উৎপন্ন তাহাও অসম্ভব, এবং যদি বিশ্বাস করা হয় সম্পূর্ণ বিনা কারণেই কোন কিছু ঘটে, তবে তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। বুদ্ধ বলিয়াছেন, বিনা কারণে কিছুই ঘটে না, সুতরাং এই সমগ্র জগৎই মিথ্যা মায়া, এমন কি সমস্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই মিথ্যা।"[১৩]

প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মাধ্যমিকী ব্যাখ্যা

১০। Sogen—Systems of Buddhistic Thought

১১। Suzuki—Outlines of Mahāyāna Buddhism

১২। The standpaint of Mādhyamikas in regard to knowledge is altogether novel. In all the three schools some aspect of common experience is assumed to be true—having taken for granted the subject-series at least as real. The Mādhyamika is quite revolutionary in his view, and questions the validity of knowledge, as a whole. Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy, P. 207

১৩। অনুভব এষ মৃষা—মাধ্যমিক শাস্ত্র, কারিকা ১

কিন্তু নাগার্জুন এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে সাধারণ মানুষের জন্য এই তত্ত্ব নয়। বুদ্ধ সাধারণ অজ্ঞ মানুষের জন্য এই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের জন্যই শূন্যবাদের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। নাগার্জুন বলিয়াছেন, "বুদ্ধের ধর্ম দুই সত্যের উপরে নির্ভরশীল—এক সত্য হইল সাধারণ মানুষের জন্য সম্বৃতি সত্য (empirical truth)। আর এক হইল পণ্ডিতদের জন্য পরমার্থ সত্য (tracendental truth) যাঁহারা এই প্রভেদ বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা বুদ্ধের ধর্মের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে অক্ষম।"[১৪]

মাধ্যমিকদের মত (নাগার্জুন যে ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন) শংকরের বেদান্ত মতের এতই কাছাকাছি যে, অবৈদান্তিক দার্শনিকরা শংকরকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' এবং শূন্যবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শংকর অবশ্য মাধ্যমিক মতকে এই বলিয়া সহজে খণ্ডন করিয়াছেন যে, সত্য বা স্থির (অবধি) বলিয়া যদি কিছুই স্বীকৃত না হয়, তবে শূন্যতারও কোন তাৎপর্য থাকে না। ব্রহ্ম সত্য বলিয়াই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা যায়।[১৫] কিন্তু মাধ্যমিক দার্শনিকরা আপত্তি করিয়াছেন যে শংকর এবং হিন্দু দার্শনিকেরা শূন্যতাকে সম্পূর্ণ অভাবাত্মক নাস্তিত্ব বলিয়া ধরিয়া নিতান্তই ভুল করিয়াছেন। সবই মিথ্যা, কিছুই নাই—ইহা বুদ্ধের বক্তব্য নয়; তাঁহার বক্তব্য চরম সত্তা অনির্দেশ্য অনির্বচনীয়। শংকর নিজেও এই জগৎকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন নাই; তাহাকে অনির্বচনীয়ই বলিয়াছেন।[১৬] আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে নির্বাণ সম্বন্ধেও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মত যে বোধিসত্ত্বের এই সর্বোচ্চ অবস্থার কোন বিশ্লেষণ বা বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই, ইহাকে শূন্য বলা হইয়াছে এবং অস্তিবাচক বা নাস্তিবাচক কোন বিশেষণ দ্বারাই ইহাকে বিবৃত করা যায় না বলিয়াই, এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বুদ্ধ মৌন থাকিতেন।[১৭]

মাধ্যমিক ও শংকর বেদান্তের মতসাদৃশ্য

১৪। নাগার্জুন—মাধ্যমিক শাস্ত্র কারিকা ২৪ ; ৮-৯

১৫। ভামতী ২. ২ ৩১.

১৬ Radhakrishnan—The Teaching of Buddha by Speech and Silence, Hibbert Journal, Apr., 1934

১৭। Candrakīrti ridicules the Hindu philosophers with an incurable obsession in favour of some positive existence and compares them to a person who when told that he would get nothing, expected that 'nothing' would actually be given to him. Commentary of Candrakīrti on Nāgārjuna's Kārikā, XIII, 8

জীবের মধ্যে অবিনশ্বর কিছু আছে বা নাই, এই প্রশ্ন উত্থাপন করা বৌদ্ধ-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তথাগতকে চিরন্তন শাশ্বত অথবা নশ্বর রূপে চিন্তা করা, অথবা তাঁহার অস্তিত্ব আছেও এবং নাইও, অথবা তাঁহার অস্তিত্ব আছে ইহাও নহে আবার অস্তিত্ব নাই ইহাও নহে, এভাবে চিন্তা করা বৌদ্ধ ধর্মবিরুদ্ধ। নির্বাণ কি ভাবাত্মক শাশ্বত অবস্থা, অথবা নাস্তিবাচক ঐকান্তিক বিনাশের অবস্থা, ইহার আলোচনাও বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ।[১৮]

নির্বাণের ব্যাখ্যা

এবিষয়ে বুদ্ধের সত্যকার মত কি, সে বিষয়ে বুদ্ধের জীবিত কালেই মত-ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আমি নির্বাণের অবস্থা অবর্ণনীয় বলাতে কেহ কেহ আমাকে মিথ্যা দোষ আরোপ করে…তাহারা বলে শ্রমণ গৌতম নাস্তিক। সে বলে সদ্-বস্তু নশ্বর, তাহার ঐকান্তিক বিনাশ হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমি যাহা নহি, আমাকে তাহারা তাহাই বলে—যাহা আমার মত নয়, তাহাই তাহারা আমাতে আরোপ করে।"[১৯]

মিলিন্দপনূহ্ গ্রন্থে নাগসেন বুদ্ধের পরিনির্বাণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে নির্বাণ ঐকান্তিক বিনাশ বলিয়াই মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, "**তথাগত** সংসার হইতে চলিয়াছেন, তিনি এমনি **নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছেন** যে, **কোনও মূল অবশিষ্ট নাই,** যাহা হইতে অন্য ব্যক্তির উদ্ভব হইতে পারে। তথাগতের সমাপত্তি হইয়াছে এবং তিনি এখানে বা ওখানে আছেন, ইহা নির্দেশ করা যায় না, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মতের মধ্যে তাঁহার নির্দেশ করা যায়।" "আবার মহাযানী বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ভবাঙ্গ' বা 'সত্তাসাগরে'র বর্ণনা আছে। সত্তা-সাগরের উপর অবিদ্যা বায়ু প্রবাহিত হইবার ফলে তাহার শান্ত প্রবাহে তরঙ্গের উদ্ভব হয়। তখন সুপ্ত আত্মা জাগরিত হয় এবং তাহাতে চিন্তার ও সসীম ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়া, সত্তাসমুদ্র হইতে তাহা পৃথক হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তিত্বের প্রাচীর সুষুপ্তি কালে বিদূরিত হয়। এই ব্যক্তিত্ববিহীন অবস্থাই নির্বাণ। সুষুপ্তিতে সুষুপ্ত ব্যক্তির সত্তা শান্ত প্রবাহে প্রবাহিত। তখন চিন্তার তরঙ্গে বা সত্তাসাগরের প্রবাহে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় না। সেই শাশ্বত **সত্তাসাগরের সহিত একীভূত হওয়াই নির্বাণ,** ঐকান্তিক বিনাশ নহে।"[২০]

১৮। Dr. Das Gupta—History of Indian Philosophy, Vol. I, P. 109

১৯। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

২০। " " " " পৃঃ ২৭৫

বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে ওলডেন্‌বার্গ বা রিজ্‌ ডেভিডস্‌ বলেন, বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ ঐকান্তিক বিনাশ। ডাহ্‌লক্‌ লিখিয়াছেন, "কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মেই দুঃখ হইতে মুক্তির ধারণার মধ্যে ভাবমূলক কিছু নাই, ইহা সম্পূর্ণ অভাবাত্মক ধারণা। ইহার মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দের ভাব নাই।" কিন্তু আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতবর ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার মতে, নির্বাণ পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমা, পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা (a state of perfect bliss), বিনাশের অতল গহ্বর নহে (not abysmal annihilation)। নির্বাণে ব্যক্তিত্বের বিলোপ; তখন আমরা বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্ম হই—কালাতীত দেশাতীত, ক্ষুদ্র সমস্ত গণ্ডীর অতীত হইয়া অতীত, ভবিষ্যত, আগত ও অনাগত সমগ্র সত্তার সঙ্গে একীভূত হই। ইহা অহংকার-বর্জিত কালাতীত পরম শান্ত পবিত্র নিরুত্তাপ আনন্দের অবস্থা।[২১]

ওলডেন্‌বার্গ, রিজ ডেভিডস্‌ ও রাধাকৃষ্ণণের মত

মাধ্যমিকগণ দাবি করেন যে তাঁহারা বুদ্ধের মধ্যম পন্থারই অনুসরণ করেন। ইহা দুই চরম মতই পরিহার করে। এক হইল প্রাচীন হিন্দু মত যে, এক শাশ্বত সদ্‌বস্তু আছে, তাহাই সত্য, অন্য সবই সেই চিরন্তন সত্তারই বিভাব। আর বিপরীত চরম মত হইতেছে যে, কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব নাই—সবই মিথ্যা। মধ্য পথ হইতেছে প্রতীত্যসমুৎপাদ—কোন কিছুরই নিজস্ব শাশ্বত সত্তা নাই—কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, প্রত্যেক মুহূর্তের ক্ষণিক অবস্থা হইতেই উদ্ভূত।

মাধ্যমিকগণ মধ্যপন্থার অনুসারী

মাধ্যমিকগণের নিজস্ব ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে গৌড়পাদ বা শংকরের ব্রহ্মের সঙ্গে মাধ্যমিকদের শূন্য বা নির্বাণ অভেদ বলিয়াই মনে হয়।

হিন্দুধর্মের মধ্যে যে জড়তা, আচার-মূঢ়তা আসিয়া সত্যকে আবৃত করিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম প্রবল ধাক্কায় তাহাকে অপসারিত করিয়াছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে তাহা নিজেই যুক্তিহীন অন্ধ আচারেব পাশে আবদ্ধ হইল। হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করিবার অতিশয় আগ্রহে তাহা বিনাশাত্মক শূন্যবাদের শুষ্কতার মরুভূমিতে তাহার প্রবল প্রাণবেগ হারাইল। কিন্তু বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার সঞ্জীবনী বাণী তো অমর—তাহা যে সর্বকালের জন্য সর্বদেশের জন্য। তাই রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, "বুদ্ধের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না—যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ-

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম

২১। Dr. Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. 1, P. 450 ff.

দুয়ই চরম কথা হয়, তা হলে বাসনা লোপের দ্বারা অস্তিত্ব লোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়—কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন?…এর থেকে বোঝা যায়, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য—আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে—বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়—এই জন্যই অহংকে নির্বাপিত ক'রে দিলেই, সহজে সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে।…অহং আমাদের বোধশক্তিকে চারদিক থেকে এমনি করে আবৃত করে রেখেছে যে, অনন্ত আকাশভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছি নে—এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ একমুহূর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায়, যখন দেখি, তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন।…এই জগৎব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার পাশে ভিড় করে আসত না।"[২২] মৈত্রী ও করুণার অবতার বুদ্ধদেবের সর্ব-মানবপ্রীতি কত গভীর ছিল, তাহা এই একটি মাত্র উপদেশ হইতেই সুস্পষ্ট হইবে—

অহংভাব ও মানবপ্রেম

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্‌ঠংচরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্‌ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

"মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল জীবের প্রতি অপরিমেয় দয়া পোষণ করিবে। ঊর্ধ্বে, অধঃ চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য অপরিমেয় মৈত্রীর ভাব মনের মধ্যে জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে, কী চলিতে, কী বসিতে, কী শয়নে, যে পর্যন্ত না নিদ্রিত হইবে, এই মৈত্রীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে—ইহারই নাম ব্রহ্মবিহার।" কবির সহিত নিত্যনিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব-জর্জরিত, আর্ত পৃথিবী সেই করুণাঘন মহামানবের জয়গান গাহিতেছে—

সকল কলুষ-তামস হর', জয় হোক্ তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিল ভুবনময়!
জয় হোক্ তব জয়!

২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫৬

মহাশান্তি, মহাক্ষেম
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম !
জ্ঞান সূর্য-উদয় ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির রাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর ভয়।
জয় হোক্ তব জয়
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম !
মোহমলিন অতি দুর্দিন, শঙ্কিত চিত পান্থ,
জটিলগহন পথসঙ্কট সংশয় উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ,
দুর্গতিভয়, করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়।
জয় হোক, তব জয় !
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম।[২৩]

সংক্ষিপ্তসার

ভারতভূমিতে যে ধর্মগুলির উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধধর্মই বিশ্বাস করিয়াছে যে প্রচার দ্বারা ধর্মান্তরকরণ সম্ভব। বুদ্ধদেবের আদেশে তাঁহার অনুগামী শিষ্যেরা তাঁহার পরিনির্বাণের পর উত্তরে তিব্বত, চীন, কোরিয়া ও জাপান, পশ্চিমে গান্ধার, পূর্বে, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও কাম্বোডিয়া, দক্ষিণে সাগর অতিক্রম করিয়া সিংহলে এই নূতন জীবনের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণে ও পূর্বে যে বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল তাহা হীনযান নামে পরিচিত। মহাযানী সম্প্রদায়ের মত তিব্বত, চীন, কোরিয়া ও জাপানে প্রচারিত হইয়াছিল। হীনযানীরা প্রাচীনপন্থী, ইঁহারা শুচিতা, কৃচ্ছ্রতা ও শুদ্ধাচার কঠোরভাবে পালনের পক্ষপাতী। মহাযানীরা সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল। হীনযানী ও মহাযানীদের মধ্যে বৌদ্ধ জীবনদর্শন ও নীতিদর্শন সম্পর্কে গভীর মতভেদ রহিয়াছে। এই হীনযানীরা বাস্তববাদী এবং দার্শনিক মতের ভিত্তিতে ইঁহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা হইল বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়। আবার মহাযানীদের মধ্যেও অনুরূপ দুইটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে—যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়। এই চারিটি প্রধান

২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সকল কলুষ তামস হর

বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বিভাগ ও উপবিভাগ রহিয়াছে। সোগেন অন্ততঃপক্ষে ত্রিশটি এই ধরনের উপসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া আরো বহু উপসম্প্রদায় রহিয়াছে।

অন্যান্য দর্শনের মতোই বৌদ্ধ দর্শনও দুইটি প্রধান প্রশ্নের উত্থাপন ও তাহাদের সমাধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রশ্ন দুইটি হইল : (১) সত্যবস্তু কী? এবং (২) কীভাবে সত্য-বস্তুকে জানা যায়? প্রথম প্রশ্নটি হইল অধিবিদ্যাবিষয়ক (Metaphysical) এবং দ্বিতীয় হইল জ্ঞানতত্ত্ববিষয়ক (Epistemological)। এই প্রশ্নের সমাধানে বৈভাষিকগণ বলেন যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বাহিরের জগৎকে ও অন্যান্য মনের অস্তিত্বকে জানা যায়। বৈভাষিকগণের মত বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ নামে পরিচিত। সৌত্রান্তিকবাদীরা বস্তুজগৎ এবং জ্ঞাতার অতিরিক্ত অন্য মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবাদীদের মতো ইঁহারা বলেন না যে, মানুষের মনের বিজ্ঞান বা ভাবই সত্য; বাহ্য বস্তু বা জগৎ মায়া বা প্রতিভাস মাত্র। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে, সদা চলমান বিজ্ঞান-স্রোতের বাহিরে বাহ্য বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। যাদুকরের মায়ার প্রভাবের মতোই আমরা যেখানে কিছুই নাই, সেখানে বাহ্য বস্তু আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই যোগাচারী বিজ্ঞানবাদীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব-প্রমাণ অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাহ্য বস্তু যদি পারমাণবিক ও অংশবিহীন হয়, তবে তাহা আমাদের গোচরীভূত হইতে পারে না। আবার যদি বাহ্য বস্তু যৌগিক ও বহু অংশপূর্ণ হয়, তাহা হইলে এই সকল অংশ একই সঙ্গে প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। যোগাচারীরা বলেন যে, চেতনার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে; নিত্যই বিজ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতেছে; কিন্তু এই বিজ্ঞান-প্রবাহে সমস্ত অতীত বিজ্ঞানের সংস্কার (memory) মগ্ন হইয়া থাকে। অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইলে এই মগ্ন-চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করে। অতএব যে বিজ্ঞানের জন্য অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান, তাহাই শুধু আত্মপ্রকাশ করে। মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ আবার বলে যে, পৃথিবীতে সবই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। তথাকথিত বস্তুজগৎ ও মনোজগতে কোথাও চিরন্তন সত্তা (Absolute Being) বলিয়া কিছু নাই। সর্বত্রই আছে দ্রুত পরিবর্তন। দুইটি মুহূর্তও কোন কিছুই স্থির হইয়া থাকে না। সবই ক্ষণিক, সবই শূন্য। বাহ্য- এবং আন্তর-জগৎ উভয়ই শূন্য। ইঁহাদের মতে সকল পরিবর্তনের পশ্চাতে যে সত্তা আছে তাহা অনির্বচনীয়—তাহাকে জড় বা মন এবম্বিধ কোনরূপ আখ্যায়ই ভূষিত করা যায় না। ইঁহাদের শূন্যতা এই অনির্বচনীয় সত্তাকেই বুঝায়। প্রতীত্যসমুৎপাদের ইঁহারা যে বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। মাধ্যমিকদের সহিত শংকর বেদান্তের সাদৃশ্য রহিয়াছে। সবই মিথ্যা এবং কোথাও কিছুই নাই, ইহা বুদ্ধের বক্তব্য নয়। তাঁহার বক্তব্য হইল, চরম সত্তা অনির্দেশ্য ও অনির্বচনীয়। তাই এতদসম্পর্কে বুদ্ধদেবকে কোন প্রশ্ন করা হইলে তিনি মৌন থাকিতেন। বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ-ধারণা সম্পর্কেও বহু মতভেদ রহিয়াছে। নাগসেন বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ বলিতে ঐকান্তিক বিনাশকেই বোঝানো হইয়াছে। বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে ওলডেন্‌বার্গ, রিজ ডেভিডস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা

বলিয়াছেন যে, নির্বাণের ধারণা হইল সম্পূর্ণরূপে অভাবাত্মক। অবশ্য আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্বাণ হইল পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমা, পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা। মাধ্যমিকগণ মধ্য পন্থায় বিশ্বাসী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক শাশ্বত সদ্‌বস্তু আছে, এবং ইহা এক চিরন্তন সত্তারই বিকাশ, ইহা হইল প্রাচীন হিন্দুমত। ইহার বিপরীত মত হইল যে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই উভয়বিধ চূড়ান্ত মত পরিহার করিয়া মাধ্যমিকগণ প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব প্রচার করিলেন। ইঁহারা বলিলেন যে, কোন কিছুরই নিজস্ব শাশ্বত সত্তা নাই, আবার তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে। প্রত্যেক মুহূর্তের ক্ষণিক অবস্থা পূর্ববর্তী ক্ষণিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত। মাধ্যমিকগণের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে পুরাপুরি গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে গৌরপাদ বা শংকরের ব্রহ্মের সঙ্গে মাধ্যমিকদের শূন্য বা নির্বাণের কোন ভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের জড়তা ও আচারমূঢ়তাকে আঘাত করিয়া ইহাদের কবল হইতে এই সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মকে মুক্তি দিয়াছিল। বুদ্ধধর্ম প্রচার করিল যে লোক-লোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করিতে হইবে। এই জগৎব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করিতে হইলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করিতে হয়।

প্রশ্নমালা

1. Compare and contrast the main tenets of Mahāyāna and Hīnayāna Schools of Buddhism.

2. What are the main subdivisions of the Mahāyāna and Hīnayāna Schools of Buddhism. State and explain their main contentions.

3. State and explain the fundamental position of the Śunyavādīs.

4. Compare and contrast the main tenets of Sankara Vedānta and the Mādhyamika Schools of thought incidentally referring to the fundamentals of Hinduism and Buddhism.

ষষ্ঠ অধ্যায়

আস্তিক দর্শন : ন্যায়-বৈশেষিক

ভারতীয় দর্শনের প্রধান ধারা হইতেছে আস্তিক, অর্থাৎ ইহারা সকলেই বেদকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন নাস্তিক, কারণ তাঁহারা বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেন না। মাধবাচার্য প্রসিদ্ধ সর্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ, মাধ্ব, পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর, পাণিনীয়, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা (শংকর বেদান্ত), এই ভাবে ক্রমবিকাশ ও অধিকারভেদ অনুসারে ষোলটি দার্শনিক মত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ (পাতঞ্জল), (পূর্ব) মীমাংসা ও (শংকর) বেদান্তকে হিন্দু দার্শনিকেরা ষড়দর্শন বলিয়া থাকেন।[১]

হিন্দু ষড়দর্শনগুলিকে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য অনুযায়ী তিন দলে ভাগ করা যায়—

ন্যায়প্রস্থান, সাংখ্য-প্রস্থান ও মীমাংসা-প্রস্থান

প্রথম, বৈশেষিক ও ন্যায় হইল **ন্যায়প্রস্থান**। ইহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—বিচার পদ্ধতি ও পদার্থতত্ত্ব। উভয় পদ্ধতির এ বিষয়ে বহু মিল আছে—কাজেই ইহারা সমানতন্ত্র। **দ্বিতীয়**, সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ হইল **সাংখ্যপ্রস্থান**। ইহাদের বিষয়বস্তু হইল—জগতের মূল সত্তার সংখ্যা নির্ণয় ও চিত্তবৃত্তি সংযমের উপায়নির্দেশ। ইহারাও উভয়ে সমানতন্ত্র। **তৃতীয়**, মীমাংসা ও বেদান্ত **মীমাংসাপ্রস্থান**। ইহাদের উদ্দেশ্য—বেদ ও উপনিষদ্ অনুযায়ী ব্রহ্মের স্বরূপ মীমাংসা। ইহারা উভয়েও সমানতন্ত্র।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য, মীমাংসা অথবা শংকর বেদান্তের পূর্বে রচিত হইয়াছে। কারণ সাংখ্যসূত্র, মীমাংসাসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রে বৈশেষিকদের উল্লেখ আছে।[২] কি করিয়া ন্যায়ের (syllogism) ব্যবহার দ্বারা অনুমানে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, বৈশেষিক দর্শনে সংক্ষেপে তাহার প্রণালী আলোচিত

১। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র। হরিভদ্র সূরির ষড়দর্শন সমুচ্চয় নামে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। তিনি প্রখ্যাত জৈন পণ্ডিত। তাঁহার গ্রন্থে অবশ্য ষড়দর্শন বলিতে বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য, জৈন, বৈশেষিক ও মীমাংসা এই ছয় দার্শনিক মত বুঝাইয়াছেন।

২। ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ—সাংখ্যসূত্র ১।২৪
কর্মৈকে তত্র দর্শনাৎ—মীমাংসা সূত্র ১।১।৬
মহদ্দীর্ঘাবদ্বাহ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্—ব্রহ্মসূত্র ২।২।১১

হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে এই প্রণালী বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে তিনটি হেত্বাভাসের (fallacies) উল্লেখ আছে। ন্যায় দর্শনে তদুপরি আরও দুইটি অর্থাৎ পাঁচটি হেত্বাভাস আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় ন্যায় অপেক্ষা বৈশেষিক প্রাচীনতর।[৩]

বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' নামে এক পদার্থ (category) স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য দর্শনে এই পদার্থের পৃথক স্বীকৃতি নাই। 'বিশেষ' এই দর্শনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। কাজেই এই দর্শনকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়।

বৈশেষিক সূত্রকার ঋষির এক উপাধি 'কণাদ'। ক্ষেত্র হইতে কৃষকেরা শস্য কাটিয়া নিলে মাটিতে যে শস্যকণা পড়িয়া থাকে, তাহা কুড়াইয়া নিয়া, উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করিতেন বলিয়া, মহর্ষি কণাদ এই উপাধি হইয়াছিল। কণাদ ঋষির নাম ছিল উলূক, এইজন্য তাঁহার রচিত দর্শন ঔলূক্যদর্শন নামেও পরিচিত। মুনি প্রশস্তপাদ ও আচার্য উদয়ন উল্লেখ করিয়াছেন যে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে মহর্ষি কণাদ দুশ্চর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহারই আজ্ঞায় এই দর্শন প্রণয়ন করেন। প্রাচীন ঋষিগণ কেহই নিজেদের কোন দার্শনিক মতের কর্তা বলিয়া দাবি করেন না, তাঁহারা বলেন তাঁহারা সংকলয়িতা বা প্রকাশক মাত্র।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই এই দর্শনের উদ্দেশ্য

সমস্ত ভারতীয় দর্শনই এ বিষয়ে একমত যে জীবন দুঃখময়; জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখভোগ করিতে হয়। এই দুঃখের পাশ হইতে কি করিয়া চিরতরে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহাই সমস্ত দর্শনের চিন্তার বিষয়। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রের প্রথমটিতেই বলিয়াছেন—অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ—এইবার ধর্ম কি, তাহা বলিব। দ্বিতীয় সূত্রেই বলিলেন—যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ—যাহা হইতে নিশ্রেয়স সিদ্ধি, অথবা দুঃখের আত্যন্তিক অবসান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তাহাই ধর্ম। ধর্মের উদ্দেশ্যই হইতেছে, সত্যজ্ঞান দ্বারা মুক্তির পথনির্দেশ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলাভের পথ। শাস্ত্রবাক্য শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণের পর তাহার মনন (বিশ্লেষণ-বিবেচনা-সিদ্ধান্ত) প্রয়োজন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান মননের (proper understanding) সহায়ক।

দুঃখের নিবৃত্তি—বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্য

৩। সুখময় ভট্টাচার্য—বৈশেষিক দর্শন, পৃঃ ২

বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ

যে যে মৌলিক বিষয় অবলম্বনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহারা হইল পদার্থ (categories)। বৈশেষিক দর্শনে ছয়টি পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। এই ছয় বিষয়ের সম্যক আলোচনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, ন্যায়-বৈশেষিক-নির্দিষ্ট পথে, বিরুদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই ভাবেই আত্মতত্ত্ব স্থাপিত হয়। অবশেষে গভীর ধ্যান ও অনুশীলন (নিদিধ্যাসন) দ্বারাই আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। সুতরাং বৈশেষিক দর্শনের এই দাবি যে, মনন শাস্ত্ররূপ বৈশেষিকের আলোচনা দ্বারাই অজ্ঞানতা দূর হইয়া, মুক্তির পথ সুগম হয়। বৈশেষিক সূত্রে উপরিউক্ত ছয়টি পদার্থেরই ব্যাখ্যা আছে। সুতরাং প্রাচীন আচার্যেরা বৈশেষিককে ষট্‌পদার্থবাদীও বলেন। একটি প্রাচীন শ্লোকে বৈশেষিকগণের ষট্‌পদার্থবাদকে উপহাস করা হইয়াছে—

ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরংগন্তুকামস্য হিমবদ্‌গমনোপম্॥

অর্থাৎ ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ছয়টি পদার্থেব বর্ণনা করা এবং সমুদ্র যাত্রা করিয়া হিমালয় অভিমুখে যাওয়া একই রকম মূর্খতা। আবার মহর্ষি কণাদ অভাব সম্বন্ধেও বহু আলোচনা করিয়াছেন ; সেজন্য প্রশস্তপাদ ও উদয়ন বলিয়াছেন যে, বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ ছয়টি নয়, সাতটি। অভাবও একটি পদার্থ। সাংখ্য এবং পূর্বমীমাসাংসায়ও অভাব পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত নয়, অথচ এ বিষয়ে আলোচনা আছে। পরবর্তী সমস্ত বৈশেষিক দার্শনিকেরা দ্রব্য, গুণ, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত পদার্থই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা লক্ষণীয় যে এই পদার্থগুলির মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। মহর্ষি কণাদ তাঁহার রচিত দর্শনসূত্রে কোথাও ঈশ্বরের নাম করেন নাই।

বৈশেষিক দর্শনের সপ্ত পদার্থ

কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে দ্রব্যপদার্থের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। শংকরাচার্যের মতে, বৈশেবিক দর্শন নিরীশ্বর। বৈশেষিক মতে, বস্তুজগৎ নিত্য ও অসৃষ্ট পরমাণুসৃষ্ট এবং জীবের বিভিন্ন অবস্থা অদৃষ্টজাত। সুতরাং জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। ডঃ দাসগুপ্ত-ও অনুমান করিয়াছেন যে, মীমাংসা দর্শনের মতো বৈশেষিক দর্শনও প্রথমে নিরীশ্বরবাদী ছিল এবং বৈশেষিক দর্শন মীমাংসা দর্শনের এক শাখা ছিল। এই মত অবশ্য সকলে গ্রহণ করেন না। মহর্ষি কণাদ বেদের প্রামাণ্য স্থাপনকল্পে—তদ্‌বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যং—এই সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন এবং অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 'তৎ' শব্দ

স্পষ্টই ঈশ্বরবাচক। পরবর্তী বৈশেষিকগণ অবশ্য পরিষ্কার ভাবেই ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। প্রশস্তবাদ ঈশ্বরকেই জগৎ-কারণ বলিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরকে তাঁহার দর্শনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেন নাই। তাঁহার পরে অন্য বৈশেষিক দার্শনিকেরা পরমাণুদের প্রথম সঞ্চালক এবং অদৃষ্টের সুচারু বণ্টনকারী বুদ্ধিমান ও ন্যায়বান শক্তি হিসাবে ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস

দ্রব্য[৪]

গুণ ও ক্রিয়ার আধার দ্রব্য

যে পদার্থ গুণ (qualities) এবং ক্রিয়ার (activity) আধার তাহাই দ্রব্য। দ্রব্য সমবায়েই বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হয়, সুতরাং দ্রব্য তাহাদের সমবায়ী-কারণ। সূত্র দ্বারা বস্ত্র নির্মিত হয়, তাই সূত্র দ্রব্য—ইহা বস্ত্রের সমবায়ী-কারণ। দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি পঞ্চমহাভূত।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের আধার ক্ষিতি

ক্ষিতি—যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ থাকে তাহাই ক্ষিতি। গন্ধ হইল ক্ষিতির বিশেষ গুণ। জল বা বায়ুতে ক্ষিতির মিশ্রণ না থাকিলে তাহাতে কোন গন্ধ থাকে না। প্রত্যেক ভূতের অনুভবের জন্য একটি করিয়া বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে। সেই সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূতের দ্বারা গঠিত। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপাদান হইল ক্ষিতি। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় মাত্র। ক্ষিতির পরমাণু নিত্য ও অসৃষ্ট। অনিত্য ক্ষিতি তিন ভাগে বিভক্ত: দেহ, ইন্দ্রিয় ও উপভোগের বিষয়। বৈশেষিক মতে, শরীরের উপাদান হইল ক্ষিতি। জল, বায়ু ইত্যাদি অন্য চতুর্বিধ ভূত পার্থিব শরীরে যুক্ত থাকিলেও, তাহারা শরীরের উপাদান নহে।

দ্রবত্ব জলের স্বাভাবিক গুণ

জল—জলে রূপ, রস ইত্যাদি চতুর্দশ গুণ থাকে। ইহার বিশেষ গুণ স্নেহ। চূর্ণ বস্তু জলের সাহায্যে পিণ্ডাকৃতি করা যায়, যেহেতু জলে স্নেহগুণ বিদ্যমান। জলের স্পর্শ শীতল এবং দ্রবত্ব ইহার স্বাভাবিক গুণ। জলের পরমাণু নিত্য। অনিত্য জল তিন প্রকারের: শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। রসনা জলের ইন্দ্রিয়। রসনা রসের অভিব্যঞ্জক।

৪। তর্কসংগ্রহ—দ্রব্য ও উদ্দেশ অধ্যায়।

তেজঃ—উষ্ণতা ইত্যাদি গুণের আশ্রয় হইতেছে তেজঃ। যে দ্রব্যের রূপ আছে অথচ রস নাই, তাহা তেজঃ। তেজের রূপ হইতেছে ভাস্বর-শুক্ল। সোনা রূপা, পিতল, কাঁসা ইত্যাদি ধাতুদ্রব্য তেজ পদার্থ, সুতরাং ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত বাসনপত্রকে তৈজস বলা হয়। বর্ণ তেজের বিশেষ গুণ। নিত্য ও অনিত্যরূপে তেজও দুই প্রকার। পরমাণুরূপে তেজ নিত্য। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় অনুযায়ী, তেজ তিন প্রকার। তেজের ইন্দ্রিয় হইতেছে চক্ষু। চক্ষুরিন্দ্রিয় শুধু রূপেরই প্রকাশক।

উষ্ণতা প্রমুখ গুণের আশ্রয় তেজ

বায়ু—যাহার স্পর্শ আছে অথচ রূপ নাই, সেই দ্রব্যই হইল বায়ু। বায়ুতে স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি ইত্যাদি নয়টি গুণ আছে। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ। বায়ুর স্পর্শ উষ্ণও নহে, শীতলও নহে। বায়ুর রূপ নাই, তাই তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না—তবে ত্বক দ্বারা তাহার স্পর্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বায়ু নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার। বায়বীয় পরমাণু নিত্য। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে অনিত্য বায়ু তিন প্রকার। ত্বকই বায়ুর ইন্দ্রিয়। ত্বক ইন্দ্রিয় শুধু স্পর্শের অভিব্যঞ্জক। যে বায়ু মুখ ও নাসিকা দ্বারা চলাচল করে, তাহার সংজ্ঞা প্রাণ; যে বায়ুর অধোগতি মলমূত্রাদির নিঃসারক তাহার নাম অপান। উর্ধ্বগামী কণ্ঠবর্তী উৎক্রমণ বায়ু হইল উদান। এবং যে বায়ু সর্বশরীরে চলাচল করে, তাহার নাম ব্যান।

স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি নয়টি গুণের আধার বায়ু

আকাশ—যে দ্রব্য শব্দগুণের আশ্রয়, তাহার নাম আকাশ। শব্দ ছাড়াও সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণ কয়টিও আকাশে বিদ্যমান। একই আকাশ খণ্ডিত ও সীমিত হইয়া ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। আকাশ সর্বব্যাপী। শ্রোত্রই আকাশের ইন্দ্রিয়। আকাশ নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। আকাশ প্রত্যক্ষ বস্তু নয়। শব্দকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া আকাশের অনুমান করি।

শব্দগুণের আশ্রয়—আকাশ

কাল—কালও একটি সত্তা। কাল আকাশের মতো এক, নিত্য ও অখণ্ড। কালের পরিমাণ দ্বারা জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ইত্যাদি নির্দিষ্ট হয়। কাল অখণ্ড হইলেও ব্যবহারের সুবিধার জন্য তাহাকে বিভাগ করিয়া মুহূর্ত, প্রহর, দিন, সপ্তাহ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়। সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ—কালের এই কয়টি গুণ থাকে। কাল সমগ্র জগতের আশ্রয় এবং সকল অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের নিমিত্ত-কারণ।

কাল নিত্য ও অখণ্ড

আকাশের ন্যায় কালও সর্বব্যাপী (বিভু)। কাল প্রত্যক্ষের বিষয় নহে—অনুমানের বিষয়।[৫]

দিক্—কালের ন্যায় দিক্‌ও নিত্য, বিভু, প্রত্যক্ষের অগোচর। পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি জ্ঞানে হেতুহিসাবে দিক্ পদার্থ অনুমান করি। দূরত্ব, নিকটত্ব ইত্যাদি বোধও দিক্ দ্রব্য হইতেই হয়। দিকের সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, ও বিভাগ এই পাঁচটি গুণ। দিক্‌ও সকল অনিত্য বস্তুর নিমিত্ত-কারণ। দিক এক। কিন্তু পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি সংজ্ঞার দ্বারা দিকের বিভাগ কল্পিত হয়। যে দিকে সূর্য প্রথম উদিত হয়, তাহারাই কল্পিত নাম পূর্বদিক্। তার্কিক শিরোমণি রঘুনাথ কাল ও দিক্‌কে পৃথক বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে, ঈশ্বরই দিক্ ও কালের আশ্রয়।[৬]

দিক্ নিত্য ও প্রত্যক্ষের অগোচর

আত্মা—আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়। জীবাত্মা ও **পরমাত্মা**—আত্মার এই দ্বিবিধ-রূপ। জীবাত্মা নিত্য, কারণ তাহা নিরবয়ব (without parts), অখণ্ড ও বিভু। বহু দেহ অনুযায়ী জীবও বহু। প্রত্যেক জীবের অদৃষ্ট অনুযায়ী, তাহার সুখ ও দুঃখ অনুভব এবং অবস্থাও বিভিন্ন। আমিত্ব-বোধ জীবাত্মার লক্ষণ।[৭] বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম এই চৌদ্দটি গুণ জীবাত্মায় বর্তমান। প্রত্যেকেই নিজ সুখদুঃখ দ্বারা নিজ নিজ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। অন্য জীবে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান দ্বারা জানিতে হয়। প্রত্যেক জীবাত্মাই পৃথক পৃথক দেহের সহিত যুক্ত, কিন্তু জীবাত্মা শরীর হইতে ভিন্ন। জ্ঞান দেহের ধর্ম নয়—আত্মারই ধর্ম। বহিরিন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের সহায়ক বা করণ (instruments) বটে, কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয় নয়। অন্তরেন্দ্রিয় মনকেও আত্মা বলা যায় না। তাহা জ্ঞানের করণ, কিন্তু জ্ঞানের

আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়

৫। বৈশেষিক সূত্র—২।১।১৩ ; ২।১।২৮ ; ২।২।৭ ; ২।২।১১ ; ৩।২।২ ; ৩।২।৫ ইত্যাদিতে বায়ু, কাল, দিক্, আত্মার নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

৬। তার্কিক শিরোমণি রঘুনাথ—পদার্থতত্ত্বনিরূপণ

রাসেল্, আলেকজাণ্ডার, আইনস্টাইন প্রমুখ দার্শনিকগণের দেশ ও কাল সম্পর্কীয় অভিমত সম্বন্ধে বর্তমান পুস্তকের সহ-প্রকাশন "পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় (পৃঃ ১২০-১৪৬) দ্রষ্টব্য।

৭। সন্দিগ্ধস্ত উপাচারঃ—বৈশেষিক সূত্র ৩।২।১৩—শরীরে অহংবুদ্ধি এত দৃঢ় যে তাহা যে উপাচার (আরোপ), এবং শরীর যে অহং নহে, তাহা বিশ্বাস হয় না। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন অবয়বে অহং বুদ্ধি হয় না। মৃতদেহেও অহং বুদ্ধি হয় না। আত্মা আছে বলিয়াই অহংবোধ।

আশ্রয় নয়। জ্ঞানের কর্তা হইতেছে আত্মা। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহযোগে ঘটিয়া থাকে। দেহের ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ুর গতি, চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলন ইত্যাদি, বা মনের সুখ, দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি চেতন আত্মার সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জীবাত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ—জ্ঞানরূপ অনিত্য চৈতন্যের আশ্রয় মাত্র।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা

পরবর্তী বৈশেষিক দর্শনমতে, 'আত্ম' শব্দ দ্বারা মহর্ষি কণাদ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়কেই প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরমাত্মা বা ঈশ্বরে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, প্রযত্ন ও ইচ্ছা এই আটটি গুণ বর্তমান। ঈশ্বর এক। **একোহবৈ নারায়ণঃ, একমেবাদ্বিতীয়ম্** ইত্যাদি শ্রুতির মহাবাক্যে ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড় সম্বন্ধ অথচ তাহাদের ভিন্নতা সম্পর্কেও ঋগ্বেদ সূক্ত প্রমাণ।[৮] বৈশেষিক সূত্রে ইহা প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।[৯] জীবাত্মা বদ্ধ, সুখদুঃখ দ্বারা অভিভূত, অদৃষ্ট দ্বারা তাহার ভোগ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পরমাত্মা মুক্ত, সুখদুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে না। প্রাচীন কোন কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা ও প্রযত্নকে ঈশ্বরের গুণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীধরভট্ট উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী দার্শনিকেরা জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নকে পরমাত্মার বিশেষ গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পরমাত্মার সমস্ত গুণই নিত্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে বৈশেষিকগণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ক্ষিতি, জল ইত্যাদি অনিত্য বস্তুগুলির নিশ্চয়ই কোন কর্তা আছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ

এই সকল কার্যবস্তুর নির্মাতা নহে। কাজেই সর্বশক্তিমান একজন কর্তা স্বীকার করিতে হয়। ইহার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও রহিয়াছে—'দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য

৮। ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৬৪তম সূক্ত, ২১শ ঋক্। also

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্তানশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩, ১, ১-২

৯। বৈশেষিক সূত্র ৩, ১, ১৯

গোপ্তা'—একজন আছেন যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও ত্রিভুবনের রক্ষক। আবার টীকাকার শংকর মিশ্র বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষগোচর ঘটাদির যেমন একজন কর্তা আছেন, তেমনি খণ্ড প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টির জন্য নিত্য পরমাণুদের সংযোগ দ্বারা দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু (দুই বা তিন অণুর সমাবেশ) ইত্যাদি সৃষ্টির জন্যও একজন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আবার তিনিই মানুষের কর্মফল অনুযায়ী অদৃষ্ট বণ্টন করেন। পৃথিবীর সকল কার্যেরই তিনি নিমিত্ত-কারণ।

জীবাত্মা এবং পরমাত্মাই শুধু বিভিন্ন নয়, জীবাত্মাও পরস্পর হইতে বিভিন্ন। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, এক আত্মার ধর্মাধর্ম প্রভৃতি গুণ অপর আত্মার সুখদুঃখাদির কারণ হয় না। এক ব্যক্তির কর্মের ফল সে নিজেই ভোগ করে, অন্য কোন জীব ভোগ করে না। এক জীবের বন্ধন বা মুক্তিতে অন্য জীবের বন্ধন বা মুক্তি ঘটে না। প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবের বাস। দেহের অবসানেও জীবের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। কোন জীবাত্মার যখন মুক্তি ঘটে, তখন তাহা পরামাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া মিশিয়া যায়। জীবের বৈশিষ্ট্য নিত্য।[১০] জীবের বহুত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য দর্শনের যুক্তিও অনুরূপ।[১১] এই মত অদ্বৈত বেদান্ত মতের বিপরীত।

জীবাত্মারা পৃথক ও বহু

মন—মন অন্তরেন্দ্রিয়; এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, সুখদুঃখ ইত্যাদি অনুভব হয়। জীবদেহে মনরূপ একটি অন্তরেন্দ্রিয় আছে, তাহার সহিত বহিরিন্দ্রিয়ের যোগ ঘটিলে তবেই জ্ঞান হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একই কালে বহু বস্তুর যোগ হইলেও একটি মাত্র বিষয়েই জ্ঞান হয়, তাহার কারণ মন একটি মাত্র বাহ্যেন্দ্রিয়ের সঙ্গেই তৎকালে যুক্ত হয়। মনে এক মুহূর্তে একটি মাত্রই জ্ঞান হয়; কাজেই অনুমান হয় যে, মন পরমাণুর মতো অতিশয় সূক্ষ্ম। মনকে প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না। অনুমান দ্বারা তাহার অস্তিত্ব আমরা জানি। সুখদুঃখ প্রত্যক্ষের বিষয়। 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' ইহা আমি তৎক্ষণাৎ জানি। কিন্তু সুখদুঃখ-বোধের জন্য কোন বহিরিন্দ্রিয় তো নাই। সুতরাং অনুমান করিতে হয় যে, মনরূপ এক অন্তরেন্দ্রিয়ই সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কারণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, দেশ বিষয়ে পরত্ব ও অপরত্ব এবং বেগ রূপ সংস্কার মনে অবস্থিত। মন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগামী, কিন্তু

মন অন্তরেন্দ্রিয়

১০। বৈশেষিক সূত্র ৬।১।১৫, ৩।২।২০ ইত্যাদি

১১। জনন মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং...সাংখ্যকারিকা ১৮

বিভিন্ন বিষয়ে একই মুহূর্তে মনোযোগ হয় না—তাহা ক্রমিক পর্যায়ে ঘটে। উপমা-স্বরূপ বলা হইয়াছে—'উৎপলপত্র শত ব্যতিভেদ-ন্যায়', অর্থাৎ তীক্ষ্ণ শলাকা দ্বারা একই মুহূর্তে শতটি কোমল পদ্মপাতা ছিদ্র হইল মনে করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে একটি একটি করিয়া পাতাই বিদ্ধ হয়। মনোযোগও ঠিক একই প্রকার। প্রত্যেক জীবের একটি মাত্রই মন। মৃত্যুকালে দেহ হইতে মন উৎক্রান্ত হয়। মহাভারতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের উল্লেখ আছে।[১২] বৈশেষিক মতে তাহাই মন বা অন্তঃকরণ।

গুণ—কণাদ গুণের সংজ্ঞা দিয়াছেন—যাহা দ্রব্য আশ্রয় করিয়া থাকে, দ্রব্যের আশ্রয় ভিন্ন যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহার নিজের কোন গুণ নাই (গুণের আবার গুণ থাকিতে পারে না), যাহা সংযোগ বা বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ (অর্থাৎ, যাহা সংযোগ বা বিভাগের কারণ নহে,—কর্মই সংযোগ-বিভাগের কারণ) তাহাকেই গুণ বলা হয়।[১৩] কণাদ নিম্নলিখিত সতেরোটি গুণের কথা বলিয়াছেন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন। প্রশস্তবাদ এই সঙ্গে গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, ধর্ম, অধর্ম, শব্দ ও সংস্কার এই সাতটি গুণ যোগ করিয়াছেন।

গুণ দ্রব্যাশ্রয়ী

গুণ দ্রব্য ও কর্ম হইতে পৃথক। লঘুত্ব পৃথক গুণ নহে, কেন না গুরুত্বের অভাবই লঘুত্ব। অনুরূপ কারণে মৃদুত্ব ও কঠিনত্বও স্বতন্ত্র গুণ নহে—তাহারা সংযোগের বিভিন্ন পরিমাণ মাত্র।

নিত্য দ্রব্যের গুণও নিত্য। আবার অনিত্য দ্রব্যের গুণ অনিত্য।

যে সমস্ত গুণ বহু দ্রব্যের মধ্যেই থাকে, তাহারা সাধারণ গুণ। আবার যে সব গুণ কোন বিশেষ দ্রব্যেই আশ্রিত, তাহা হইল বিশেষ গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ সমস্ত দ্রব্যেই বর্তমান—ইহারা তাই সাধারণ গুণ। কিন্তু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের গুণ এবং এ সব গুণ দ্বারা এক দ্রব্যকে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথক করা যায়। দিক ও কালের এতদ্ব্যতীত কোন গুণ নাই। কিন্তু আকাশের শব্দরূপ গুণ আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ সকলেরই রূপ আছে। জল ও তেজের রূপ পরিবর্তিত

নিত্য দ্রব্যের গুণ নিত্য : অনিত্য দ্রব্যের গুণও অনিত্য

১২। সত্যবানের দেহ হইতে ধর্মরাজ যম অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষকে সবলে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছিলেন এ প্রকার উক্ত হইয়াছে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ"। মহাভারত, বনপর্ব, ২৯৬।১৭

১৩। দ্রব্যাশ্রয়ী অগুণবান্ সংযোগ বিভাগেষু অকারণম্ অনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্। বৈশেষিক সূত্র ১।১।১৬

হয় না। কিন্তু তাপ যুক্ত হইলে ক্ষিতির রূপের পরিবর্তন হয়।' ক্ষিতি ও জল ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যের রসগুণ নাই। কটু, অম্ল, কষায়, তিক্ত ও মিষ্ট—এই পাঁচ প্রকার রস। গন্ধ দুই—প্রকার সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ। স্পর্শ ত্রিবিধ—শীতল, উষ্ণ এবং না-শীতল না-উষ্ণ। দ্রব্যের তাপের ভেদকে স্পর্শ বলা হয়। ক্ষিতি, জল, তেজ ও মহৎ সকলেরই স্পর্শগুণ আছে। কঠিনতা, কর্কশতা, মসৃণতা এবং কোমলতাও স্পর্শগুণেরই প্রকাশ। শব্দগুণ কেবলমাত্র আকাশেরই আছে।

সংখ্যা দ্রব্য-নির্ভর নয়

বস্তুর যে গুণের জন্য তাহাদের এক দুই তিন বলিয়া গণনা করি, তাহাই সংখ্যা। সংখ্যা ইত্যাদি গুণ দ্রব্য-নির্ভর নয়—"বুদ্ধিনির্মাণ" (subjective)।[১৪]

অনিত্য ও নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ

বস্তুর যে গুণের জন্য তাহাদিগকে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাহাদের পরিমাণ। আকাশ, দিক্, কাল ও আত্মা বিভু (সর্বব্যাপী)। অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য, কিন্তু আত্মা, মন, কাল, দিক, আকাশ ও পরমাণুর পরিমাণ নিত্য।

মন মূর্ত দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, সংস্কার ও বেগ এই নয়টি মনের গুণ। আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম ও অধর্ম এই আটটি। এই গুণগুলির মধ্যে কতগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আবার ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন আত্মার এ কয়টি গুণ মনগ্রাহ্য। ইন্দ্রিয় ও আত্মার মধ্যে যোগসাধনের সেতু হইতেছে মন।

যে গুণের জন্য এক জাতীয় দ্রব্যকে অন্য জাতীয় দ্রব্য হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইতেছে পৃথকত্ব। এ গুণের জন্য 'ঘট পট হইতে পৃথক'। বৈশেষিকগণ বলেন, 'ঘটটি পট নহে' এবং 'ঘটটি পট হইতে পৃথক' এই দুই প্রতীতি এক নহে। বৈশেষিকমতে পৃথকত্ব ভাব পদার্থ।

সংযোগ বিভিন্ন বস্তুকে যুক্ত করে

বস্তুর যে গুণবশতঃ তাহারা ভিন্ন হইলেও একত্র যুক্ত হয়, সে গুণের নাম সংযোগ। সংযোগ আবার তিন প্রকার—অন্যতর কর্মজ, উভয় কর্মজ এবং সংযোগজ। যে কর্মজ সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অভিঘাত এবং যে সংযোগ হইতে শব্দ হয় না, তাহা হইল নোদন।

১৪। cf. Kant.; also Russell's "logical constructs".

যে গুণ সংযোগের বিনাশ করে, তাহা বিভাগ। কিন্তু সংযোগের অভাবই বিভাগ নহে। ঘট পট হইতে বিভক্ত এবং ঘটে পট সংযোগের অভাব আছে—এই দুইটি প্রতীতি এক নহে।

বিভাগ সংযোগের বিনাশ করে

যে গুণ দ্বারা দীর্ঘকাল ও স্বল্পকালের (short and long duration) জ্ঞান হয়, অথবা স্থানে নৈকট্য বা দূরত্ব বোঝায়, তাহাই পরত্ব বা অপরত্ব গুণ। যাহার শরীরে কালের সংযোগ যত বেশী, তিনি তত জ্যেষ্ঠ (পর), আর যাহার দেহে কালের সংযোগ যত কম তিনি তত কনিষ্ঠ।[১৫]

বুদ্ধি আত্মার এক গুণ। বুদ্ধি দুই প্রকার অনুভূতি ও স্মৃতি। বুদ্ধি হইতেই উপলব্ধি বা জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে অনুভূতিসঞ্জাত। অনুভবের সংস্কার (retention) হইতে যে জ্ঞান, তাহাই স্মৃতি।[১৬]

সুখদুঃখের অনুভূতি প্রত্যেক জীবে আছে। ঐহিক সুখ মাত্রই দুঃখমিশ্রিত, পারত্রিক স্বর্গ সুখদুঃখলেশশূন্য। ধর্ম হইতে সুখ এবং অধর্ম হইতে দুঃখ।

যে গুণ বিশেষ হইতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই ইচ্ছা। ইচ্ছা দুই প্রকার—ফলেচ্ছা ও উপায়েচ্ছা। ইচ্ছা আত্মার এক গুণ।

দ্বেষও আত্মার গুণ। দ্বেষ উপস্থিত থাকিলে সে কাজে ইচ্ছা জন্মে না। যে বস্তু হইতে দুঃখের সম্ভাবনা, সে বস্তু সম্বন্ধে দ্বেষ থাকে।

যত্ন আত্মার আর একটি গুণ। যত্ন তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি। যত্ন ব্যতীত কার্য সম্পাদিত হয় না।

গুরুত্ব জড়বস্তুর এক গুণ। গুরুত্ব গুণ থাকে বলিয়াই কোন বস্তু নিম্নে পতিত হয়। ক্ষিতি ও জলে গুরুত্ব আছে—তেজ পদার্থে গুরুত্ব নাই। গুরুত্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে, ইহা অনুমান সাপেক্ষ। বল্লভাচার্য কিন্তু মনে করেন যে, স্পর্শের দ্বারা গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়।

দ্রবত্ব গুণ হইতেই দ্রব্যের ক্ষরণ ঘটে। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক, কিন্তু ক্ষিতি ও তেজের দ্রবত্ব কারণাধীন।

স্নেহ গুণের জন্য চূর্ণ পদার্থ পিণ্ডীকৃত হয়। জলেই শুধু এই গুণ বর্তমান।

সংস্কার অর্থাৎ প্রবণতা (tendency) তিন প্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপকতা ও ভাবনা। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও তেজে বেগরূপ সংস্কার থাকে। বস্তুর

১৫। বৈশেষিক সূত্র—উপস্কার (শংকর মিশ্র) ১. ১. ১৬-২০

১৬। আত্মমনসোঃ সংযোগাঃ বিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ স্মৃতিঃ—বৈশেষিক সূত্র ৯।২।৬

যে গুণের জন্য তাহা টানিলে বাড়ে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসে, তাহাকে স্থিতিস্থাপকতা গুণ বলে। এই সংস্কার শুধু ক্ষিতিতেই বর্তমান। ভাবনারূপ সংস্কার জীবে উৎপন্ন হয়। ইহারই জন্য জীব পূর্বানুভূত বস্তু স্মরণ করিতে পারে। সমস্ত সংস্কারই অনিত্য। স্থিতিস্থাপকতা ও ভাবনা সংস্কার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ভাবনা জীবের সংস্কার।

সংস্কার ত্রিবিধ

শব্দ—আকাশই শব্দের আশ্রয়। শব্দ দুই শ্রেণীর—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা ধ্বনি এবং কণ্ঠতালু প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্র হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাই বর্ণ। শব্দ অনিত্য।

ধর্ম ও অধর্মকে পাপপুণ্যও বলা হয়। শাস্ত্রবিহিত কাজের ফল ধর্ম—শাস্ত্রনিষিদ্ধ অন্যায় কাজের ফল অধর্ম। ধর্ম সুখের হেতু, অধর্ম দুঃখের কারণ। ইহারা অনিত্য গুণ। এই গুণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। পূর্বজন্মের প্রারব্ধ পাপপুণ্যের ফল ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়মান কর্মের পাপপুণ্য তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। ধর্ম-অধর্ম জীবের ধর্ম।

কর্ম

যাহা দ্বারা সংযোগ বা বিভাগ সাধিত হয় তাহাই কর্ম। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও মনেই কর্ম সম্পাদিত হয়। আকাশ, দিক, কাল বা আত্মায় কোন কর্ম হয় না। কর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পাঁচ প্রকার কর্ম—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। উৎক্ষেপণে বস্তু ঊর্ধ্বদেশের সঙ্গে সংযোগ প্রাপ্ত হয় (যথা, বল উপরে ছুঁড়িয়া দেওয়া); অবক্ষেপণে বস্তু নিম্নদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয় (বারান্দা হইতে ভিখারীকে রাস্তায় পয়সা ছুঁড়িয়া দেওয়া); আকুঞ্চন দ্বারা অল্পস্থানের মধ্যে বস্তুর বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন হয় (হাত মুঠি করা); প্রসারণ ইহার বিপরীত—সঙ্কুচিত বস্তুর প্রসৃতির নাম প্রসারণ (হাত-পা ছড়াইয়া দেওয়া); অন্য সমস্ত প্রকার গতিকেই গমন বলা হয়।[১৭]

কর্ম সংযোগ ও বিভাগ সাধন করে

সামান্য

যে সব বস্তু একই দলের, তাহাদের সকলের মধ্যে যে সাধারণ গুণ, তাহাই সামান্য বা জাতি (অনেকানুগত)। এই সামান্য লক্ষণ থাকার জন্য এই বস্তুগুলিকে একই নাম দেওয়া হয়।

সামান্যের প্রকৃতি

১৭। বৈশেষিক সূত্র—১. ১. ১৭.

সামান্য (Universal) কি সে সম্বন্ধে যেমন ভারতীয় দর্শন তেমনি পাশ্চাত্য দর্শনে তিনটি বিভিন্ন মত আছে। বৌদ্ধমতে বস্তু হইতে পৃথক, সামান্যের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা নাম মাত্র (the nominalistic view)।

বৌদ্ধমতে ব্যক্তিরই নিজ বাস্তব অস্তিত্ব আছে—'সামান্য'-এর পৃথক অস্তিত্ব নাই। যাহাদের একই নামে ডাকা হয়, তাহাদের মধ্যে সাধারণ কিছু গুণ আছে, ইহা কল্পনা করা হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতেও, সামান্য কোন পৃথক বস্তু নয়। বিশেষ

বৌদ্ধমতে সামান্যের পৃথক অস্তিত্ব নাই

বিশেষ ব্যক্তির অতিরিক্ত তাহাদের সামান্য বা সাধারণ গুণের পৃথক কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তবে একনামে অভিহিত বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ গুণ সম্বন্ধে মনে আমরা ধারণা (concepts) করি। বস্তুগুলির সাধারণ গুণ বস্তু হইতে পৃথক হইয়া থাকে না। মন বস্তুগুলিকে পরস্পর তুলনা করিয়া তাহাদের সাধারণ গুণের ধারণা করে (the conceptualistic view)। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনমতে সামান্য-এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে—তাহা নিত্য। তাহাদের অস্তিত্ব (সত্তা) কিন্তু স্থানে ও কালে নয়। তাহারা 'বুদ্ধ্যপেক্ষ'।[১৮] সেই নিত্য সামান্যগুণ এক জাতীয় সমস্ত বস্তুর মধ্যে থাকে (অনেকানুগত) বলিয়াই তাহাদের একই নামে অভিহিত করা যায়।[১৯] আধুনিক বস্তুবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ (যথা রাসেল্) অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁহারাও বলেন, universals do not exist in time and space, but they subsist।[২০] দ্রব্যগুণ ও কর্ম সামান্যের আশ্রয়।

বৈশেষিক দর্শনে সামান্য স্বীকৃত

ব্যাপকতা অনুযায়ী সামান্য দুইপ্রকার—পরা ও অপরা। সত্তা পরা জাতি বা সামান্য, ইহা সর্ববস্তুতে উপস্থিত। ঘটত্ব, পটত্ব অপরা জাতি। কাহারও মতে, দ্রব্যত্ব পরা ও অপরার মধ্যবর্তী—তাই ইহা পরাপরা।

সামান্যের সঙ্গে বিশেষ বস্তুর সম্পর্ক কি? বৌদ্ধমতে সামান্য বিশেষের মধ্যেই

সামান্য ও বিশেষের সম্পর্ক

প্রকাশিত, সুতরাং তাহারা অভিন্ন। ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্ত বলিয়াছেন যে সামান্য সমস্ত বিশেষ ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সামান্য সর্বত্র প্রকাশিত নয়।

১৮। বৈশেষিক সূত্র ১।২।৩। প্রশস্তপাদের মতে সামান্যের দ্রব্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। প্রলয়ে সকল দ্রব্যের ধ্বংস হইলেও সামান্যের অস্তিত্ব থাকে।

১৯। তর্কভাষা—পৃঃ ২৮

২০। Russell—The Problems of Philosophy, Ch. IX। এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন দার্শনিক মতের আলোচনার জন্য S. C. Chatterjee-র The Problems of Philosophy, Ch. XI দ্রষ্টব্য।

সামান্য নিত্য, কিন্তু বিশেষ অনিত্য, সুতরাং তাহারা অভিন্ন নয়। যখন কোনও বিশেষের উদ্ভব হয়, তখন কোন বিশেষের সহিত তাহার সম্বন্ধেরও উদ্ভব হয়।[২১] প্রশস্তপাদের মতে সামান্যের সহিত বিশেষের সম্বন্ধ সমবায়-সম্বন্ধ। কিন্তু কুমারিল ও পার্থসারথি মিশ্রের মতে এই সম্বন্ধ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।[২২]

বিশেষ

যাহার জন্য একটি বস্তু অন্য একটি বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশেষ। এই বিশেষের ধারণাকে তাঁহার দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছেন বলিয়াই কণাদের দর্শন বৈশেষিকবাদ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বৈশেষিক মতে প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণু হইতে প্রভেদ, প্রত্যেক আত্মা অন্য আত্মা হইতে পৃথক, প্রত্যেক মন অন্য মন হইতে বিশেষ। এই জন্যই বস্তুতে বস্তুতে মৌলিক পার্থক্য।

বৈশেষিকবাদে বিশেষের বিশিষ্ট স্থান

যোগিগণ পরমাণুদিগের ভেদ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কণাদ-মতে সামান্যের মতো বিশেষও 'বুদ্ধ্যপেক্ষ', তবে ইহা বুদ্ধিদ্বারা সৃষ্ট নয়—বুদ্ধিদ্বারা আবিষ্কৃত। প্রশস্তবাদ বলেন, নিত্য দ্রব্যের মধ্যে 'বিশেষ' বিদ্যমান, সেই জন্য এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর ভেদ দৃষ্ট হয়। যে সকল দ্রব্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য, তাহারা যৌগিক—তাহারা বিভিন্ন অংশের সমবায়ে সৃষ্ট। এক এক দ্রব্যের অংশগুলি বিভিন্ন এবং এই অংশের সাহায্যেই এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে বিশেষ করিয়া জানা যায়। যে সমস্ত দ্রব্য মৌলিক ও অংশহীন এবং যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অনুমান দ্বারা জানি যে তাহাদের এমন গুণ আছে, যাহা দ্বারা এ প্রকার এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক করা যায়। দেশ, কাল, আত্মা, মন, পরমাণু এবং আকাশ ইহাদের প্রত্যেকের এমন বিশেষ গুণ আছে, যাহা সাধারণ নয়, যাহা নিতান্ত তাহাদেরই গুণ। অসংখ্য পরমাণু, আত্মা ও মন—সুতরাং বিশেষের সংখ্যাও অনন্ত।

বেদান্ত মতে 'বিশেষ' পৃথক পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত নয়। কুমারিল ও প্রভাকর বৈশেষিক মত গ্রহণ করেন নাই। নব্য ন্যায়েও বিশেষের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকৃত। তাঁহারা বলেন, নিরবয়ব দ্রব্য অপর দ্রব্য হইতে স্বভাবতঃই ভিন্ন (স্বতোব্যাবৃত্ত)। সুতরাং বিশেষরূপ পৃথক পদার্থ স্বীকারের কোন সার্থকতা নাই।

২১। Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. II, Pp. 112-13

২২। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১

সমবায়

আধার ও আধেয়ের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, 'ইহা উহার মধ্যে আছে' এই ধারণার ভিত্তি' যে নিবিড় সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়। অবয়ব ও অবয়বীর (organs and organism) সম্বন্ধ, দ্রব্যের সঙ্গে গুণ ও কর্মের সম্বন্ধ (substance and quality; substance and activity) এ প্রকার নিবিড় সম্বন্ধ (organic relation)। পরমাণুতে বিশেষ পদার্থের সম্বন্ধও সমবায়ী-সম্বন্ধ। বস্ত্রের সঙ্গে সূত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সমবায়-সম্বন্ধ। বস্ত্র অবয়বী, আর সূত্র হইল অবয়ব। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ সমবায়-সম্বন্ধ নয়। অর্থ শব্দের মধ্যে নাই। যে সব দ্রব্য পৃথক এবং 'এক অন্যের ভিতরে আছে' এমন সম্বন্ধ যাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার নাম সংযোগ (mechanical combination)। সম্বন্ধে বস্তুদ্বয় পরস্পর হইতে অসম্বন্ধভাবে পৃথক পৃথক থাকে (যুতসিদ্ধি—external)। কিন্তু সমবায়-সম্বন্ধ 'অযুতসিদ্ধ' বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ।

সমবায় হইল আধার ও আধেয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ

সমবায়-সম্বন্ধ নিত্য কিন্তু, সংযোগ সম্বন্ধ অনিত্য ও আপতিক (accidental)। যাহাদের মধ্যে সমবায়-সম্বন্ধ, তাহাদের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ (category)। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ সংখ্যায় বহু, তাহাদের সমবায়িত্ব ও বহুত্ব উভয় গুণই আছে। কিন্তু সমবায়ের বহুত্ব নাই—ইহা এক। সমবায় নিত্য হইলেও, বস্তু হইতে স্বতন্ত্রভাবে, ইহার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সমবায় 'বুদ্ধ্যপেক্ষ'—ইহা বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট না হইলেও, বুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে ইহার জ্ঞান হয় না।[২৩]

শংকরাচার্য সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। সমবায় যখন এক প্রকারের সম্বন্ধ, তখন যে বস্তুদ্বয়ের মধ্যে এ সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাদের বাহিরে ইহা অবস্থান করে। তাহা হইলে এই সমবায়ের সহিত ওই দুইটি বস্তুর সম্বন্ধের প্রয়োজন এবং সেই সম্বন্ধের জন্য দ্বিতীয় আর একটি সম্বন্ধের প্রয়োজন। এই প্রকারে সম্বন্ধের সম্বন্ধ, তাহার সম্বন্ধ, আবার তাহারও সম্বন্ধ, এইরূপ অনবস্থার (infinite regress) উদ্ভব হয়।[২৪] কারণ ও কার্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন, অথচ তাহাকে সমবায়-সম্বন্ধ না বলিয়া সংযোগ (external relation) বলেন। শংকর বেদান্ত সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। এ

সমবায়ও সংযোগ সম্বন্ধ

২৩। বৈশেষিক সূত্র ৭।২।২৬
২৪। **Bradley—Appearance and Reality, Ch. Relations.**

মত বলে, কারণ ও কার্য অভিন্ন। কারণের মধ্যেই কার্য ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। ন্যায়-বৈশেষিকগণ অসৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁহারা বলেন কারণ ও কার্য পৃথক। কার্য কারণের মধ্যেই থাকে না। ইহা নূতন সৃষ্টি।[২৫]

অভাব

যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা ভাবপদার্থ। কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাবপদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী বৈশেষিক দার্শনিকেরা অভাব রূপ আর একটি অসৎ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। বৈশেষিক মতে, ইহা নিতান্তই ভাবপদার্থের বিপরীত নেতিবাচক পদার্থ নহে। অভাবের বাস্তব সত্তা (ontological existence) না থাকিলেও, ভাষ্যকারগণ ইহাতে এক প্রকার সত্তা আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভাব-পদার্থের অতিরিক্তরূপে যে-পদার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাই অভাব।[২৬]

অভাব অসৎপদার্থ

অভাব চারিপ্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাব (প্রাক্+অভাব)—কোনও বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্বে তাহার যে অভাব, তাহা প্রাগভাব। ঘট সৃষ্টি হইবার পূর্বে ইহার অভাব ছিল। ইহা প্রাগভাব। প্রাগভাব ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু ইহার উৎপত্তি নাই। যে ঘট ছিল না, তাহার উৎপত্তি হইলেই, ঘটের প্রাগভাব ধ্বংস হয়। যে বস্তুর প্রাগভাব নাই, তাহা তো আছেই, তাহার আবার উৎপত্তি কি?

অভাব চারি প্রকার

ধ্বংসাভাব (ধ্বংস+অভাব)—যে বস্তু আছে, তাহা যখন ধ্বংস হয় বা বিনষ্ট হয় তখন যে অভাব, তাহা ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাবের উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নাই। ঘটটি ভাঙিলে তাহার অভাবের উৎপত্তি হইল। কিন্তু ধ্বংসের আবার ধ্বংস কি?

অত্যন্তাভাব—যে অভাব কোন এক কালে সীমাবদ্ধ নয়,—যে অভাব চিরকালের, তাহাই অত্যন্তাভাব। বায়ুতে রূপ নাই, তেজে রস নাই—ইহা কোন বিশেষ কালের নহে। সুতরাং ইহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই—ইহা অনাদি

২৫। Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol II, Pp. 218-19.

২৬। বৈশেষিক সূত্র ৯।১০

ও অনন্ত। ইহা 'আত্যন্তিক অভাব' (absolute negation)। প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাবকে **সংসর্গাভাব** বলা হয়।

(৪) **অন্যোন্যাভাব**—ঘট পট হইতে ভিন্ন, আম গোলাপ ফুল হইতে ভিন্ন, এই ভেদকেই অন্যোন্যাভাব বলা হয়। এখানে বলা হইবে যে, ঘটে পটের অন্যোন্যাভাব, আবার পটেও ঘটের অন্যোন্যাভাব।[২৭] সংসর্গাভাবে বিচারের রূপ হইল, বর্ণ বায়ুতে নাই ; আর অন্যোন্যাভাবে বিচার হইল, জল বায়ু নয়। অত্যন্তা-ভাবের মতো অন্যোন্যাভাবেরও উৎপত্তি ও বিনাশ নাই।

"অভাবকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। "ঘটাভাব" ঘটের ভাব হইতে ভিন্ন এবং "ঘটাভাবের অভাবের অভাব" "ঘটাভাবের অভাব" হইতে ভিন্ন। এইরূপে অনবস্থা (infinite regress) উপস্থিত হয়। কিন্তু "ঘটাভাবের অভাব", ঘটের "ভাব" হইতে ভিন্ন নহে। অনেক নৈয়ায়িক কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না।"[২৮]

পরমাণুবাদ

ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদ অত্যন্ত প্রাচীন। উপনিষদে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ জগতের চারিটি মূল উপাদান স্বীকৃত। কিন্তু ইহারা পরিণামী (compounds) ও বিভাজ্য (divisible)। এই উপাদান-গুলির প্রত্যেকটিরই ক্ষুদ্র, আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ কল্পনা করা যায়। কিন্তু সর্বশেষ এমন ক্ষুদ্রতম অংশে আসিয়া থামিতে হয়, যাহা অপরিণামী ও অবিভাজ্য। উপনিষদে এই ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা 'সৎ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই অবিভাজ্য, অপরিণামী, ক্ষুদ্রতম বস্তুকণাই পরমাণু নামে খ্যাত। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনেও পরমাণুর উল্লেখ আছে। বৈশেষিক দর্শন এই পরমাণুবাদ বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীস দেশে খ্রীঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে লিউসিপ্পাস ও ডিমো-ক্রিটাস্ এই পরমাণুবাদ প্রচার করেন। আধুনিক কালে ডাল্টন-এর (১৭৬৬-১৮৪৪) পর হইতে পরমাণুবাদ বৈজ্ঞানিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে।[২৯] পরমাণুবাদের মূল কথা হইল যে প্রত্যেক জড় বস্তু সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য বস্তুকণা- বা পরমাণু-সংযোগে গঠিত।

পরমাণুবাদের ব্যাখ্যা

২৭। বৈশেষিক সূত্র ১. ১. ৪ ; ৯. ১. ১—১০. কিরণাবলী—পৃঃ ৬

২৮। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬

২৯। Dalton is best known, for his statement of the Atomic Theory of Matter which postulates that the elements unite in definite proportions by weight, the proportions being determined by the "atomic number". Thus the atomic weight of oxygen being 16, oxygen always combines in units of 16 or multiples of 16.

পরমাণু হইতেছে কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম উপাদান, যাহাকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না। ইংরাজী atom (Gr. atomos=indivisible) কথারও একই অর্থ। জড়ের যে ক্ষুদ্রতম অংশ, তাহাদের যদি ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করা যাইত এবং বিভাগের যদি শেষ না থাকিত, তাহা হইলে যাবতীয় জড় বস্তুই অসীম সংখ্যক অংশ দ্বারা গঠিত হইত, এবং বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে যে "পরিমাণের পার্থক্য", তাহার ব্যাখ্যা অসম্ভব হইত।

দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকের সংযোগে জড়বস্তুর সৃষ্টি

দুই পরমাণু একত্র হইলে দ্ব্যণুক—তিন দ্ব্যণুক একত্র হইলে ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এমনি করিয়া বহু বহু পরমাণুর সংযোগে বিভিন্ন জড়বস্তু সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্রতম পরমাণু যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তেমনি অসংখ্য পরমাণু-গঠিত অসীম মহত্ত্বেরও আমরা ধারণা করিতে পারি না।

চারি প্রকারের বিভিন্ন পরমাণু স্বীকৃত—ক্ষিতির পরমাণু, জলের পরমাণু, তেজের পরমাণু ও বায়ুর পরমাণু। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্ষিতি-পরমাণু দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জল-পরমাণু দ্বারা রসনা, তেজ-পরমাণু দ্বারা চক্ষু এবং বায়ু-পরমাণু দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয় গঠিত। বর্তমানে রসায়নে ইহাদিগকে atoms না বলিয়া molecules বলা হইবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এক জাতীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত বলিয়া, এক এক জাতীয় গুণের জ্ঞানই তাহাদের প্রত্যেকের হয়। দ্রব্যের যে পাঁচটি সাধারণ গুণ আছে, পরমাণুদিগের সেই সকল গুণের অতিরিক্ত পরত্ব (priority) এবং অপরত্ব (posteriority) গুণও থাকে। প্রত্যেক পরমাণুর বিশেষ গুণ আছে। ক্ষিতির বিশিষ্ট গুণ গন্ধ; জলের বিশেষ গুণ রস; তেজের বিশেষ গুণ স্পর্শ, রূপ, তরলতা ও গতি; বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ ও গন্ধ। পরমাণুতে এই সকল গুণ নিত্য। কিন্তু তাহাদের দ্বারা গঠিত যে সব বস্তু, তাহাদের গুণ অনিত্য।

একাকী কোন পরমাণু কার্য করিতে পারে না। সৃষ্টির মধ্যে কোন পরমাণুই সম্পূর্ণ পৃথক ও অসংপৃক্ত অবস্থায় থাকে না। সংযুক্ত অবস্থায় তাহাদের এক প্রকার গতি থাকে। সেই গতিকে পরিস্পন্দ বলে। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই প্রথমতঃ দুইটি পরমাণুর সংযোগ ঘটে। পরমাণু ও দ্ব্যণুক সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে—ঈশ্বর এবং যোগীরা ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে বস্তু—সূর্যরশ্মিতে যে ধূলিকণা দৃষ্টিগোচর হয়—তাহাই ত্র্যণুক অথবা ত্রসরেণু। 'ত্রস' শব্দের অর্থ গতিশীল। বহু ত্রসরেণুর সংযোগে

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থূল বস্তুর সৃষ্টি হয়।[৩০] পরমাণু তো নিরবয়ব, তাহা হইলে দুই পরমাণুর সংযোগ কিরূপে হয়—শংকর এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।[৩১] তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রলয়কালে পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় অথচ সৃষ্টিকালে তাহারা সক্রিয়—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়?[৩২] আরো প্রশ্ন তুলিয়াছেন, পরমাণুর স্বভাব কি প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি, না উভয়ই?[৩৩] অথবা "অদৃষ্ট"ই তাহাদের স্বভাব? অদৃষ্টই যদি পরমাণুর সক্রিয়তার কারণ হয়, তাহা হইলে এই অদৃষ্ট কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে?[৩৪] বৈশেষিকগণ বলেন যে, পরমাণুগণ নিত্য, অথচ তাহাদের গন্ধ, রূপ, রস ইত্যাদি গুণ আছে। কিন্তু আমরা এই গুণসম্পন্ন যত বস্তু দেখি, তাহা সবই অনিত্য। সুতরাং পরমাণু নিত্য হইতে পারে না।[৩৫] বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন মতে, নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগে কোন বাধা নাই। মন ও আত্মাও তো পরমাণুর মতো নিরবয়ব, কিন্তু তাহাদের সংযোগ তো সকলেরই স্বীকৃত।

পরমাণু ও দ্ব্যণুক সাধারণের অগোচর

অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ

বৈশেষিক দর্শনমতে, নিত্য পরমাণুদের সংযোগ দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় অনিত্য জড় বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, কণাদ এ কথা মনে করেন যে, কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হয় এবং নূতন কিছু সৃষ্টি হয় বা আরম্ভ হয়—ইহাই অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, তাহা হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে চতুরণু এইভাবে ক্রমে সমগ্র স্থূল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্যবস্তুর অস্তিত্ব ছিল না—তাহা অসৎ ছিল।[৩৬] এই মতের বিপরীত হইল সৎকার্যবাদ। সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী—ন্যায়-বৈশেষিক অসৎকার্যবাদ স্বীকার করে। সৎকার্যবাদ বলে, কারণের মধ্যেই কার্যের অস্তিত্ব থাকে, তাহা না হইলে, কার্য কোথা হইতে আসিল? অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে না—সৎ হইতেই সৎ-এর উৎপত্তি হয়।

বৈশেষিকের অসৎ-কার্যবাদ সাংখ্য, যোগ, বেদান্তের সৎকার্য-বাদের বিপরীত

৩০। কেশব মিশ্র—তর্কভাষা (পুণা সং) পৃঃ ২১
৩১। ব্রহ্মসূত্র শংকর ভাষ্য—২।১।২৯
৩২। " " " ২।১।১২
৩৩। " " " ২।১।১৩
৩৪। " " " ২।১।১৪
৩৫। " " " ২।২।১৫
৩৬। ক্রিয়াগুণ ব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ—বৈশেষিক সূত্র ৯।১।১

কণাদ সৎকার্যের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণের মধ্যেই যদি কার্য থাকে, তবে তাহারা অভিন্ন। কারণ ও কার্য অভিন্ন হইলে, মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত করিতে কুম্ভকার ও কুলালচক্রের ক্রিয়া প্রয়োজন হয় কেন? কার্যের দ্বারা যাহা সম্পন্ন হয়, কারণের দ্বারা তাহা হয় না—মৃত্তিকা দ্বারা ঘটের কাজ সম্পন্ন হয় না। তাহারা ভিন্ন বলিয়াই, তাহাদের কাজও বিভিন্ন, নামও বিভিন্ন। কার্যের উৎপত্তির সঙ্গে কারণের বিনাশ হয়। বস্ত্রের উপাদান সূত্র। সূত্রই কিন্তু বস্ত্র নয়। সূত্র, তন্তুবায় ও তাহার যন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া বস্ত্র উৎপাদন করে। বস্ত্র পূর্বে ছিল না। সূত্ররূপ কারণ হইতে বস্ত্ররূপে নূতন কার্য উৎপন্ন হইল। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ মীমাংসকদের মতো কারণের মধ্যে কোন অলৌকিক অদৃশ্য শক্তি স্বীকার করেন না।

কারণ দ্বিবিধ

ন্যায়-বৈশেষিকগণ কারণকে নিমিত্ত-কারণ (efficient cause) ও উপাদান-কারণে (material cause) ভাগ করিয়াছেন। ঘটের পক্ষে কুম্ভকার ও কুলালচক্র নিমিত্ত-কারণ, তাহাদের সাহায্যে ঘট নির্মাণ হয়। আর মৃত্তিকা হইল উপাদান-কারণ, যে উপাদান দ্বারা ঘট নির্মিত হয়। আবার উপাদান-কারণ দুই প্রকার—সমবায়ী ও অসমবায়ী। সমবায়ী-কারণ সর্বদাই কোন দ্রব্য—যেমন পট বা বস্ত্রের সমবায়ী-কারণ হইল সূত্র। অসমবায়ী-কারণ হইল, সূত্রগুলির সংযোগ বা কোন গুণ, যেমন বস্ত্রের শ্বেতবর্ণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে বস্ত্রের শ্বেতবর্ণ, বস্ত্র নির্মাণ হইবার পর-মুহূর্তে সৃষ্টি হয়।[৩৭] ন্যায়-বৈশেষিকদের কারণের এই প্রকার বিভাগের সহিত অ্যারিস্টটল্-এর—material, formal and efficient causes-এর মিল আছে।

ন্যায়-বৈশেষিকের কারণের ধারণা

ন্যায়-বৈশেষিকদের কার্য-কারণবাদের সঙ্গে মিল্-এর (Mill) কারণের সংজ্ঞার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মিল বলিয়াছিলেন, The cause is the invariable, unconditional, immediate antecedent to the effect। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনেও কারণের নিয়ত পূর্ববৃত্তি (invariable antecedence) থাকা চাই। কিন্তু নিয়ত বা অব্যভিচারী (without exception) হইলেই তাহা কারণ বলিয়া গণ্য হইবে না। সেই নিয়তপূর্ববর্তিতা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য (unconditional) হওয়া চাই। কুম্ভকারের যষ্টি বা চক্রদ্বারা ঘট নির্মাণকালে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা ঘটের নিয়তপূর্ববর্তী হইলেও, ঘটের কারণ নহে। কারণের কারণও কারণ নহে। ইহা পূর্ববর্তিতা-নিরপেক্ষ (unconditional) যেমন হওয়া চাই, তেমনি অব্যবহিত

৩৭। Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy, P. 244

(immediate) হওয়াও প্রয়োজন। আবার যে সকল বস্তু নিয়তপূর্ববর্তী বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহাদের বর্জন করিলেও কার্যের উৎপাদনের বাধা হয় না, তাহাদিগকেও কারণ বলা যাইবে না।[৩৮]

বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব

বৈশেষিক দর্শনে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, যাহা হইতে **অভ্যুদয়** (পার্থিব বৈভব, ও পারলৌকিক বৈভব, অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখলাভ) এবং **মোক্ষলাভ**— যাহা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়ঃ অন্য কিছু নাই—তাহাই ধর্ম।[৩৯] অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ বলিয়া উল্লিখিত। তত্ত্বজ্ঞান কি? তাহা ব্যাখ্যাকালে বলা হইল যে, বেদে, ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান হইতে প্রসূত দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায় রূপ পদার্থসমূহের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভ হয়।[৪০] বৈশেষিক দর্শনে তত্ত্বজ্ঞানের উপর (metaphysics) বেশী জোর আর ন্যায় দর্শনে জোর হইল তত্ত্বজ্ঞান লাভের পদ্ধতির (logic and dialectic) উপর। দুইই জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) সম্পর্কে আগ্রহী।[৪১]

বৈশেষিক দর্শনে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাধান্য

বৈশেষিক দর্শনে চারিপ্রকারের জ্ঞান স্বীকৃত : **প্রত্যক্ষ, লৈঙ্গিক** (অনুমান) **স্মৃতি** এবং **আর্য**। দ্রব্যগুণ, ক্রিয়া ও সামান্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষ। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পরমাণু বা দ্ব্যণুকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। কোন একটি বস্তুর সহিত আর একটি বস্তু যেখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধযুক্ত, সংযোগী, বিয়োগী বা সমবায়ী হইলে, একটির জ্ঞান হইতে অন্যটির জ্ঞান অপ্রত্যক্ষভাবে লিঙ্গ-এর (চিহ্ন—যথা ধূম অগ্নির লিঙ্গ বা চিহ্ন) সাহায্যে হইয়া থাকে। আত্মা ও মনের বিশেষ সংযোগ হইতে স্মৃতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্মৃতিতে পূর্বে অনুভূত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র।

৩৮। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৮

৩৯। যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি স ধর্ম—বৈশেষিক সূত্র ১.১.২.

৪০। ধর্ম বিশেষ-প্রসূতাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্য বৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্। বৈশেষিক সূত্র ১.১.২.

৪১। The Vaiśeṣika views the world from the ontological standpoint while the Nyāya does so from the epistemological...the Nyāya does not concern itself with things as such, but rather with how they are known and demonstrated......the aim of Nyāya......is first to win the field of truth and then secure it with the fence of dialectics against the encroachment of error and sophistry. Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy, P. 245.

ঋষিদিগের এবং মুক্ত পুরুষদিগের যে অলৌকিক অব্যবহিত জ্ঞান হয়, তাহাকেই বলা হয় আর্যজ্ঞান। ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা এই জ্ঞানলাভ হয়। উপমান, ঐতিহ্য এবং শব্দজ্ঞান (meaning) অনুমানলব্ধ। শব্দ ও বাক্যের অর্থবোধ হইবার পূর্বে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান অনুমানলব্ধ। স্মৃতিকে বাদ দিলে বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানের দুইটি মাত্র উৎস (প্রমাণ) স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। যাহার ব্যভিচার লক্ষিত হয় না, যাহা অসন্দিগ্ধ এবং যাহা প্রসিদ্ধ (সকলের জ্ঞানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ), তাহাই জ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।[৪২]

জ্ঞানের প্রকারভেদ ও উৎস

মিথ্যাজ্ঞান চারি প্রকার—সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় এবং স্বপ্ন। শিবাদিত্যের মতে মিথ্যাজ্ঞান দ্বিবিধ—সংশয় ও ভ্রান্তি।

দেহের এক বিশেষ অবস্থাতেই স্বপ্নের উদ্ভব হয়, সেজন্য শ্রীধরের মতে স্বপ্নও একটি স্বতন্ত্র মিথ্যাজ্ঞান। অনধ্যবসায় হইল কোন বিষয়ে অনির্দিষ্ট জ্ঞান। উহ (সন্দেহযুক্ত প্রত্যক্ষণ) ও গৌণযুক্তি (indirect inference) সংশয়ের অন্তর্গত।[৪৩] বৈশেষিক সূত্রে তিনটি হেত্বাভাস (fallacy) স্বীকৃত, কিন্তু ন্যায় দর্শনে পাঁচটি হেত্বাভাস আলোচিত হইয়াছে। "বৈশেষিক দর্শন অপেক্ষা ন্যায় দর্শনের প্রমাণ-প্রকরণ সবিশেষ বিস্তৃত এবং প্রাঞ্জল। পরবর্তী বৈশেষিকাচার্যগণ ন্যায় দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তকেও তাঁহাদের অবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।"[৪৪]

মিথ্যাজ্ঞানও চতুর্বিধ

জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়

ন্যায়-বৈশেষিক-মতে জড়জগৎ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি জাতীয় পরমাণুদ্বারা গঠিত। সে হিসাবে এই দুই প্রস্থান (schools) বস্তুবাদী। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক চার্বাক দর্শনের মতো সম্পূর্ণ জড়বাদী নয়। পাশ্চাত্ত্য পরমাণুবাদ হইতে ভারতীয় পরমাণুবাদের কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। ন্যায়-বৈশেষিকগণ সমগ্র জগতকে জড় পরমাণুর সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা আকাশ, দিক্, কাল, মন ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে পরমাণুগুলির সংযোগ আপনা হইতেই ঘটে না, বাহ্য অন্ধ জড়শক্তির দ্বারাও ঘটে না। ঈশ্বররূপ আত্মিক

চতুর্বিধ পরমাণুর দ্বারা জগৎ সৃষ্ট

৪২। বৈশেষিক সূত্র ৯.২.১১-১২
শিবাদিত্য—সপ্তপদার্থী পৃঃ ৫৯ (Vizianagram Sanskrit Series, Benares Ed.)
৪৩ সুখময় ভট্টাচার্য—বৈশেষিক দর্শন, পৃঃ ৪১
৪৪। শ্রীধর ন্যায় কন্দলী (Chowkhamba. Benares Ed.), পৃঃ ৫০-৫৪

শক্তিই পরমাণুদের সংযোগ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি এবং অবশেষে জগতের বিলয়ও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাচীন বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের স্বীকৃতি খুব স্পষ্ট না হইলেও পরবর্তী বৈশেষিক ও ন্যায় দার্শনিকেরা জগদ্ব্যাপ্যার ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার প্রয়োজন মনে করিয়াছেন।[৪৫] বাস্তবিকপক্ষে ন্যায়-কুসুমাঞ্জলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য কিঞ্চিত আলোচনা আছে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এই জগৎসৃষ্টি আকস্মিকও নয়, অর্থহীনও নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মকৃতকর্মের ফল (অদৃষ্ট) অনুযায়ীই ঈশ্বর পরমাণুদের সংযোগ ও বিয়োগ সাধন করিয়া থাকেন। জগতের সর্বত্র শৃংখলা ও ধর্মের শাসন বিদ্যমান। জগৎ জীবের নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য সাধনক্ষেত্র। জড়জগৎ ও জীবাত্মা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর বিরোধী তো নয়ই। আকাশ, দিক্ ও কালের মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জড় ও জীব বিধৃত। এখানে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকের অদৃষ্ট সৃষ্টি হয়। সেই অদৃষ্ট অনুসারে জীবের দেহমন গঠন ও তাহার সুখদুঃখ বণ্টন ঈশ্বরই করিয়া থাকেন। এই সৃষ্টির পরে বিলয়, এই সৃষ্টিরই নিয়ম। সৃষ্টি যেমন আকস্মিক নয়, প্রলয়ও তেমনি আকস্মিক নহে। ইহারও পশ্চাতে আছে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তি। খণ্ডপ্রলয়ে জগতের আংশিক ধ্বংস আর মহাপ্রলয়ে সমগ্র বিশ্বই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৃত্তাকারে এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের কাজ চলিতেছে। এ জগৎ তাই সদা চলমান এবং নিত্যই পুনর্নবা।[৪৬]

ঈশ্বর এই পরমাণুদের সংযোগকর্তা

কৃতকর্মের ফল (অদৃষ্ট) অনুসারে ঈশ্বর এই সংযোগ ঘটান

নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ বা মুক্তি

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মতো বৈশেষিক মতেও সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইল নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভ। দুঃখ, শোক এবং পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবর্তনই জীবের বন্ধন। সাধনার উদ্দেশ্য সেই বন্ধনের আত্যন্তিক ক্ষয়। ন্যায়-বৈশেষিক জ্ঞানমার্গের পথিক। তাঁহারা বলেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে, মোক্ষ বা পরম শ্রেয়ঃ (Summum Bonum) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মীমাংসকদের কর্মকাণ্ডকে ইঁহারা নিষ্ফল বলেন নাই, কিন্তু বেদোক্ত কর্মসম্পাদনের শুভফল—স্বর্গলাভ ইত্যাদি—মোক্ষ নয়। কারণ উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে, "ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি"—শুভকর্মজনিত

তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষলাভের উপায়

৪৫। শ্রীধর ন্যায় কন্দলী (Chowkhamba, Benares Ed.) পৃঃ ৫০—৫১

৪৬। প্রশস্তপাদ—পদার্থধর্মসংগ্রহ

যে পুণ্যফল, তাহা ক্ষয় হইলে আবার এই মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়—আবার সেই সংসারচক্রে আবর্তিত হইতে হয়। সুতরাং কর্মমার্গে মুক্তি সন্ধান করা বৃথা। তবে ধর্ম-আচরণ দ্বারা পুণ্যলাভ যেমন হয়, তেমনই আত্মার মালিন্যও দূর হয়, দেহ ও মন শুচি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত অধিকার লাভ হয়। "ধর্ম বলিতে শুধু বেদবিহিত কর্তব্যকর্ম বুঝায় না। ধর্ম মানুষের এক গুণ অথবা শক্তিও বটে। ধর্ম অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং ফলভোগ সমাপ্ত হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাও ধর্মের বিনাশ হয়। ধর্মাধর্মের শেষ না হইলে [অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য দুই নিঃশেষিত না হইলে] মোক্ষ হয় না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই কেবল মোক্ষলাভ হইতে পারে।"[৪৭] বৈশেষিক মতে, মোক্ষ সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত অবস্থা। তাহা মূর্চ্ছার মতো অনুভূতিশূন্য অবস্থা—তাহাতে কোন আনন্দের অনুভূতি নাই।[৪৮]

বৈশেষিক দর্শনের মূল্যবিচার

বৈশেষিক দর্শন বস্তুবাদী (Realist) ও বহুসত্তাবাদী (Pluralist), কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ জড়বাদী নয়। বৈশেষিকগণ আত্মা ও ঈশ্বর (অন্ততঃ পরবর্তী বৈশেষিক দার্শনিকেরা) স্বীকার করেন। ইহার জগৎব্যাখ্যা উদ্দেশ্যমুখী (teleological)। ইহা সাধারণ বুদ্ধি (common sense) অনুসরণ করে এবং ন্যায় দর্শনের মতো ইহা তত সূক্ষ্ম ও কূটতর্ক-পরিপূর্ণ নয়। সন্তদাসজী বলেন যে, কণাদ তাঁহার দর্শন শিশুদিগের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অতি সূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করেন নাই। বৈশেষিকদের পদার্থের আলোচনা দার্শনিক দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক। এই প্রস্থানে ঈশ্বরের স্থান সংশয়াতীত নয়, এবং 'অদৃষ্ট' ও পরমাণুর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্কও খুব স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয় নাই। দার্শনিক দিক হইতে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ বা বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব অনেক বেশী গভীর। এই দর্শনে বুদ্ধির সম্পূর্ণ তৃপ্তি যেমন হয় না, তেমনি হৃদয়ের পিপাসাও মিটে না, কারণ এই দর্শনে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের প্রীতি, করুণা বা ভক্তির সম্বন্ধ স্থাপনের ইঙ্গিত নাই। পরমাণুবাদ ও গতিবাদ এই দর্শনের মূল্যবান অবদান।

বস্তুবাদী ও বহুসত্তাবাদী হইয়াও বৈশেষিক দর্শন জড়বাদী নহে

৪৭। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০

৪৮। এই জন্যই এক প্রাচীন শ্লোকে বৈশেষিক-সম্মত মুক্তিকে উপহাস করিয়া বলা হইয়াছে—

বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বম্ ব্রজাম্যহম্
ন তু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥

পরমাণু জড় বস্তুকণা মাত্র নয় ; তাহার অন্তরে স্পন্দনের গতি আছে, এই ইঙ্গিত আধুনিক পরমাণুবাদের সূচনা করিয়াছে, ইহা বলা যায়। বিশেষ ও অভাব সম্বন্ধে আলোচনাও এই দার্শনিক মতের অভিনব অবদান, ইহা স্বীকার করিতে হয় ; এবং সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধ আলোচনায় যে নিপুণতার পরিচয় এই দর্শনে আছে, তাহা আধুনিক দর্শনে এ বিষয়ে আলোচনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীনত্ব স্মরণ রাখিলে ইহা খুবই বিস্ময়কর মনে হয়। বৈশেষিক দর্শনে চিন্তার বিভিন্ন উপাদানগুলি একটি সুসংবদ্ধ ঐক্যে সুষ্ঠুভাবে বিধৃত হয় নাই।[৪৯]

বৈশেষিক প্রস্থানের বিশেষ অবদান

সংক্ষিপ্তসার

হিন্দুর ষড়দর্শনকে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য অনুযায়ী তিনটি প্রস্থানে বিভক্ত করা যায়—প্রথম, বৈশেষিক ও ন্যায় হইল ন্যায়প্রস্থান, দ্বিতীয়, সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ হইল সাংখ্যপ্রস্থান, তৃতীয়, মীমাংসা ও বেদান্ত হইল মীমাংসাপ্রস্থান। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য, মীমাংসা অথবা শংকর বেদান্তের পূর্বে রচিত হইয়াছে। এই বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' নাম এক পদার্থ (category) স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য দর্শনে ইহার পৃথক স্বীকৃতি নাই। এই বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্যও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের মতোই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটানো। বৈশেষিকমতে তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমেই ইহা সংঘটিত হইতে পারে।

বৈশেষিক দর্শন ছয়টি পদার্থ স্বীকার করে। তাহারা হইল দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। মতান্তরে এই পদার্থ সাতটি। অভাবকে স্বীকার করিলে, এই পদার্থের সংখ্যা হয় সাত। এই প্রস্থানে ঈশ্বর স্বীকৃত। তিনিই পরমাণুদের আদি সঞ্চালক।

দ্রব্য হইল গুণ ও ক্রিয়ার আধার। বৈশেষিকমতে দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি পঞ্চমহাভূত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের আধার হইল ক্ষিতি ; দ্রবত্ব হইল জলের স্বাভাবিক গুণ ; তেজ হইল উষ্ণতা প্রমুখ গুণের আশ্রয়। বায়ু হইল স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি প্রমুখ নয়টি গুণের আধার। শব্দগুণের আশ্রয় হইল আকাশ। বৈশেষিকমতে কাল হইল নিত্য ও অখণ্ড। দিকও নিত্য এবং প্রত্যক্ষের অগোচর। তান্ত্রিক শিরোমণি রঘুনাথ এই কাল ও দিক্‌কে পৃথক বলিয়া ভাবেন নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বরই দিক্ ও কালের আশ্রয়। আবার আত্মাকে

৪৯। The defect of the Vaiśeṣika is that it does not piece together its results into a single coherently articulated structure. A catalogue of items is not a systematic philosophy. The many-sided context of human life is ignored by the Vaiśeṣika and its physical philosophy and moral and religious values are not worked into a unified interpretation.
Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. II, Pp. 246-47.

বৈশেষিকগণ জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ মনে করিতেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা হইল আত্মার দ্বিবিধ রূপ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড় সম্পর্ক ও তাহাদের ভিন্নতা সম্পর্কেও বৈশেষিকগণ সচেতন। এই জীবাত্মারা পরস্পর হইতে পৃথক এবং সংখ্যায় ইহারা বহু। মন হইল অন্তরেন্দ্রিয়। অন্তরেন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়ের যোগ ঘটিলে তবেই জ্ঞান হয়। প্রত্যেক জীবেরই একটিমাত্র মন। মৃত্যুকালে দেহ হইতে মন উৎক্রান্ত হয়। কণাদের মতে গুণ দ্রব্যাশ্রয়ী; দ্রব্যের আশ্রয় ভিন্ন ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। গুণ দ্রব্য ও কর্ম হইতে পৃথক। নিত্য দ্রব্যের গুণ নিত্য; অনিত্য দ্রব্যের গুণও অনিত্য। বস্তুর যে গুণের জন্য তাহাদিগকে এক, দুই, তিন বলিয়া গণনা করি, তাহাই সংখ্যা। সংখ্যা ইত্যাদি গুণ আবার দ্রব্য-নির্ভর নহে। বস্তুর যে গুণের জন্য তাহাদিগকে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাহাদের পরিমাণ। অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য, কিন্তু আত্মা, মন, কাল, দিক্‌, আকাশ ও পরমাণুর পরিমাণ নিত্য। বৈশেষিকমতে মন মূর্ত দ্রব্য। সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ প্রমুখ আটটি গুণ মনের মধ্যে রহিয়াছে। সংযোগ হইল সেই গুণ যদ্দ্বারা ভিন্ন বস্তুরা একত্র যুক্ত হয়। যাহা সংযোগকে বিনষ্ট করে, তাহার নাম হইল বিভাগ।

বৈশেষিকমতে যদ্দ্বারা সংযোগ বা বিভাগ সাধিত হয়, তাহাই কর্ম। কর্ম পাঁচ প্রকার— উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের ধারণা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যে সব বস্তু একই দলের তাহাদের সকলের মধ্যে যে সাধারণ গুণ বিদ্যমান, তাহাই সামান্য বা জাতি। এই সামান্য লক্ষণ থাকার জন্যই এই বস্তুগুলিকে একই নাম দেওয়া হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই সামান্যের আশ্রয়। বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের মতোই বিশেষের স্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈশেষিকমতে, যাহার জন্য একটি বস্তু অন্য একটি বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশেষ। প্রশস্তপাদের মতে সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধ হইল সমবায়-সম্বন্ধ। সমবায়-সম্বন্ধ হইল আধার ও আধেয়ের মধ্যেকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। এই সমবায়-সম্বন্ধ হইতে সংযোগ-সম্বন্ধ পৃথক।

বৈশেষিকগণ মনে করেন যে অভাব একটি অসৎ পদার্থ। এই অভাব চারি প্রকার— প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। ইহা একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য করিবার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে।

ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদ অত্যন্ত সুপ্রাচীন। বৈশেষিক দর্শন এই পরমাণুবাদ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। জড়ের যে ক্ষুদ্রতম অংশ তাহাদের যদি ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যাইত এবং বিভাগের যদি শেষ না থাকিত, তাহা হইলে যাবতীয় জড় বস্তুই অসীম সংখ্যক অংশ দ্বারা গঠিত হইত এবং বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে যে পরিমাণের পার্থক্য থাকে, তাহার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। দুইটি পরমাণু একত্র হইলে তাহাকে দ্ব্যণুক এবং তিন দ্ব্যণুক একত্র হইলে তাহাকে ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু বলে। এমনি করিয়া বহু বহু পরমাণুর সংযোগে বিভিন্ন জড় বস্তুর সৃষ্টি। বৈশেষিক দর্শনে চারি প্রকারের বিভিন্ন পরমাণু স্বীকৃত—ক্ষিতির পরমাণু, জলের পরমাণু, তেজের পরমাণু ও বায়ুর পরমাণু। এই ক্ষিতি-পরমাণুর দ্বারা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জল-পরমাণুর দ্বারা রসনা, তেজ-পরমাণুর দ্বারা চক্ষু এবং বায়ু-পরমাণুর দ্বারা আমাদের

স্পর্শেন্দ্রিয় গঠিত। সৃষ্টির মধ্যে কোন পরমাণুই সম্পূর্ণ পৃথক ও অসংপৃক্ত অবস্থায় থাকে না। সংযুক্ত অবস্থায় তাহাদের এক প্রকার গতি থাকে। এই গতিকে বলা হয় পরিস্পন্দ।

বৈশেষিক দর্শন অসৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ নূতন কিছু সৃষ্টি হয় এবং আরম্ভ হয়। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, তাহা হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে চতুরণু এইভাবে সমগ্র স্থূলজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্যবস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। কার্য-কারণের মধ্যে অনুস্যূত নহে। এই কারণ দ্বিবিধ—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। উপাদান-কারণের আবার দুইটি প্রকারভেদ—সমবায়ী ও অসমবায়ী।

বৈশেষিক দর্শনে চারি প্রকার জ্ঞান স্বীকৃত। ইহারা হইল প্রত্যক্ষ, অনুমান, স্মৃতি এবং আর্য। বৈশেষিকগণের মতে মিথ্যা জ্ঞানও চারি প্রকারের—সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন। বৈশেষিকমতে তিনটি হেত্বাভাস (Fallacy) স্বীকৃত; ন্যায় দর্শনে অবশ্য হেত্বাভাসের সংখ্যা হইল পাঁচ। পরবর্তী বৈশেষিকাচার্যগণ ন্যায় দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তকে তাঁহাদের অবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে জড়জগৎ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি জাতীয় পরমাণুর দ্বারা গঠিত। সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থানকে বস্তুবাদী বা Realist বলা চলে। কিন্তু তাঁহাদিগকে জড়বাদী বলা চলে না। তাঁহারা আকাশ, দিক্‌, কাল, মন ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর পরমাণুদের সংযোগ ঘটান। প্রত্যেক ব্যক্তির অদৃষ্ট বা কৃতকার্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভগবান পরমাণুদের সংযোগ বা বিয়োগ ঘটান। সৃষ্টি বা প্রলয় কিছুই আকস্মিক নহে। ইহাদের পশ্চাতে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি বর্তমান।

বৈশেষিকমতে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য হইল, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। বন্ধনের আত্যন্তিক ক্ষয় করিয়া মোক্ষ লাভই হইল সকল তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য: ন্যায়-বৈশেষিকগণ জ্ঞান-মার্গের পথিক। এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ধর্মেরও অবসান হয়। ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যের শেষ না হইলে মোক্ষলাভ হয় না। বৈশেষিকমতে এই মোক্ষ হইল, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের অতীত অবস্থা। ইহা মূর্ছার মতো অনুভূতিশূন্য অবস্থা—ইহাতে কোন আনন্দের অনুভূতি নাই।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বৈশেষিক দর্শন বস্তুবাদী (Realist) ও বহুসত্তাবাদী (Pluralist) হইয়াও সম্পূর্ণ জড়বাদী নহে। বৈশেষিকগণ আত্মা ও ঈশ্বর স্বীকার করেন ও ইঁহাদের জগৎ ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যমুখী বা teleological; অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে এই প্রস্থানে ঈশ্বরের স্থান সংশয়াতীত নহে এবং 'অদৃষ্ট' ও পরমাণুর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্কটুকুও খুব স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয় নাই। ইহাদের পদার্থনিচয়ের আলোচনাও দার্শনিক দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক। পরমাণুবাদ ও গতিবাদ এই প্রস্থানের মূল্যবান অবদান বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু 'সামান্য' ও 'বিশেষের' নিগূঢ় সম্পর্কটির সুনিপুণ ব্যাখ্যা আধুনিক দর্শনালোচনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বৈশেষিকদের 'অভাব' সম্পর্কিত আলোচনাও প্রণিধানযোগ্য।

প্রশ্নমালা

1. State and explain the different categories in the Vaiśeṣika system.
2. Is Vaiśeṣika system materialistic in character? Discuss fully.
3. How do you relate Adṛṣṭa and God as the conjoiner of atoms? Give reasons for your answer.
4. Is God existent? Discuss from the Vaiśeṣika standpoint.
5. Explain and critically examine the Asatkāryavāda of the Vaiśeṣikas.
6 Write short notes on:
   (a) Sāmānya
   (b) Viśeṣa
   (c) Samavāya
   (d) Saṁyoga
   (e) Karma
   (f) Mokṣa

সপ্তম অধ্যায়

ন্যায় দর্শন

বৈশেষিক দর্শনের মতো অত প্রাচীন না হইলেও ন্যায় দর্শনও যথেষ্ট প্রাচীন। বৈশেষিক ও ন্যায় দুই সমানতন্ত্র। ন্যায় দর্শন বৈশেষিকের অনেক তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তই পূর্বেই স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। জেকবি-র (Jacobi) মতে, এই দুই প্রস্থান অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন ছিল না। এই দুই প্রস্থানের একীকরণ বহু পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং যখন ন্যায়-বার্তিক লিখিত হয়, তখন এই দুই দার্শনিক মত মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।[১] গার্বে (Garbe) বৈশেষিককে ন্যায় দর্শন হইতে প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বৈশেষিক রূপ মূল শাখা হইতেই পরবর্তীকালে ন্যায় দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। এই দুই প্রস্থানই মানুষের সাধারণ বুদ্ধিকে দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। দুই দর্শনই বহু বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বহু আত্মার অস্তিত্বও দুই দর্শনেই স্বীকৃত। দুই দর্শনই বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদ, সংশয়বাদ (scepticism) ও বিজ্ঞানবাদের (subjectivism) বিরোধী। দুই দর্শনই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। দুই মতই প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে সত্য আবিষ্কারের প্রধান পথ হিসাবে গ্রহণ করে।[২] কিন্তু এই দুই মতের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়। বৈশেষিক অণু-পরমাণুর সাহায্যে জগতের উৎপত্তি- ও গঠন-ব্যাখ্যায় আগ্রহশীল। বৈশেষিকের দৃষ্টি হইল বহির্জগত সম্বন্ধে, আর ন্যায় দর্শনের উদ্দেশ্য হইল, যে-যে উপায় দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে সমস্ত পদ্ধতির স্বরূপ নির্দেশ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ। সুতরাং বলা যাইতে পারে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্মুখী।[৩] বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরস্বীকৃতি স্পষ্ট নয়,—

ন্যায় ও বৈশেষিক সমানতন্ত্র

১। E. R. E., Vol. II, P. 201 b.

২। Many of the Nyāya sutras presuppose the tenets of the Vaiśeṣika. They are called samānatantra or allied systems, since they both believe in a plurality of souls, a personal God, an atomic universe and use many arguments in common. Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. II, P. 31

৩। The Nyāya and the Vaiśeṣika take up respectively the world within and the world without...while the Nyāya gives us an account of processes and methods of a reasoned knowledge of objects, the Vaiśeṣika develops the atomic constitution of things, which the Nyāya accepts without much argument. ...they are interested mainly in averting the sceptical consequences of the Buddhist phenomenalism, which merge external reality in the ideas of the mind. Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. II, P. 30

তাহা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ন্যায় দর্শন স্পষ্টতঃই সেশ্বর। বেদকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিলেও ন্যায় ও বৈশেষিক স্বাধীন যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা অন্যান্য বিরুদ্ধমত বিশ্লেষণের সাহায্যে এবং তর্কবিচার ও বিতর্ক দ্বারা খণ্ডন করিয়া, নিজমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ন্যায় ও বৈশেষিকের পার্থক্য

সমস্ত দার্শনিক সমস্যার যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনাই ন্যায় দর্শনের বিশেষত্ব। বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকরের মতে, ন্যায় দর্শনে যদি আত্মার স্বরূপ ও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধেই আলোচনা থাকিত, তবে উপনিষদের সহিত ইহার কোন পার্থক্যই থাকিত না। বাচস্পতি মিশ্রও বলেন যে, জ্ঞানের বিষয়সমূহকে যুক্তি ও বিচারের প্রণালী দ্বারা বিশ্লেষণই ন্যায় দর্শনের উদ্দেশ্য।[৪] যাহা বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ন্যায় মত—বুদ্ধ্যা যদুৎপন্নম্ তৎ সর্বম্ ন্যায়মতম্। সমস্ত ভারতীয় দর্শনই ন্যায়-প্রদর্শিত বিচার-প্রণালীকেই দার্শনিক আলোচনার আদর্শ পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের অন্য নাম বাদবিদ্যা ও তর্কবিদ্যা (বাদ অর্থাৎ আলোচনা।) তর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন করতঃ পরমত খণ্ডন করিয়া, নিজ মত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি অতি সুপ্রাচীন। উপনিষদেও ইহার উল্লেখ আছে। প্রাচীন গ্রীস্ দেশেও এই জাতীয় আলোচনা পদ্ধতিকে dialectic বলা হইত। সোক্রাতেস্ নিজের মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে, প্রতিপক্ষকে নিজ মত ব্যক্ত করিতে আহ্বান করিতেন এবং সুকৌশল প্রশ্নের দ্বারা বিরোধী পক্ষের স্ববিরোধ স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া তাহার মতের খণ্ডন করিতেন—ইহার নাম negative dialectic। আর নিজমতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন হইল positive dialectic। এই সকল আলোচনার ফলে, যুক্তিবিচারের নিয়ম এবং বিপক্ষকে তর্কে পর্যুদস্ত করিবার নানা কৌশল (কখনও কখনো তাহা নিতান্ত দুষ্ট কৌশল) উদ্ভাবিত হইয়াছিল।[৫] ন্যায় দর্শনে এই বিচার-পদ্ধতি ও তর্ককৌশলের অতি বিস্তৃত (কখনও কখনও অতি শুষ্ক ও নীরস) আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশেষিক পদার্থগুলি তাঁহারা এক 'প্রমেয়'র মধ্যেই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রমাণ এবং তৎসম্পর্কিত অন্য সমস্ত আলোচনাই ন্যায় দর্শনে প্রায় সম্পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ন্যায় দর্শনের আলোচ্য ষোলটি বিষয়ের উল্লেখ হইতেই এই কথা খুব স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। ন্যায় দর্শনের ষোড়শ পদার্থ হইতেছে: প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়,

ন্যায় দর্শনের বিশেষত্ব যুক্তি, বিচার প্রণালী দ্বারা জ্ঞানের বস্তুর বিশ্লেষণ

প্রমাণ বিষয়ে আলোচনাই ন্যায় দর্শনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ

৪। প্রমাণৈর অর্থপরীক্ষণম্—ন্যায়বার্তিক তাৎপর্যটীকা ১. ১. ১.

৫। তারকচন্দ্র রায়, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১

প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। বৈশেষিক ও ন্যায় এই দুই দর্শনের পদার্থবর্ণনা তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈশেষিক দর্শনে প্রমেয়-নিরূপণই মুখ্য উদ্দেশ্য, আর ন্যায় দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রমাণ-নিরূপণ।[৬]

ন্যায় দর্শনের উদ্দেশ্য

সমস্ত ভারতীয় দর্শনের মতো ন্যায় শাস্ত্রেরও উদ্দেশ্য, দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ও মুক্তিপথের সন্ধান। ন্যায় দর্শনের প্রথম সূত্র হইতেছে "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয় প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাং নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"—অর্থাৎ প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি ও নিগ্রহস্থান এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ হয়। দ্বিতীয় সূত্রেই নিঃশ্রেয়স কি তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে—দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান নাশ হইলে অপবর্গ বা মুক্তিলাভ হয়, তাহাই নিঃশ্রেয়স। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎরূপে মুক্তির কারণ। আর প্রমাণাদি অন্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান গৌণভাবে মুক্তির সহায়ক।

দুঃখের আত্যন্তিক অবসানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য

বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদে দুঃখের যে দ্বাদশ নিদান (অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভাব, জাতি ও জরামরণ) বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত ন্যায় দর্শনে দুঃখের নিদান বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ দর্শনের অবিদ্যাই ন্যায় দর্শনে মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানের কারণ হইল, দোষ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ—ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের তৃষ্ণা। বুদ্ধের ভাবচক্রের সহিত ন্যায় দর্শনের নিদানচক্রের সাদৃশ্য আছে। ন্যায় দর্শনে বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদে খণ্ডন করা হইয়াছে। এ সব নানা কারণে, অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, ন্যায় দর্শন বৌদ্ধদর্শন অপেক্ষা নবীনতর।

ন্যায় দর্শনের প্রণেতা

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-সূত্রের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গোতম ঋষি ন্যায়-সূত্রকারের পূর্বপুরুষ ছিলেন বলিয়াই তিনি গৌতম নামে খ্যাত। ভাষ্যকার

৬। সুখময় ভট্টাচার্য—ন্যায়দর্শন, পৃ ৪

বাৎস্যায়ন, বার্তিককার উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র এবং শংকরাচার্য ন্যায়-সূত্রকারকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় গৌতমেরই আর এক নাম অক্ষপাদ। আবার কেহ কেহ বলেন, ভাসের সমকালীন নৈয়ায়িক পণ্ডিত মেধাতিথিই ন্যায়-সূত্রের রচয়িতার প্রকৃত নাম। ন্যায়-সূত্র সম্ভবতঃ খ্রীঃ-পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।[৭] গৌতম সূত্রের রচনাকাল ঠিক যাহাই হউক না কেন, ন্যায় দর্শন যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ন্যায় যে একটি বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহাও উল্লিখিত আছে। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে ন্যায়ের তর্কপদ্ধতির উল্লেখ নাই। কিন্তু পরবর্তীকালের বৌদ্ধশাস্ত্র—ব্রহ্মজাল সূত্র, কথাবস্তু, মিলিন্দপন্‌হ, ললিতবিস্তর ও জৈন আগমশাস্ত্রে ন্যায় শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।[৮]

ন্যায়-সূত্রের প্রণেতা

ইহার রচনাকাল

ন্যায় দর্শনের আলোচ্য বিষয়

পূর্বেই ন্যায় দর্শনের ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। ন্যায় দর্শনের আলোচনাকে চারটি বিভাগে পৃথক করা যায়: (১) জ্ঞানতত্ত্ব (Logic and dialectic); (২) বাহ্য জগৎতত্ত্ব (metaphysics); (৩) আত্মতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব (theory of the soul and its liberation; (৪) ঈশ্বরতত্ত্ব (theory of God)।[৯]

ষোড়শ পদার্থ

প্রমাণ—যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের যথার্থজ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণ। ন্যায় দর্শনে চারিটি প্রমাণ স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। সমস্ত জ্ঞানের প্রধান উপায় হইল—প্রত্যক্ষ। অন্য তিনটি প্রমাণই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। ন্যায় দর্শনে প্রমাণের গুরুত্বই সমধিক, সুতরাং এ বিষয়ে পৃথক আলোচনা করা হইবে।

(১) প্রমাণ

প্রমেয়—সত্যজ্ঞানের যে বস্তু বা বিষয়, তাহাই প্রমেয়। প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় পদার্থের জ্ঞানলাভ হয়। ন্যায় দর্শনে প্রমেয় **দ্বাদশটি**—যথা, আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।

(২) প্রমেয়

আত্মা—আত্মা বলিতে ন্যায়ে জীবাত্মা বুঝায়। আত্মা নিত্য, অজর ও অমর। শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক জীবই আপন জীবাত্মাকে 'আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানি,

(ক) আত্মা

৭। Das Gupta—History of Indian Philosophy, Vol. I, Pp. 301-5.

৮। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২

৯। Chatterjee & Dutta—An Introduction to Indian Philosophy, P. 166.

আমি করি', এই সব অনুভবের মধ্য দিয়া মানস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অপরের আত্মা অনুমান সাপেক্ষ। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হইলেও, আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক।

(খ) শরীর

শরীর—আত্মার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যাহার সুখদুঃখ ইত্যাদি ভোগ হয়, তাহা শরীর। জীবের ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াদি এবং তাহার সুখদুঃখের অধিষ্ঠান হইল, তাহার দেহ। এই শরীর পঞ্চভূতের সমবায়ে সৃষ্ট, কিন্তু তাহাতে ক্ষিতির অংশই প্রধান।

(গ) ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়—যাহার মধ্য দিয়া জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্ভব হয়, তাহারা ইন্দ্রিয়। ইহারা জীবের করণ। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র—এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়, মন অন্তরেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের গঠন ও উপাদান সম্পর্কে বৈশেষিক ও ন্যায় মতে কোন প্রভেদ নাই। ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি,—তাহারা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। ইন্দ্রিয় বলিয়া যেগুলিকে মনে করি, সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থল মাত্র। যোগিগণই যোগ-প্রভাবে ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

(ঘ) অর্থ

অর্থ—ইন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে, তাহা হইল অর্থ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় বা অর্থ হইতেছে গন্ধ, রসনার অর্থ রস, ইত্যাদি।

(ঙ) বুদ্ধি

বুদ্ধি—জীবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নামই বুদ্ধি। ইহার আর এক নাম উপলব্ধি। বুদ্ধি দুইপ্রকার: অনুভূতি ও স্মৃতি। ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান হয়, তাহা অনুভূতি (sensation)। অনুভূত বস্তু পুনরায় জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহা স্মৃতি (memory)।

(চ) মন

মন—যে অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা সুখদুঃখের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই মন। বাহ্যেন্দ্রিয় জড় উপাদানে গঠিত—কিন্তু ভৌতিক (material) পদার্থ নয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান নিজ নিজ বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ—ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ ভিন্ন অন্য জ্ঞান দিতে পারে না, তেমনি অন্যান্য বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু মনের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নহে। কোন ইন্দ্রিয় মনকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। অনুমানের সাহায্যে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইলেই জ্ঞান হয় না। কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত মনও সংযুক্ত হইলে, তবেই সেই ইন্দ্রিয়-বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। মন আণবিক, কাজেই একই কালে বহু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহা যুক্ত হয় না। মন গতিশীল, চঞ্চল, ইহা সর্বব্যাপী নয়। স্ফটিক যেমন যখন যে

বস্তুর নিকটে থাকে, তখন সেই বর্ণের বলিয়া প্রতিভাত হয়, মনও সেইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ নানা আকার প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, প্রত্যেক জীবের একটি করিয়াই মন।

(ছ) প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তি—শরীর, বাক্য ও মনের যে উদ্যম বা প্রযত্ন তাহাই প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি তিন প্রকার : শারীরিক, মানসিক ও বাচিক। প্রবৃত্তি শুভ ও অশুভ দুইই হইতে পারে। শুভ প্রবৃত্তির ফল পুণ্য, অশুভ প্রবৃত্তির ফল পাপ।

(জ) দোষ

দোষ—রাগ, দ্বেষ ও মোহ, যাহা হইতে কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই দোষ। বাংলা ভাষায় 'রাগ' শব্দ আমরা ক্রোধ এই অর্থে ব্যবহার করি, কিন্তু সংস্কৃতে 'রাগ' হইল, অনুরাগ বা আসক্তি। বিষয়াসক্তি, মোহ ও মিথ্যাজ্ঞান একই বস্তু। কাম, মাৎসর্য, স্পৃহা, লোভ প্রভৃতি রাগেরই বিভিন্ন রূপ। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া দ্বেষের অন্তর্ভুক্ত ; অহংকার, সংশয়, বিমূঢ়তা মোহের প্রকার-ভেদ। আত্মাই রাগ, দ্বেষ ও মোহের আশ্রয়।

(ঝ) প্রেত্যভাব

প্রেত্যভাব—ইহার অর্থ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম। জীবাত্মা নিত্য, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই, কিন্তু কোন বিশেষ দেহের সহিত সম্পর্কচ্ছেদকেই মৃত্যু বলা হয় এবং পুনরায় নূতন দেহের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধকে প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্ম বলা হয়। জীবের এই জন্ম-মরণ-পুনর্জন্ম অনাদি কাল ধরিয়া চলে। মুক্তিলাভ করিলে, তবেই এই সংসার-চক্রের ছেদন হয়।

(ঞ) ফল

ফল—প্রত্যেক কর্মেরই শুভ বা অশুভ ফল আছে। প্রত্যেক কর্মের শেষ ফল সুখ অথবা দুঃখ। এই সুখদুঃখের অনুভবকেও ফল বলে। সমস্ত সকাম কর্মই ফলের বন্ধন সৃষ্টি করে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে, নিষ্কাম কর্মে জীব প্রবৃত্ত হয়। নিষ্কাম কর্ম জীবকে আবদ্ধ করে না।

(ট) দুঃখ

দুঃখ—দুঃখ মানুষের জীবনের চিরসঙ্গী। সমস্ত কর্মেরই ফল দুঃখ। যাহাকে সাংসারিক বুদ্ধিতে সুখ বলা হয়, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে দুঃখ—কারণ তাহাও বন্ধন। মুমুক্ষু (মোক্ষকামী) ব্যক্তি সংসারের সমস্ত বস্তুকেই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। ইহা করিলেই সংসারাসক্তি শিথিল হয়।

অপবর্গ বা মুক্তিই জীবনের সমস্ত সাধনা ও জ্ঞানের শেষ উদ্দেশ্য। প্রমেয়বর্গের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইলে, তবেই জীবের অপবর্গলাভ হয়।

নৈয়ায়িকগণ এ কথা বলেন না যে, সন্ন্যাস বা সর্বকর্মত্যাগের দ্বারাই কেবলমাত্র অপবর্গলাভ হইতে পারে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী সমস্ত আশ্রমের পক্ষেই মুক্তিলাভ সম্ভবপর। কেবল প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞানলাভ। ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, আত্মা এবং জগতের অন্য সমস্ত বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ হয়, মিথ্যা মোহ ও আসক্তি দূর হয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়। ন্যায়ের চর্চাদ্বারা মনন সম্পন্ন হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি মননের সহায়তায় শ্রুতিলব্ধ জ্ঞানকে সুদৃঢ় করেন।

(ঠ) অপবর্গ

মুক্তপুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগ ছিন্ন হয়। এই কারণে মনঃসংযোগও থাকে না এবং চেতনা-প্রবাহও স্তব্ধ হয়। মিথ্যাজ্ঞান লুপ্ত হইলে সুখদুঃখ, ধর্ম-অধর্ম বা অদৃষ্টেরও প্রভাব লুপ্ত হয়। গোতম সূত্রে অপবর্গ দুঃখের আত্যন্তিক অবসান, ইহাই বলা হইয়াছে। সুখের অনুভূতির কোন উল্লেখ নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, মুক্তিতে কোন সুখের অনুভূতিও থাকে না। এই আপত্তি হইতে পারে যে, অপবর্গে সমস্ত চেতনাই যদি লুপ্ত হয় তবে তাহা তো মূর্ছাবস্থার মতো এবং তাহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কাম্য হইতে পারে না। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, অপবর্গ দুঃখের লেশহীন পরম শান্ত অবস্থা। এই দুঃখজর্জর পৃথিবীর অসংখ্য বন্ধন ও আঘাত হইতেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিস্তারের পথ খোঁজেন। দুঃখের পীড়নে যাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, অচেতন অবস্থাও তাহার পক্ষে কাম্য। ভাষ্যকার উদয়ন ও জয়ন্তভট্ট মুক্তিতে জীবাত্মার পাষাণের মতো জড়ত্ব ঘটে, এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এবং সেইজন্য কবি শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতে চার্বাকের মুখে মহর্ষি গোতমকে গো-তম (শ্রেষ্ঠ গোরু) বলিয়া কঠোর বিদ্রূপ করিয়াছেন।[১০] কিন্তু কোন কোন আচার্য, বৈশেষিক মতে মুক্তি ও ন্যায় দর্শনের মুক্তির মধ্যে প্রভেদ করিয়াছেন। শ্রীমাধবাচার্য এবং শ্রীশংকরাচার্য দুজনেই শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। তাঁহাদের মতে, বৈশেষিক মতে মুক্তি পাষাণের মতো

(ড) অপবর্গ বা মুক্তির স্বরূপ

১০। মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ।

যিনি শিলার ন্যায় অচেতন মুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদনের জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনি তোমাদের নিকট গোতম নামে খ্যাত, তাঁহাকে গো-তম বলিয়াও জানিও।

শ্রীহর্ষ—নৈষধচরিতম্, ১৭, ৭৫

সুখদুঃখের অতীত অচেতন অবস্থা; কিন্তু ন্যায় মতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অপবর্গ **নিত্যসুখ অনুভবের হেতু**, আর মিথ্যাজ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধক।[১১]

যদিও ন্যায়সূত্রে দ্বাদশপ্রমেয় উল্লিখিত হইয়াছে বাৎসায়নের মতে প্রমেয়ের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অধিক। তবে সুখদুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের জন্য এই দ্বাদশপ্রমেয় সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান অত্যাবশ্যক।[১২]

(৩) সংশয়

সংশয়—জ্ঞান সম্পর্কে মনের অনিশ্চিত দোলায়িত অবস্থাই সংশয়। ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা নয়, ভ্রমও নয়। দূর আকাশে অস্পষ্ট কালোর বিস্তার দেখিয়া একবার মনে হইল, একখণ্ড মেঘ, আবার মনে হইল, হয়তো এক ঝাঁক পাখী। মনের এই অনিশ্চিত অবস্থাই সংশয়।

(৪) প্রয়োজন

প্রয়োজন—যাহা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা যাহা বিদূরণের উদ্দেশ্যে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রয়োজন।

(৫) দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্ত—সাধারণ নিয়মের অসংশয় উদাহরণই দৃষ্টান্ত। ধূম ও বহ্নির অব্যভিচারী সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়, যেমন স্থালী (পাকশালা)। সেখানে আমরা ধূম ও বহ্নিকে সর্বদাই একত্র দেখিতে পাই। "সন্দিগ্ধ বিচার্যবিষয়ে, আত্মপক্ষ সমর্থন ও পরপক্ষ খণ্ডনে দৃষ্টান্তই প্রধান সহায়ক। সুতরাং দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বস্তুকে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেই বুঝিতে পারেন।"[১৩]

(৬) সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত—উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত, তাহাই সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক শাস্ত্রই কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং সেগুলি বিশ্বাস করে। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার: সর্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণতন্ত্র ও অভ্যুপগম। যে সিদ্ধান্ত কোন এক শাস্ত্র গ্রহণ করে, এবং যাহা অন্য সকল শাস্ত্রের অবিরোধী, তাহা সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত কোন শাস্ত্রে গৃহীত, কিন্তু অন্য শাস্ত্রে প্রত্যাখ্যাত, তাহা প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিষয়ও স্থির হয়, তাহা অধিকরণ সিদ্ধান্ত। বিপক্ষের উক্তি সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা বিচার না করিয়াই, কোন বিষয়ে তাহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত।

১১। বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ইত্যাদি সূত্রে মুক্তপুরুষের সুখানুভূতি উপনিষৎ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সুখময় ভট্টাচার্য—ন্যায়দর্শন, পৃঃ ৪০

১২। ন্যায়সূত্র ও ভাষ্য ১, ১, ৯

১৩। সুখময় ভট্টাচার্য—ন্যায়দর্শন, পৃঃ ৪৫।

"তোমার কথা আমি স্বীকার করিতেছি না, তথাপি তর্কের খাতিরে ইহা ধরিয়া নিলাম", এই ভাবে প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তকে আপাতগ্রহণ করিলে, তাহা হইবে অভ্যুপগাম সিদ্ধান্ত।

(৭) অবয়ব

অবয়ব—ন্যায় দর্শনমতে বিচারে পাঁচটি বাক্য (propositions) থাকে। ইহাদের ন্যায়ের (syllogism) পাঁচটি অবয়ব বলা হয়। অতি প্রাচীন ন্যায়ে দশটি অবয়ব স্বীকার করা হইত।

(৮) তর্ক

তর্ক—সংশয়-নিরসনকারণ যে যুক্তি আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি, তাহাই তর্ক। কেহ কেহ বলেন, ইহা একপ্রকারের সাপেক্ষ যুক্তি (hypothetical argument), যাহা দ্বারা বিরুদ্ধ মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। তর্ক যদিও নিজে প্রমাণ নহে, তথাপি প্রমাণের সত্যতানির্ণয়ে সহায়ক। ইহা এক প্রকারের উহ (supposition)। নব্য-ন্যায়ে তর্ক পাঁচ প্রকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও অনিষ্টপ্রসঙ্গ।

নির্ণয়—উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত, নিশ্চিত জ্ঞান হইল নির্ণয়। বিচারে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়া, নিজ পক্ষ স্থাপন পূর্বক বিচার্য বিষয়ে স্থির বা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করার নাম নির্ণয়। সাধারণতঃ কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলেই নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সংশয় না থাকিলেও নির্ণয় হইতে পারে।[১৪] কিভাবে শাস্ত্রীয় বিষয়ে তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্যই গোতমসূত্রে কয়েকটি পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখ এবার করা যাইতেছে।

(১০, ১১, ১২) বাদ, জল্প, বিতণ্ডা

বাদ, জল্প, বিতণ্ডা—কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলে সে বিষয়ে তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, অথবা প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ প্রয়োগকে 'কথা' বলা হয়। কথা তিন প্রকার—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। **বাদে** দুই পক্ষেরই উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়। বাদে প্রতিপক্ষকে হেয় করিবার বা জব্দ করিবার উদ্দেশ্য থাকে না। বাদ বিচার প্রণালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "বাদঃ প্রবদতামহম্।"[১৫] **জল্পের** উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা, সত্য নির্ণয় ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অসাধু উপায়েও পরপক্ষখণ্ডন এবং নিজমত স্থাপন জল্পের উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই। **বিতণ্ডায়** কেবল

১৪। সুখময় ভট্টাচার্য—ন্যায়দর্শন, পৃঃ ৫০
১৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১০ম অধ্যায়, ৩২

প্রতিপক্ষের মত খণ্ডনের চেষ্টা—সেখানে নিজ মত স্থাপনের কোন চেষ্টা নাই। সুতরাং ইহা নিতান্তই নেতিবাচক (mere destructive criticism)।

হেত্বাভাস—তর্কের বেলায় হেতু (middle term) দোষমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাহাকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত হেতু না হইলে, তখন সিদ্ধান্ত দূষিত হইবে। ইহাই হেত্বাভাস (fallacy of the syllogism)। গৌতম সূত্রানুসারে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার—ব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও কালাতীত। 'পর্বতে অগ্নি আছে, কেননা পর্বত জ্ঞানের বিষয়। তাহা হইলে পুষ্করিণীতেও অগ্নি আছে যেহেতু ইহাও জ্ঞানের বিষয়'। ইহা সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাসের উদাহরণ।[১৬]

(১৩) হেত্বাভাস

ছল—প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে, তাহার বাক্যের কদর্থ করার নাম ছল। ছল তিন প্রকার—বাক্‌ছল, সামান্যছল ও উপচারছল। একজন বলিলেন, 'বালকটি নবকম্বল (অর্থাৎ সে নূতন কম্বল গায়ে দিয়াছে)', আর একজন বলিলেন, 'না বালকটি নবকম্বল নয় (অর্থাৎ তাহার নয়টি কম্বল নাই)' ইহা বাক্‌ছলের (fallacy of ambiguity) উদাহরণ।

(১৪) ছল

জাতি—সত্য যুক্তি ব্যাপ্তিসম্বন্ধ-নির্ভর (dependent on universal unconditional relation)। কিন্তু যে যুক্তি ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া, শুধু সাধর্ম্য (similarity) বা বৈধর্ম্যের উপর (dissimilarity) দোষ উদ্‌ঘাটন করে, তাহার নাম জাতি। জাতি চব্বিশ প্রকার। কেহ বলিলেন, দুধ বকের মতো সাদা। তখন প্রতিপক্ষ বলিলেন, তবে তো দুধ বকের মতো মাছ ধরিয়া খায়। ইহা সাধর্ম্যসমা জাতির উদাহরণ।

(১৫) জাতি

নিগ্রহস্থান—নিগ্রহ অর্থ পরাজয়। নিগ্রহস্থান অর্থাৎ যেখানে পরাজয় নিশ্চিত প্রমাণিত। যে সকল বাক্যে কোন পক্ষের বিচার্য বিষয়ের বিপরীত জ্ঞান অথবা বিচার্য বিষয়ে অপ্রতিপত্তি বা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তাহার নাম নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ প্রভৃতি বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থান। প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া, যদি কেহ নিজ পক্ষ পরিত্যাগ করেন, তবে তাহা দ্বারা তাঁহার পরাজয় বা নিগ্রহ সূচিত হইল।

(১৬) নিগ্রহস্থান

ন্যায় দর্শন বিশ্বাস করে যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই, কেবলমাত্র দুঃখের মূলোচ্ছেদ এবং সংসারচক্র হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে

১৬। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮

হইলে, উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং ন্যায় দর্শনে যুক্তিপ্রমাণের পদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানকেও অপবর্গলাভের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা যায়। সেইজন্যই ন্যায় দর্শনে প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। বৈশেষিকের মতো ন্যায়ও সাধারণবুদ্ধি-নির্ভর। সুতরাং ন্যায় দর্শন এই জগৎ ও বহু জীবের অস্তিত্ব এবং জড়বস্তুর গঠনে পরমাণুবাদ স্বীকার করে। এই জগৎ আমাদের ভাব বা বিজ্ঞান (subjective ideas) মাত্র, অথবা সমস্তই ক্ষণিক—এই প্রকার বৌদ্ধমতের ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ ইহা চার্বাকের মতো সম্পূর্ণ জড়বাদী নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ন্যায় দর্শনের বিশেষত্ব হইতেছে, প্রমা (right knowledge) ও প্রমাণ বিষয়ে (methods of establishing right knowledge) আলোচনার উপর জোর। এই জন্যই ন্যায় দর্শনকে যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তববাদ (logical realism) বলা হইয়াছে।[১৭]

প্রমা

সত্যজ্ঞান স্বপ্রকাশ। বুদ্ধি বা জ্ঞানের সাহায্যে অভিজ্ঞতার বিষয় মনের মধ্যে সম্যক প্রকাশিত হয়। **প্রমা** হইল যথার্থ জ্ঞান, আর যাহা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়, তাহা **প্রমেয়**। যিনি জ্ঞান লাভ করেন তিনি **প্রমাতা** এবং যে উপায়ে সত্য জ্ঞান লাভ হয়, তাহা **প্রমাণ**। প্রথম ন্যায়-সূত্রেই **প্রমার প্রয়োজন বলা হইয়াছে, নিঃশ্রেয়সাধিগম। প্রমাণের সাহায্যে প্রমা বা সত্যজ্ঞান লাভ হয়। ন্যায়মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ।**

প্রমা যথার্থ জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয়-প্রমেয়, জ্ঞানলাভের উপায়-প্রমাণ, আর যিনি জ্ঞানলাভ করেন তিনি প্রমাতা

ন্যায় দর্শনে সত্যজ্ঞানের স্বরূপ—বৌদ্ধ মাধ্যমিক মতে, বস্তুর স্বরূপ অজ্ঞাত। আমাদের চিন্তার মধ্যে বহু বিরুদ্ধতা বিদ্যমান, কাজেই কোন চিন্তাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সত্যকে জানা যায় না। কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সবই শূন্য। নৈয়ায়িক বাৎস্যায়ন এই মত খণ্ডনকল্পে বলেন যে, মাধ্যমিকগণ যখন বলেন, কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, তখন এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন যে, এই বিষয়ে অন্ততঃ, নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভবপর। সুতরাং, আমাদের কোন চিন্তাই সত্য নয়, ইহা সত্য নয়। কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, ইহাও সত্য নয়। সুতরাং ইহার বিপরীতই

ন্যায়মতে সত্যজ্ঞান সম্ভব

১৭। Chatterjee & Dutta—Introduction to Indian Philosophy, P. 172

সত্য যে, প্রমাণ-লব্ধ বস্তুর অস্তিত্ব আছে এবং প্রমাণ দ্বারা সত্যলাভ হয়। ইহা অস্বীকার করিলে, তাহাও প্রমাণের সাহায্যেই করিতে হয়। চিন্তা ও বিষয় পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। মাধ্যমিক বৌদ্ধরা বস্তুর অস্তিত্ব নাই এ কথা যখন বলেন, তাহা বস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াই বলেন। কিন্তু বাৎস্যায়ন বলেন, বস্তুর বিশ্লেষণ যদি সম্ভবপর হয়, তবে বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না, ইহা সত্য হইতে পারে না। আবার বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানাই যায় না, ইহা সত্য হইলে, বস্তুর বিশ্লেষণও সম্ভব হয় না। সুতরাং মাধ্যমিক মত স্ববিরোধী। ন্যায় দর্শনমতে, সত্যজ্ঞান সম্ভব ইহা স্বীকৃত এবং ইহাও স্বীকৃত যে জ্ঞান যখন সম্ভব, তখন জ্ঞানের যাহা বিষয়—বাহ্য বস্তু—তাহারও অস্তিত্ব আছে। ন্যায়মতে, বস্তুর যথাযথ চিন্তাই জ্ঞান (correspondence theory of knowledge)। বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান-নির্ভর, বিজ্ঞানবাদীদের (subjective idealists) এ কথা ন্যায় দর্শন গ্রহণ করে না। যাহার যাহা স্বরূপ বা সত্তা তাহাকে সে ভাবে চিন্তা করাই হইল সত্যজ্ঞান। বাৎস্যায়ন সেজন্য বলিলেন, বস্তুর যাহা স্বরূপ নয়, সেইভাবে তাহার অনুভব হইল মিথ্যা জ্ঞান বা **অপ্রমা**। শুক্তিকে রজত বলিয়া চিন্তা করিলে, তাহা ভ্রম—তাহা অপ্রমা।

বস্তুর যথাযথ চিন্তাই জ্ঞান

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ—জ্ঞান ও জ্ঞানের বস্তুর যে সম্বন্ধ, তাহা অসাধারণ। অন্য সকল প্রকার সম্বন্ধ হইতে ইহা পৃথক (sui generis)। কোন বস্তুর জ্ঞানের একমাত্র নিয়ামক কারণ সেই বস্তুর স্বরূপ। সুতরাং এই সম্বন্ধকে 'স্বরূপ সম্বন্ধ'ও বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধ সংযোগের নয়, সমবায়েরও নয়। জ্ঞানক্রিয়া (the process of knowledge) অথবা বাহ্য বস্তু (the external object) তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের বিষয় নহে। সেই বস্তুর যাহা 'স্বরূপ', তাহাই জ্ঞানের বিষয়। বাহ্য বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইলে, ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিত না। স্বপ্নে আমরা বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করি, কিন্তু পরে আমাদের বিশ্বাস বস্তুর রূপের সঙ্গে মিলাইয়া ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। জ্ঞানের বিষয় অনুভব (experience) ভ্রমাত্মক হইতে পারে। অনুভব সত্য কিনা, তাহা বস্তুর স্বরূপের সঙ্গে মিলাইয়া প্রমাণ করিয়া দেখিতে হয়। জ্ঞানের সত্যতা স্বপ্রকাশ (self-revealing) নয়, তাহা প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮] প্রয়োগবাদীদের মতো ন্যায় দর্শনও বিশ্বাস করে যে, কোন বিষয় সত্য কিনা, তাহার প্রমাণ হইল, সেই জ্ঞান হইতে

জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ অসাধারণ

১৮। প্রমা তদ্বতি তৎপ্রকারক—অপ্রমা তদভাববতিতৎপ্রকারক

উদ্ভূত কর্মের সাফল্য। আগুনকে গরম বলিয়া চিন্তা করি। এই চিন্তা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, কারণ 'আগুন গরম', ইহা বিশ্বাস করিয়া, উনুনে আগুনের উপর ভাতের হাঁড়ি চাপাইলে, চাল সিদ্ধ হয়। ইহাকে বলা হইয়াছে জ্ঞানের "প্রবৃত্তি সামর্থ্য"। বৌদ্ধ ও জৈন মতেও অর্থ-সিদ্ধি অথবা অর্থ-ক্রিয়া-সামর্থ্য সত্যের মাপকাঠি বলিয়া স্বীকৃত। কর্ম উৎপাদনের সামর্থ্য দ্বারা জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত হয়।[১৯] সত্যজ্ঞানের লক্ষণ হইল তাহা যথার্থ, অসন্দিগ্ধ ও ফলপ্রসূ।[২০]

কর্ম-উৎপাদনে সামর্থ্য দ্বারা জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত হয়

বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়ন কয়েকপ্রকার জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। ভ্রম- ও অসংগতি-মুক্ত অনুমান এবং মৌলিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর উপমানলব্ধ জ্ঞান স্বতঃ-প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ- ও শব্দ-নির্ভর জ্ঞান স্বতঃ-প্রমাণ নয়—তাহারা বস্তুর স্বরূপের সহিত সঙ্গতি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।[২১]

অপ্রমা বা মিথ্যাজ্ঞান—সত্যজ্ঞান বা প্রমার বিপরীত হইল **অপ্রমা**। বস্তুর যাহা স্বরূপ নহে, সে সম্বন্ধে সে রূপ চিন্তা করাই অপ্রমা। রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি অপ্রমা। অপ্রমা পাঁচ প্রকার—স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম, বিপর্যয় ও তর্ক। ভ্রম বা বিপর্যয় শব্দগুলি জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে, বস্তু সম্বন্ধে নয়। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম করিলাম—তখন আমার জ্ঞান ভ্রমাত্মক। কিন্তু তাহা দ্বারা সর্পের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না।[২২] নৈয়ায়িকগণ প্রমার মতো অপ্রমারও অস্তিত্ব আছে ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু ভ্রমের ক্ষেত্রে যাহা অনুভূত হয়, চিন্তার বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই—তাই নিতান্তই বিজ্ঞানমাত্র। বাৎস্যায়ন বলেন, সত্যজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা অনুভূতি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব বারিত হয় না।[২৩] যে বস্তু যাহা, তাহার অন্যরূপে তাহার অনুভবকে বলে **অন্যথাখ্যাতি**। ভ্রম সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনের মতকে বলে অন্যথাখ্যাতিবাদ। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধরাও বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যখন ভ্রম হয়, তখন বাহ্য বস্তুর উপর এমন কোন রূপ আরোপ করা হয়, যে রূপ বাস্তবিক পক্ষে তাহার নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পের রূপ আরোপিত হইয়াছে বলিয়াই তাহা ভ্রম। ভ্রম জ্ঞানাকার। যোগাচার মতে বাহ্য

অপ্রমা বা মিথ্যাজ্ঞানের লক্ষণ—অন্যথাখ্যাতিবাদ

১৯। অবিসম্বাদকং জ্ঞানং...প্রদর্শিতার্থং প্রাপয়ৎ সম্বাদকমুচ্যতে—এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য Chatterjee—Nyaya Theory of Knowledge, Ch. II & V দেখ।

২০। Jivananda Vidyasagar—Tarkasangraha, Pp. 32-35

২১। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬

২২। ন্যায় বার্তিক—১. ১. ৪

২৩। ন্যায়ভাষ্য—৪. ২. ৩৫

বস্তুর অস্তিত্ব নাই। তথাপি অনাদি অবিদ্যার কারণে, কার্যক্ষেত্রে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এরূপ বাহ্য বস্তুর উপর জ্ঞানের আকার আরোপিত হয়। তাহা হইলেই ভ্রম জন্মে। ইহা যে ভ্রম, তাহা অল্পক্ষণ পরেই মনোযোগ দিলেই বুঝিতে পারি। রজ্জু সর্প নয়, এবং এই জ্ঞান সফল পরিণামে আমাদের নিয়া যায় না—এই

জ্ঞানাকারখ্যাতি

জ্ঞানের অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব নাই। এই মতকে **জ্ঞানাকার-খ্যাতি** বলা হয়।[২৪] যোগাচার মতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। নৈয়ায়িকগণ এ মত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন, যোগাচার মত সত্য হইলে, শুক্তিতে যখন রজতভ্রম হয়, তখন ইহা রজত বলিয়া জ্ঞান হইত না, আমি রজত—এই প্রকার জ্ঞান হইত। যোগাচার মতে সত্য-জ্ঞান (প্রমা) ও মিথ্যাজ্ঞানের (অপ্রমা) প্রভেদ ব্যাখ্যা করা যায় না। সবই যদি মনের ভাব (বিজ্ঞান) মাত্র হইত, তবে মধুতে মিষ্টত্ব এবং বিষে তিক্ততার প্রভেদ কেনই বা করা হয়? মাধ্যমিকদের ভ্রম বিষয়ে মতকে **অসৎখ্যাতিবাদ** বলা হয়।

অসৎখ্যাতি

তাঁহাদের মতে সবই অসৎ, কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। বাহ্য ও আন্তর সমস্ত অনুভবই (perception) ভ্রান্ত। আমাদের জ্ঞানযন্ত্র এমনিভাবে গঠিত যে, যে রজত বাস্তবিক পক্ষে নাই, তাহাও আছে বলিয়া, আমাদের অনুভব হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন, সবই যদি অসৎ হয়, তবে ভ্রমের কোন ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। ভ্রমের যদি কোন বাস্তব কারণ না-ই থাকে, তবে এক ভ্রম হইতে অন্য ভ্রম পৃথক করিবার কোন উপায় থাকিত না। যাহা অসৎ, তাহা ভ্রমরূপ কার্যও উৎপন্ন করিতে পারে না।[২৫]

অদ্বৈত বেদান্তমতে যাহা অনুভূত হয়, তাহাই জ্ঞানের বিষয়। যখন শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন রজত আমাদের চেতনায় উপস্থিত হয় এবং তাহারই জ্ঞান আমাদের হয়। তাহা না হইলে, ইহা যে রজতরূপ ভ্রম, অন্য কোন বিষয়ে ভ্রম নয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু শুক্তিতে যে রজতের অনুভব হইতেছে, অথবা রজ্জুতে যে সর্পের অনুভূতি হইতেছে, সেই রজত বা সর্প সৎও নহে অসৎও নহে, আবার সৎ ও অসৎ দুইই, ইহাও নহে। সুতরাং বলা যায়, আমাদের অনুভবের যাহা বিষয়, তাহা অনির্বচনীয়—সদসদ বিলক্ষণ। যদি রজত বা রজ্জু সৎ হইত, তবে তো আমাদের অনুভূতি সত্য হইত। আর যদি সর্প অসৎই হইত, তবে তো ভয় পাইতাম না। আর যদি সৎ ও অসৎ দুইই হইত,

---

২৪। অনাদ্যবিদ্যারাসনারোপিতমলীকম্ বাহ্যম, তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ—ভামতী ১.১.১

২৫। প্রমেয় কমলমার্তণ্ড, পৃঃ ১৩

তবে বলিতে হইত যে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ একই বস্তুতে, একই কালে বিদ্যমান। সেইজন্যই বলা হইয়াছে, এই যে দৃশ্যমান জগৎ আমাদের অনুভবের বিষয়, তাহাকে সৎ এবং অসৎ দুইই বলিতে পারি। ইহা অবিদ্যাপ্রসূত, সুতরাং ইহা মায়া। ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। কিন্তু ইহা বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুসুমের মতো সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অসৎও নয়। ইহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, এক ব্রহ্মই সত্য। পারমার্থিক সত্তা কেবল মাত্র ব্রহ্মেরই আছে।

অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ

এই বাহ্য জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। এই মতকে **অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ** বলা হয়। এই মত ন্যায় দর্শনের অন্যথাখ্যাতিবাদের বিপরীত। কারণ ন্যায়মতে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃত। অদ্বৈতমতে যখন শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন রজত সেই কালে ও সেই স্থানে, বাস্তবিক পক্ষে অনুভবে উপস্থিত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্রম থাকে, ততক্ষণ রজতও উপস্থিত থাকে। নৈয়ায়িক এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, বাস্তব রজত উপস্থিত না থাকিলেও, যদি অনুভবের বিষয় হিসাবে রজত উপস্থিত থাকিতে পারে, তবে প্রত্যক্ষ ও কল্পনার মধ্যে প্রভেদ থাকে না। রামানুজাচার্যও অদ্বৈত বেদান্তমতের বিরুদ্ধ মত গ্রহণ করিয়া জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, 'অনির্বচনীয়' রজতের অনুভূতির তো নিশ্চয়ই কিছু কারণ থাকিতে হইবে। রজতের অনুভব রজতের অস্তিত্বের কারণ নয়। বরঞ্চ ইহার বিপরীতই সত্য। রজত আছে বলিয়াই রজত প্রত্যক্ষ হয়।

ভ্রম সম্বন্ধে আর একটি মত হইতেছে প্রভাকরের **বিবেকাখ্যাতিবাদ** অথবা

বিবেকাখ্যাতিবাদ

অখ্যাতিবাদ। প্রভাকরের মতে, যখন শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন শুক্তির প্রত্যক্ষ ও রজতের স্মৃতির পার্থক্য বোধ হয় না। তাহাই ভ্রমের কারণ। সেইজন্যই শুক্তিকে রজত বলি। কিন্তু পরে যখন শুক্তিকে শুক্তি বলিয়াই বুঝিতে পারি, তখন পূর্বজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তখন প্রত্যক্ষের বিষয় যে শুক্তি, তাহার সহিত স্মৃতিতে রজতের যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারি। নৈয়ায়িকগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, ভ্রম যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ রজতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় (আমরা রজতই দেখি); রজতের স্মৃতি এখানে মনে ক্রিয়া করে, তাহা নয়। স্মৃতি সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইতে অস্পষ্ট, কিন্তু যখন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম করি, তাহা প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট। সুতরাং অন্যথাখ্যাতিবাদ অনুযায়ী, এ কথাই বলা উচিত যে, আমাদের বর্তমান প্রত্যক্ষই ভ্রান্তিদুষ্ট। যাহার স্বরূপ যাহা নয়, তাহাকে সেইরূপই দেখিতেছি।

অদ্বৈত বেদান্তবাদী স্বভাবতই ন্যায়ের অন্যথাখ্যাতিবাদকে খণ্ডনের জন্য নানা যুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে রজত এইস্থানে ও এইকালে অবস্থিত নাই, তাহা কি করিয়া বর্তমানে (শুক্তিপ্রত্যক্ষ কালে) অনুভূতির বিষয় হইতে পারে? রজতের স্মৃতি মনে উদিত হয় বলিয়া, রজত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তাহা হইলে, ধূম দেখিয়া অগ্নির বিষয় যখন অনুমান করি, তখন অগ্নির স্মৃতিই আমাদের মনে উদিত হয়, ইহা বলিতে পারি এবং তাহা হইলে অনুমানের কোনও প্রয়োজন থাকে না। বর্তমানে প্রত্যক্ষের বিষয় তো শুক্তি। তবে কেন রজত প্রত্যক্ষ হয়? যদি বলা হয় যে ক্ষণকালের জন্য শুক্তি রজতে পরিণত হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে, অন্য লোকও কেন রজত প্রত্যক্ষ করে না? ক্ষণকালের জন্যও যদি শুক্তি রজতে পরিণত হয়, তবে সে মুহূর্তের জন্য নিশ্চয়ই রজত প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের কোন দোষের জন্য এই মিথ্যাজ্ঞান হইয়াছে, ইহাও বলা চলে না। কারণ জ্ঞাতার অন্য বিষয় প্রত্যক্ষে কোন ভ্রম হয় না।[২৬]

স্মৃতি প্রমা নয়—কারণ স্মৃতির যে বস্তু, তাহা বর্তমানে জ্ঞাতার সম্মুখে উপস্থিত নাই। তাহা মন পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে সঞ্চয় করিয়াছে এবং পুনরায় সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে।

সংশয় তো সত্যজ্ঞান বা প্রমা বলিয়া নিজেই দাবি করে না। ভ্রম সেই মুহূর্তে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, ইহা যথার্থানুভব নয় বলিয়া, পরমুহূর্তেই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তর্কও প্রমা নয় কারণ তাহা সাপেক্ষ (hypothetical)। যাহা সত্যজ্ঞান, তাহার সত্যতা অন্য কোন বিষয়ে সত্যতার উপর নির্ভর করে না (its truth does not depend on the truth of any previous supposition.)।

বিভিন্ন প্রমাণ

প্রত্যক্ষ—পূর্বেই বলা হইয়াছে ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি-প্রকারের প্রমাণ। চার্বাকপন্থীগণ উপমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য ও বৈশেষিকগণ উপমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিলেও, তাহার যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা ন্যায়মত হইতে ভিন্ন।

যে নিশ্চিত অসংশয় জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে ঘটে, যাহা পূর্বে অবগত সত্যজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না, তাহাকেই গৌতম সূত্রে প্রত্যক্ষ

২৬। বেদান্ত পরিভাষা—প্রথম অধ্যায়।

বলা হইয়াছে।[২৭] চক্ষু, ঘ্রাণ, রসনা, শ্রোত্র ও ত্বক বহিরিন্দ্রিয় আর মন অন্তরেন্দ্রিয়—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়। চক্ষু, নাসিকা এগুলি ইন্দ্রিয় নয়—ইহারা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় মাত্র। ইহাদের যে অদৃশ্য শক্তি, তাহাই ইন্দ্রিয়। বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ-জনিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, কিন্তু ইন্দ্রিয়ে কোন দোষ থাকিলে, প্রত্যক্ষও দুষ্ট হইবে। কামলা রোগ হইলে শ্বেতশঙ্খকে পীত দেখায়—এখানে প্রত্যক্ষ দোষযুক্ত, ইহা সত্যজ্ঞান নহে। অব্যভিচারী হইলে তবেই ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংস্পর্শ-জনিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মরুভূমিতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, কারণ সেই স্থানে গেলে দেখা যায় যে জল নাই। যে জ্ঞান সংশয়াতীত নয়, তাহাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সর্প-জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ আছে, কিন্তু সে জ্ঞান অসংশয় নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগও থাকিতে হইবে।[২৮] গঙ্গেশ অবশ্য এই আপত্তি তুলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ ব্যতিরেকেও ঈশ্বর এই জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রত্যক্ষ করেন।

প্রত্যক্ষ হইল ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ-জনিত অসংশয় জ্ঞান

প্রত্যক্ষের বিভিন্ন বিভাগ—প্রথমতঃ প্রত্যক্ষকে লৌকিক এবং অলৌকিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ অব্যবহিত। অলৌকিক প্রত্যক্ষে এই সংস্পর্শ অস্বাভাবিক ভাবে ঘটিয়া থাকে। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দুই প্রকার--বাহ্য ও আন্তর। বাহ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে চাক্ষুষ, শ্রৌত্র, স্পার্শন, রাসন, ও ঘ্রাণজ এবং আন্তর প্রত্যক্ষ হইতেছে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন সুখদুঃখাদি মানস অনুভূতির তাৎক্ষণিক জ্ঞান।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ এই তিন প্রকার। যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া সেই শ্রেণীভুক্ত অন্য সমস্ত বস্তুর সাধারণ গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে (conception) তাহাই **সামান্যলক্ষণ**। সমস্ত গোরুতেই গোত্ব, সমস্ত মানুষেই মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ করা হয়। ইহা স্বীকার না করিলে কোন মানুষ মানুষ বলিয়া চিনিতে পারি কি রূপে? গোরুর

অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিনপ্রকার : সামান্য-লক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ

২৭। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ -- গৌতমসূত্র ১।১।৪

২৮। ন্যায় সূত্র ১, ১, ৪,

'গোত্ব' তো ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের অব্যবহিত সংযোগদ্বারা জানা যায় না। কাজেই ইহা লৌকিক প্রত্যক্ষ নয়, অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

জ্ঞানলক্ষণ—চন্দনকাষ্ঠ দৃষ্টিগোচর হইলে, তাহার রূপের সহিত তাহার সুগন্ধেরও প্রত্যক্ষ হয়। সুগন্ধ তো ঘ্রাণের বিষয়। কিন্তু পূর্বে যখন চন্দন কাষ্ঠ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধও ঘ্রাণের দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাই এখন চক্ষুদ্বারাই যেন চন্দনকাষ্ঠের সুগন্ধ প্রত্যক্ষ হয়। ইহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ, কারণ এখানে ঘ্রাণের সহিত সংস্পর্শ ব্যতিরেকেই সুগন্ধের প্রত্যক্ষ হইতেছে। অনুরূপ ভাবে লৌহখণ্ড দেখিলে তাহার রূপের সঙ্গে তাহার কাঠিন্যও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই জাতীয় অলৌকিক প্রত্যক্ষকে জ্ঞানলক্ষণ বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্ স্টাউট ও ওয়ার্ড এ জাতীয় প্রত্যক্ষকে complication অথবা acquirement of meaning বলিয়াছেন।[২৯]

যোগজ—যোগাভ্যাসের ফলে যোগিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (ইন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পর্শহীন) ও অতীন্দ্রিয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার শক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এ প্রকার জ্ঞান যোগজ। যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বকালে সর্ববিষয়ে এই প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন (যুঞ্জান) তাঁহারা ধ্যানস্থ হইয়া যোগজ সংযোগ দ্বারা সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ভারতীয় দর্শন শ্রুতি বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই অলৌকিক যোগজ ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনে যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত, কিন্তু সামান্যলক্ষণ ও জ্ঞানলক্ষণ এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় নাই।[৩০]

লৌকিক প্রত্যক্ষও তিন প্রকার : নির্বিকল্পক, সবিকল্পক, ও প্রত্যভিজ্ঞা

লৌকিক প্রত্যক্ষকে তিন দলে ভাগ করা হইয়াছে : নির্বিকল্পক, সবিকল্পক ও প্রত্যভিজ্ঞা।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ (Indeterminate perception)—প্রত্যক্ষের প্রথম অস্পষ্ট স্তর, যেখানে বস্তুর অস্তিত্ব মাত্র বোধ হইয়াছে, কিন্তু তাহার গুণ ও ক্রিয়া সম্পর্কে কোন জ্ঞান জন্মে নাই। "একটা কিছু আছে", এই মাত্র অনুভবকে, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলা হয়। সাংখ্য দর্শনে ইহাকে 'আলোচনা' নামে অভিহিত করা হয়।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ—যখন মনোযোগের ফলে প্রত্যক্ষের বিষয়টি স্পষ্ট হয়, যখন তাহার গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ সকল বিষয়েই জ্ঞান হয়, তখন প্রত্যক্ষ সবিকল্পক

২৯। Ward—Psychological Principles, P. 168. also Stout—Manual of Psychology, P. 205ff

৩০। বেদান্ত পরিভাষা—প্রথম অধ্যায়

পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন শুধু "এটা একটা কিছু" এই বোধ হয় না। তখন জানি, "ওটা আমাদের লাল রংয়ের বুধী গাইটা"। বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবকে 'বিকল্প' বলে। 'এই বস্তু এই গুণ বা বিশেষণযুক্ত' এ ভাবে যখন কোন প্রত্যক্ষ, অতীত প্রত্যক্ষের সংস্কারের (representation) সঙ্গে যুক্ত হইয়া, অর্থগৌরবে মর্যাদা লাভ করে, তখন সে প্রত্যক্ষ 'সবিকল্পক' বলিয়া খ্যাত হয়। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানী জেমস্-ও জ্ঞানের এই দুই স্তর স্বীকার করিয়াছেন, প্রথম নির্বিকল্পক স্তর হইতেছে 'mere acquaintance with', আর দ্বিতীয় সবিকল্পক স্তর হইতেছে, 'knowledge about'।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে, প্রত্যক্ষের মধ্যে যখন দ্রব্যের নামের সহিতও পরিচয় হয়, তখনই সবিকল্পক প্রত্যক্ষের স্তরে পৌঁছা হইল—যেমন, গোরুকে দেখিলাম, তাহার গুণগুলি লক্ষ্য করিলাম এবং তাহাকে গোরু নামে জানিলাম, তখন তাহা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হইল।

প্রত্যভিজ্ঞা—পূর্বে অনুভূত কোন দ্রব্যকে আবার তাহা প্রত্যক্ষ হইলে, সেই দ্রব্য বলিয়া চেনা (recognition), ইহাই হইল প্রত্যভিজ্ঞা। একজন খোঁড়া মানুষকে দেখিয়াই মনে পড়িল যে, এই মানুষটিকেই কিছুক্ষণ আগে বাজারে দেখিয়াছি। ইহা প্রত্যভিজ্ঞা।

সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, বৈশেষিক, সাংখ্য ও মীমাংসা প্রত্যক্ষ সম্পর্কে ন্যায় দর্শনের মতই গ্রহণ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও বেদান্তবাদীদের সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ভিন্ন মত। বৌদ্ধ ধর্মকীর্তির মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে, তাহা পূর্বের অভিজ্ঞতা (কল্পনা) দ্বারা রঞ্জিত। তাহার আকার বিকৃত, তাহা বুদ্ধিকল্পিত গুণ দ্বারা আবৃত হয়।[৩১] নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই সত্য জ্ঞান। তাহার মধ্যে পূর্বের অভিজ্ঞতার কোন মিশ্রণ নাই। তাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শের ফলে তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন, তাহা নিজ বৈশিষ্ট্যে অন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ হইতে পৃথক (স্বলক্ষণ), তাহার স্বরূপ অবর্ণনীয়। কিন্তু যখনই সেই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি (অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষে), তখনই অন্যের সহিত তাহাকে সম্বন্ধে যুক্ত করি। পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া কতগুলি সামান্য গুণ দ্বারা (concepts) তাহাকে বিশেষিত করি—বলি, ফুলটি গোলাপ অর্থাৎ ইহা গোলাপ শ্রেণীর। আমরা গুঞ্জন শুনিতে পাই তাহা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, তাহা ইন্দ্রিয়-উপাত্ত (the sense-datum)। কিন্তু যখনই বলি, ইহা ভ্রমরগুঞ্জন, তখনই পূর্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা এই প্রত্যক্ষ পরিবর্তিত হইল। তাহা অযথার্থ কল্পনার

৩১। বিকল্পাকার মাত্রং সামান্যং অলীকং বা প্রত্যভিজ্ঞা—ধর্মকীর্তি

সৃষ্টি। দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন সমস্ত বাহ্যবস্তুই ক্ষণিক, তাহার জ্ঞান অসম্ভব। জ্ঞান-মাত্রই কিছুটা স্থায়িত্ব দাবি করে। সত্য তো প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, কিন্তু প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই চিন্তা দ্বারা, কল্পনা দ্বারা সত্যের চির-গতিশীলতাকে স্তব্ধ করিয়া দিতে হয়। কাজেই তাহা সত্যের বিকার—জীবন্ত সত্যের মৃত্যু। ঠিক এই কথাই সাম্প্রতিককালে বলিয়াছেন বের্গস্‌। দিঙ্‌নাগের মতেও চিন্তার সৃষ্ট জগৎ অসত্য (অনর্থ)। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মত তাঁহাদের ক্ষণিকবাদ এবং বিজ্ঞানবাদেরই সাক্ষাৎ ফল। কিন্তু হিন্দু দার্শনিকেরা (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও মীমাংসা) ক্ষণিকবাদ ও বিজ্ঞানবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে, বিশেষণবর্জিত বিশুদ্ধ অক্ষজ জ্ঞান অসম্ভব।[৩২] প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বর্তমান অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী। সামান্য (universals) সম্পূর্ণ কল্পনা- বা বুদ্ধি-সৃষ্ট, তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, একথা নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। জয়ন্ত বলেন, সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যাহা অপ্রকাশিত ছিল, মনোযোগের ফলে, তাহাই প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি বা কল্পনা যে অর্থ বা সামান্য গুণ প্রত্যক্ষে আরোপ করে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়েই গুপ্ত ছিল। বুদ্ধি সত্যজ্ঞানকে বিকৃত করে না—তাহা অনর্থ নয়, গুপ্ত অর্থের প্রকাশ মাত্র।[৩৩]

প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞান; ইহার পাঁচটি উপাদান—বিষয়, বাহ্য ইন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয় মন, আত্মা ও বাহ্য অবস্থা

ন্যায়-সূত্র অনুসারে প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞান। যাহা ভ্রম (illusion) তাহা প্রত্যক্ষ নয়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষে এই কয়টি উপাদান থাকে: (১) প্রত্যক্ষের বিষয় (a real object); (২) বাহ্য ইন্দ্রিয়; (৩) অন্তরেন্দ্রিয় মন; (৪) আত্মা; (৫) বাহ্য সহকারী অবস্থা (যেমন দৃষ্টির বেলায়, উপযুক্ত আলোক)। ইহাদের কোন একটি দোষযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হয়। ইন্দ্রিয়ে দোষ থাকিলে প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হইবে; পারিপার্শ্বিক সহকারী অবস্থা অনুকূল না হইলে ভ্রম হয়; মনোযোগ না থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের সামনে বাহ্য বস্তু থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় না—সর্বোপরি জীবাত্মা বা জ্ঞাতা না থাকিলেই বা প্রত্যক্ষ কি প্রকার হইবে?[৩৪] ন্যায়

৩২। ওয়ার্ড-ও এই কথাই বলিয়াছেন, a pure sensation is a psychological myth. কান্ট-ও বলিয়াছিলেন perception without conceptions are blind and conceptions without perceptions are empty!

৩৩। Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. II, Pp. 61-62

৩৪। তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮

মতে সমস্ত ভ্রমের তিনটি কারণ : (১) দোষ—ইন্দ্রিয়ের বিকার বা অসুস্থতা, যেমন কামলা রোগ (jaundice); (২) সম্প্রয়োগ—সমগ্র বিষয়বস্তুর পরিবর্তে তাহার অংশ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসা ; (৩) সংস্কার—প্রাচীন অভ্যাস বা মানসিক বিকার।[৩৫]

অনুমান—অনুমান অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়সংস্পর্শজনিত নহে। যাহা প্রত্যক্ষে উপস্থিত আছে, তাহা হইতে, যাহা ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত নাই (দূর অতীত বা ভবিষ্যৎ), সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানকে অনুমান বলা হয়। এখানে যাহা উপস্থিত আছে তাহা চিহ্নমাত্র (sign), তাহা আমাদের সম্মুখে যাহা নাই তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছে। এই জ্ঞান অবশ্যই মূলতঃ প্রত্যক্ষ-নির্ভর। তবে লৌকিক প্রত্যক্ষের মতো এই জ্ঞান শুধুমাত্র উপস্থিত ও বর্তমান বিষয়ে সীমিত নয়। ইহার পরিধি বিস্তৃততর। তবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা এই স্থানে নাই। তাহা না হইলেও, অনুমানের নিয়ম পালন করিলে, এ জ্ঞানও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা হইতে ইহা অনুমান করিলাম, পর্বতে বহ্নি আছে। বহ্নি প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। কিন্তু ধূম বহ্নির চিহ্ন বা লিঙ্গ। এই লিঙ্গ হইতে বহ্নিরূপ 'লিঙ্গী'কে জানি কি প্রকারে ? ইহার কারণ ধূম ও বহ্নির (লিঙ্গ ও লিঙ্গীর) মধ্যে অচ্ছেদ্য, নিয়ত, অব্যভিচারী (ব্যতিক্রমহীন) সম্পর্ক বর্তমান। এই নিয়ত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বলা হয়। এই ব্যাপ্তিসম্বন্ধই সমস্ত অনুমানের ভিত্তি। 'অনু' শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, আর 'মান' শব্দের অর্থ জ্ঞান। কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার পরে, সেই প্রত্যক্ষের কারণ সম্বন্ধে যে যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই অনুমান। ধূম দেখিয়া পরে বহ্নি সম্বন্ধেও অসংশয় জ্ঞান হয়। ধূমরূপ যে চিহ্ন দেখিয়া বহ্নির জ্ঞান হয়, তাহাকে হেতু বা সাধনও (middle term) বলা হয়। যে বস্তুকে হেতুর (ধূম) সাহায্যে পাইতে চাই বা সাধন করিতে চাই, তাহাকে (বহ্নি) বলা হয় সাধ্য (major term), এবং যে আধারে বা অধিকরণে (পর্বত) সাধ্যের (বহ্নি) অবস্থিতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহার নাম পক্ষ (minor term)। বহ্নি ধূম অপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সুতরাং ইহা ব্যাপক, এবং ধূম বহ্নি অপেক্ষা অল্প স্থান অধিকার করে, সুতরাং ইহা ব্যাপ্য। হেতু ব্যাপ্য, এবং সাধ্য ব্যাপক। হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ থাকে এবং এই সম্বন্ধের জ্ঞানের উপরই অনুমান নির্ভর করে। যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থানে বহ্নিও সর্বদা থাকে, এই

লিঙ্গের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বস্তু সম্বন্ধে সত্যজ্ঞানের উপায় হইল অনুমান

সাধ্য, পক্ষ ও হেতু

৩৫। ন্যায় বিন্দুটীকা—পৃঃ ১২

প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকিলে অনুমান হইতে পারে না। অনুমানে প্রথম হেতুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে; তারপর থাকে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে **ব্যাপ্তিসম্বন্ধ জ্ঞান**; সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও থাকে যে, সাধ্যের ব্যাপ্তিযুক্ত হেতুটি, সাধ্যের অধিকরণ যে পক্ষ, তাহাতে আছে। তবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পক্ষে সাধ্যও বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ পর্বতে ধূম (হেতু) প্রত্যক্ষ করিলাম। তারপর এই নিশ্চিত জ্ঞানও হইল যে, যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে তাহার ব্যাপক হিসাবে বহ্নিও সর্বদাই থাকে। এ জ্ঞানও থাকে যে, ধূম পর্বতরূপ অধিকরণে আছে, সুতরাং এ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পর্বতরূপ অধিকরণে (পক্ষ) বহ্নিও (সাধ্য) অবশ্য আছে।

শুধু নিজের সন্দেহ নিরসনের জন্য যে অনুমান, তাহা **স্বার্থানুমান** আর পরের সন্দেহ নিরসনের জন্য যে অনুমান, তাহা **পরার্থানুমান**। স্বার্থানুমানে ধূম (হেতু) দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করি যে, পর্বতে বহ্নি আছে। কিন্তু পরকে বুঝাইতে গেলে, অনুমান পদ্ধতি আরো বিস্তৃততর হওয়া প্রয়োজন। ন্যায় দর্শনের আচার্যগণ পরার্থানুমানে পাঁচটি অঙ্গ বা **অবয়ব** নির্দেশ করিয়াছেন—এই অবয়ব পাঁচটি হইল:

স্বার্থানুমানে তিনটি অবয়ব

(১) প্রতিজ্ঞা—অর্থাৎ যে বাক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, যথা,—পর্বতে অবশ্যই বহ্নি আছে; (২) হেতু—সিদ্ধান্তের কারণনির্দেশ, যথা—পর্বতে ধূম দেখা যাইতেছে; (৩) উদাহরণ—বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ যথা—যেখানেই ধূম দেখা যায়, সেখানেই বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালায় যখন যখন ধূম দেখা যায়, তখন সেখানে বহ্নিও দেখা যায়; (৪) উপনয়ন—পক্ষে হেতুর উপস্থিতি-নির্দেশ যথা, পর্বতেও ধূম দেখা যাইতেছে; (৫) নিগমন—সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথা, অতএব প্রমাণ হইল যে, পর্বতে বহ্নিও অবশ্যই আছে।

পরার্থানুমানে পঞ্চ অবয়ব: প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন

ন্যায়ের প্রথম ও চতুর্থ অবয়ব অনাবশ্যক, ইহা নাগার্জুন ও দিঙ্‌নাগের মত। বাৎস্যায়ন এবং উদ্দ্যোতকরের মতে স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে তিনটি অবয়বই যথেষ্ট, কিন্তু পরার্থানুমানের বেলায় পঞ্চ অবয়বেরই প্রয়োজন আছে।[৩৬] অনুমান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এক হিসাবে অনুমানের ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ব্যাপক। কারণ প্রত্যক্ষে বর্তমানের জ্ঞান জন্মে, কিন্তু অনুমানে অতীত, ভবিষ্যৎ ও দূর সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ হয়।[৩৭]

৩৬। তর্কভাষা, পৃঃ ৪৮-৪৯

৩৭। বৈশেষিক দর্শন ভাষ্যকার এই পঞ্চ অবয়বের ভিন্ন নাম দিয়াছেন—(১) প্রতিজ্ঞা, (২) অপদেশ, (৩) নিদর্শন, (৪) অনুসন্ধান ও (৫) প্রত্যাম্নায়। কোন কোন নৈয়ায়িক পঞ্চ অবয়বের অতিরিক্ত আরও পাঁচ অবয়বের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) জিজ্ঞাসা, (২) সংশয়, (৩) শক্যপ্রাপ্তি, (৪) প্রয়োজন ও (৫) সংশয় ব্যুদাস।

অ্যারিস্টটেলীয় Syllogism-এর সহিত ভারতীয় পঞ্চাবয়ব ন্যায়ের তুলনা

ভারতীয় পঞ্চাবয়ব ন্যায়ের সহিত অ্যারিস্টটেলীয় ন্যায়ের মূলতঃ মিল থাকিলেও তাহাদের মধ্যে প্রভেদও লক্ষণীয়। দুই ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে চিহ্ন বা লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা হয়। দুই পদ্ধতিতেই অনুমানে তিনটি পদ থাকে—হেতু, সাধ্য, পক্ষ (Middle, Major & Minor terms)। দুই পদ্ধতিতেই হেতু (middle term) অনুমানের মূল। ভারতীয় ও অ্যারিস্টটেলীয় দুই অনুমানপদ্ধতিই ব্যাপ্তিসম্বন্ধ-নির্ভর। কিন্তু দুই পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদও লক্ষণীয়। অ্যারিস্টটেলীয় অনুমান সম্পূর্ণই আকারগত বা ভাব-সামঞ্জস্যগত (formal), কিন্তু ন্যায়ের অনুমান ভাবগত সামঞ্জস্য ও বস্তুগত সামঞ্জস্য (formal and material consistency) -ভিত্তিক। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে আরোহ ও অবরোহ অনুমান পৃথক, কিন্তু ন্যায় মতে তাহারা অবিচ্ছিন্ন। তাই ন্যায়ানুমানে প্রত্যক্ষ (observation) ও ব্যাপ্তিসম্বন্ধের জ্ঞান (knowledge of causal relation) এই দুইয়েরই স্থান গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারিস্টটেলীয় syllogism-এ-তিনটি বাক্য বা অবয়ব—প্রথম আশ্রয়বাক্য, দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত (Major premise, Minor premise, Conclusion); ন্যায়ানুমান পঞ্চাবয়বী। ন্যায়ের প্রথম অবয়ব (প্রতিজ্ঞা), অ্যারিস্টটেলীয় অনুমানের সিদ্ধান্ত (conclusion); ন্যায়ের দ্বিতীয় অবয়ব (হেতু), অ্যারিস্টটেলীয় দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য (minor premise); আর ন্যায়ের তৃতীয় অবয়ব অ্যারিস্টটেলীয় প্রথম আশ্রয়বাক্য (major premise)। আবার ন্যায়ের শেষ তিনটি অবয়ব হইল অ্যারিস্টটেলীয় প্রথম আশ্রয়বাক্য, দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সমতুল্য। অ্যারিস্টটেলীয় ন্যায়ের প্রথম সামান্য আশ্রয়বাক্যে (universal major premise) কোন দৃষ্টান্ত থাকে না। ভারতীয় ন্যায়ে উপনয়ন-রূপ অবয়বে, সাধ্য, পক্ষ ও হেতু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একত্র থাকে; কিন্তু অ্যারিস্টটেলীয় ন্যায়ে, কোন আশ্রয়বাক্যেই তিনটি পদ একত্র থাকে না। অ্যারিস্টটেলীয় ন্যায়ে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতিতে, পঞ্চাবয়বী ন্যায় পরার্থানুমানের বেলাতেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য।

পাশ্চাত্ত্য Syllogism-এর সহিত পঞ্চাবয়ব ন্যায়ের তুলনা

দুই পদ্ধতিতে মৌলিক সাদৃশ্য দেখিয়া ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অনুমান ভারতীয় দর্শনে বহুকাল পূর্ব হইতেই স্বীকৃত ছিল বটে, কিন্তু syllogism-এর বিশেষ রূপটি হিন্দুরা অ্যারিস্টটলের তর্কশাস্ত্র হইতে শিখিয়া

পক্ষাবলম্বী ন্যায়ে তাহা পরিবর্তিত করিয়াছেন।[৩৮] অধ্যাপক কীথ্-ও প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।[৩৯] আবার কোন কোন পণ্ডিত সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, আলেকজাণ্ডার যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তিনি এ দেশের দার্শনিকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। আলেকজাণ্ডার নিজ দেশে হিন্দুদের ন্যায় দর্শন এবং নাট্যতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়া যান এবং অ্যারিস্টটল আলেকজাণ্ডার-এর নিকট হইতে এই সব তত্ত্ব শিক্ষালাভ করেন এবং অ্যারিস্টটলের syllogism তাহারই ফল।[৪০] সম্ভবতঃ এ বিষয়ে মাক্স্ মুয়েলোর-এর সিদ্ধান্তই সত্য যে, এই দুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে, নিজ নিজ দেশের মাটিতে, স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হইয়াছে। কোন পক্ষই অন্যের নিকট ঋণী নয়।[৪১]

ব্যাপ্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ

লিঙ্গ (ধূম) ও লিঙ্গীর (বহ্নি) মধ্যে নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধই সমস্ত অনুমানের ভিত্তি। সাধ্য ও পক্ষ দুই পদই হেতু বা লিঙ্গের সহিত যুক্ত। সেই জন্যই পক্ষ ও সাধ্য সিদ্ধান্তে যুক্ত হইতে পারে। ব্যাপ্তি কথার অর্থ ঘিরিয়া থাকা। ন্যায় দর্শনে ব্যাপ্তি বলিতে বুঝায় সতত সহাবস্থান। ধূম অগ্নি দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থ, যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে সর্বদাই বহ্নিও আছে। যেখানে ব্যাপ্ত (ধূম) ও ব্যাপক (বহ্নি)-এর সম্বন্ধ অসমান (যেমন ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে, কিন্তু বহ্নি থাকিলেই ধূম থাকিবে এমন নহে), তাহাকে অসমব্যাপ্তি বলে। আর যেখানে দুইয়ের ব্যাপ্তিই সমান (যাহার নাম দেওয়া যায়, তাহা জানাও যায়), তাহাকে বলে সমব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অব্যভিচারী (invariable) অনুপাধিক (unconditional) সাহচর্য হইতে হইবে। হেতু (middle term) ও সাধ্যের (major term)

৩৮। Vidyabhusan—History of Indian Logic, P. XV.

৩৯। Keith—I. L. A., P. 18

৪০। Vidyabhusan—History of Indian Logic, P. 509, n. i, and Appendix B.

৪১। ...it will be best to accept facts and to regard both Greek and Indian Philosophy as products of the intellectual soil of India and Greece, and derive from their striking similarities this simple conviction only, that in philosophy also, there is a wealth of truth which forms the common heirloom of all mankind, and may be discovered by all nations if they search for it with honesty and perseverance. Max Müller—Six Systems of Indian Philosophy, P. 388

মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকিলেই অনুমান নিঃসংশয় হইতে পারে। কিন্তু ব্যাপ্তিসম্বন্ধ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্থানে বিভিন্ন মত দেখা যায়। চার্বাক তো কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেন। অনুমান প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতই নয়। সুতরাং ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্থাপন সম্বন্ধে কোন আলোচনাই তিনি করেন নাই। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, এই সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় (not a-posteriori)। তাঁহাদের মতে কার্য-কারণ সম্বন্ধই ব্যাপ্তিসম্বন্ধের মূল। যেখানেই জানি কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে, সেখানেই ব্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকিবে জানি। ইহা আমাদের চিন্তার মূল সূত্র, যাহাতে বিশ্বাস অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ (a-priori)। কার্যকারণ সম্বন্ধ **পঞ্চীকরণ** পদ্ধতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। পদ্ধতিটি এইরূপে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়: (১) কারণ বা কার্য কিছুই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে না। (২) কারণ প্রত্যক্ষ করা গেল। (৩) তৎক্ষণাৎ কার্যও প্রত্যক্ষ হইল। (৪) কারণ দূরীভূত হইল। (৫) তৎক্ষণাৎ কার্যও দূরীভূত হইল।

ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অব্যভিচারী অনুপাধিক সাহচর্য

পঞ্চীকরণ পদ্ধতিদ্বারা ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্থাপিত

বেদান্তমতে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অব্যভিচারী সম্বন্ধের (induction by simple enumeration) উপর নির্ভরশীল। লিঙ্গ ও লিঙ্গী সর্বদাই একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে এবং ইহার কোন ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ হয় নাই—সুতরাং অনুমান করা যায় এই দুইয়ের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বিদ্যমান।[৪২]

ব্যাপ্তিসম্বন্ধের ভিত্তি সম্পর্কে ন্যায় ও বেদান্তের তুলনা

ন্যায়মতেও ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অভিজ্ঞতা-নির্ভর। এ বিষয়ে বৈদান্তিকের সহিত তাঁহাদের মতের মিল আছে। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন কেবলমাত্র অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ব্যাপ্তিসম্বন্ধের ভিত্তি নয়। তাঁহারা মনে করেন, অন্বয় (agreement in presence), ব্যতিরেক (agreement in absence) এবং ব্যভিচারগ্রহ (ইহার বিপরীত কোন দৃষ্টান্ত অভিজ্ঞতায় না পাওয়া) দ্বারা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের নিয়তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তদুপরি উপাধিনিরাশ (অন্য কোন কারণ বা উপাধির উপর এ সম্বন্ধ নির্ভর করিতে পারে না, তাহা দেখানো), তর্ক (ইহার বিপরীত অন্য কোন কারণ চিন্তা করিলে তাহা স্ববিরুদ্ধ হয়, তাহা দেখানো—reductio ad absurdum), সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের (বিশেষ উদাহরণের মধ্যে সামান্য বা সাধারণ বিধি লক্ষ্য করা) সাহায্যও তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন।[৪৩]

৪২। ব্যভিচারাদর্শনেসতি সহাচার দর্শনম্—বেদান্ত পরিভাষা

৪৩। Chatterjee & Dutta—An Introduction to Indian Philosophy, P.187-90

চারি প্রকার ব্যাপ্তিসম্বন্ধ

ব্যাপ্তিসম্বন্ধ চারিপ্রকার—(১) **অন্বয় ব্যাপ্তি**—যেখানেই ধূম আছে, সেখানেই বহ্নি আছে। (২) **ব্যতিরেক ব্যাপ্তি**—যেখানে বহ্নির অভাব, সেখানে ধূমেরও অভাব। (৩) **কেবলান্বয়ী**—যেখানে অভাবাত্মক উদাহরণ পাওয়া যায় না, দুইটি বিষয়ের মধ্যে সর্বদাই ভাবাত্মক সম্বন্ধই পাওয়া যায়—যেমন, যে যে বস্তু জ্ঞানের বিষয়, সেই সেই বস্তু বাক্যেরও বিষয়। (৪) **কেবলব্যতিরেকী**—যেখানে কেবলমাত্র অভাবাত্মক উদাহরণই পাওয়া যায়, ভাবাত্মক সম্বন্ধ কোথাও দেখা যায় না—যেমন, যাহার উপাদান ক্ষিতি নয়, তাহা গন্ধযুক্ত নয়।

অনুমানের শ্রেণিবিভাগ

অনুমানের শ্রেণিবিভাগ

ভারতীয় চিন্তায় আরোহ ও অবরোহ (Induction and Deduction) পৃথক নয়, কারণ সমস্ত অনুমানেই এই দুই প্রণালী সংমিশ্রিত। ভারতীয় ন্যায়ে **স্বার্থানুমান** হইতেছে কেবলমাত্র নিজ সন্দেহ নিরসনের জন্য অনুমান এবং **পরার্থানুমান** হইতেছে পরকে বুঝাইবার জন্য।

পূর্ববৎ

মহর্ষি গৌতম অনুমানকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন : (১) **পূর্ববৎ** এখানে প্রত্যক্ষ কারণ হইতে অপ্রত্যক্ষ কার্য অনুমান করা হয়, যেমন—আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া অনুমান করা হয় যে, বৃষ্টি হইবে। (২) **শেষবৎ**—এখানে কার্য প্রত্যক্ষ, তাহা হইতে কারণ অনুমান করি, যেমন, প্রাতঃকালে নদীর জলের বৃদ্ধি এবং চারিপাশের জমি ও গাছপালার আদ্র্রতা দেখিয়া অনুমান করি যে, রাত্রে অবশ্যই বৃষ্টি হইয়াছে। (৩) **সামান্যতোদৃষ্ট**—এই অনুমান কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে না। এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ কার্য-কারণের নয়—অভিজ্ঞতায় সর্বদা তাহাদের একত্র দেখা যায়, তাহা হইতেই তাহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অনুমান করা হয়। আমরা উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি চন্দ্রকে লক্ষ্য করিলাম যে, রোজই তাহার আকাশে অবস্থান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহা হইতে অনুমান করিলাম, চন্দ্রের নিশ্চয়ই গতি আছে, যদিও চন্দ্রের গতি কখনও আমার প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। এখানে এই অনুমানের ভিত্তি হইতেছে এই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, যখন কোন

শেষবৎ

সামান্যতোদৃষ্ট

দ্রব্য স্থান পরিবর্তন করে, তখন তাহার গতিও থাকে।[৪৪] প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়ে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এই অনুমানও শেষবৎ—কার্য হইতে কারণের অনুমান।

কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান

ব্যাপ্তিসম্বন্ধের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করিয়া অনুমানের আবার উপরিউক্ত তিন প্রকার ভাগ করা হয়: (১) কেবলান্বয়ী—হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যেখানে কেবলমাত্র অন্বয়ব্যাপ্তির সম্বন্ধ (agreement in presence) সেই অনুমান কেবলান্বয়ী। যেমন—

কেবলান্বয়ী

যাহাই জ্ঞানের বিষয়, তাহার নাম আছে
ঘট জ্ঞানের বিষয়,
সুতরাং ঘটেরও নাম আছে।

(২) কেবল ব্যতিরেকী—যেখানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে কেবলমাত্র ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির সম্বন্ধ, সেই অনুমান কেবলব্যতিরেকী (agreement in absence) যেমন,

কেবলব্যতিরেকী

যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই
এই লৌহখণ্ডে অগ্নি নাই (অগ্নিসংযোগ ঘটে নাই)
সুতরাং এই লৌহখণ্ডে ধূমও নাই।

(৩) অন্বয় ব্যতিরেকী—যেখানে হেতুও সাধ্যের সহিত অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী এই দুই ব্যাপ্তিসম্বন্ধই বর্তমান (agreement in presence and also in absence) সেখানে অনুমান অন্বয়ব্যতিরেকী। যেমন,

অন্বয়ব্যতিবেকী

যে যে দ্রব্য ধূমবান, তাহাই বহ্নিমান্
পর্বত ধূমবান্
সুতরাং পর্বত বহ্নিমান্।

৪৪। তৎপূর্বকং ত্রিবিধং অনুমানম্—পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্টং—ন্যায়সূত্র ১, ১, ৫ বাৎস্যায়ন এই সূত্রের অন্যবিধ ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি বস্তুর মধ্যে যদি অন্বয়ীভাব সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ পূর্বে যেখানেই একটি প্রত্যক্ষ হইয়াছে সেখানেই যদি অন্যটিও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তবে বর্তমানে তাহাদের একটি প্রত্যক্ষ হইলে, অন্যটিও সেখানে আছে, এইরূপ অনুমান পূর্ববৎ অনুমান। অন্য সমস্ত বিকল্প কারণ বর্জন করিয়া অবশিষ্টই কেবলমাত্র কারণ, এ প্রকার অনুমান শেষবৎ (inference by eliminating alternative causes)। উদ্দ্যোতকরের মতে পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট প্রকৃতপক্ষে তিনটি বিভিন্ন অনুমান নয়—একই অনুমানের বিভিন্ন রূপ। নব্য-নৈয়ায়িকগণ এই তিন প্রকার অনুমানের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামী সন্তদাসজী—দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০-৮২

আবার যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই
পর্বত ধূমবান্
স্মৃতরাং পর্বত বহ্নিমান্।

হেত্বাভাস—ভারতীয় স্থায়ে শুধুমাত্র ভাবগত বা আকারগত অসমাঞ্জস্যজনিত অনুমানের ত্রুটির (mere formal fallacies) স্থান নাই। অনুমানের সমস্ত ত্রুটিই বস্তুগত (material fallacies)।[৪৫] অনুমানের সমস্ত দোষই হেতুর (middle term) দোষের উপর নির্ভর করে। স্মৃতরাং স্থায় দর্শনে অনুমানের সমস্ত ত্রুটির নাম হেত্বাভাস। আপাতদৃষ্টিতে হেতু বলিয়া মনে হইলেও, বাস্তবিক যাহা হেতু নহে তাহাই হেত্বাভাস। যাহাতে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কোন দোষ না থাকিতে পারে, সে জন্য স্থায়শাস্ত্রে কতগুলি নির্দেশ আছে। "হেতুটি নির্দোষ কিনা, বিচার করিতে হইলে প্রধানত তিনটি বিষয়ে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) যে অধিকরণে (পর্বতে) সাধ্য (বহ্নি) আছে কিনা বিচার করিতেছি, সেই অধিকরণে হেতুর (ধূমের) নিশ্চিত অবস্থিতি। (২) পূর্বে যে অধিকরণে সাধ্যকে দেখিয়াছি, সেখানে হেতুর নিশ্চিত অবস্থিতি। (৩) যে অধিকরণে কখনও সাধ্য থাকিতে পারে, না, সেই অধিকরণে হেতুর অনবস্থিতি। এই ত্রিবিধ পরীক্ষায় হেতুর নির্দোষিতা স্থির না হইলে, সেই হেতুর সহায়তায় সাধ্যবস্তুর অবস্থিতি বিষয়ে নির্ভুল অনুমিতি হইতে পারে না। নৈয়ায়িক আচার্যগণ দোষযুক্ত হেতুকে হেত্বাভাস নামে অভিহিত করিয়াছেন।"[৪৬]

অনুমানের দোষের নাম হেত্বাভাস

অনুমানের যে সমস্ত ত্রুটি পদের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের জন্য ঘটে, সেগুলিকে 'ছল' বলা হয়, তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। পক্ষ সম্পর্কে দোষ থাকিলে তাহা পক্ষাভাস। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটিকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই—হেতু সম্বন্ধে দোষ অর্থাৎ হেত্বাভাস সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা আছে। গৌতম সূত্রানুযায়ী হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার: (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম ও (৫) কালাতীত।

পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস

৪৫। অ্যারিস্টট্‌ল fallacyগুলিকে in dictione এবং extra dictione এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, কিন্তু undistributed middle, illicit major অথবা illicit minor ইত্যাদি formal fallacyগুলির কোন উল্লেখ নাই। Eaton বলেন, ইহার কারণ "to one trained in the arts of syllogistic reasoning they are not sufficiently persuasive to find a place even among sham arguments." Eaton—General Logic, P. 334

৪৬। সুখময় ভট্টাচার্য—স্থায়দর্শন, পৃঃ ১৫

সব্যভিচার—যদি প্রযুক্ত হেতু হইতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তবে ন্যায়টি সব্যভিচার হেত্বাভাস দোষদুষ্ট—যথা, শব্দ নিত্য, যেহেতু ইহা স্পর্শাতীত, যেমন, স্পর্শাতীত পরমাণুগণও নিত্য। ইহা সুযুক্তি নয়। কারণ, জ্ঞানও স্পর্শাতীত, কিন্তু জ্ঞান অনিত্য।[৪৭]

বিরুদ্ধ—যেখানে হেতু সিদ্ধান্তের বিরোধী তাহা বিরুদ্ধ হেত্বাভাস—যথা, ঘট নিত্য, যেহেতু ঘটের উৎপত্তি আছে। এখানে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অসঙ্গত, কারণ যাহার উৎপত্তি আছে, তাহা কখনও নিত্য হইতে পারে না।

প্রকরণসম—যদি হেতু বাস্তবিকপক্ষে যাহা সাধ্য, তাহাই ভিন্নবাক্যরূপে উপস্থাপিত করে, তবে প্রকরণসম হেত্বাভাস ঘটে—যেমন, ঘট অনিত্য, যেহেতু ঘটের নিত্যত্ব গুণ নাই।

সাধ্যসম—যদি হেতু হিসাবে যে বাক্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিজেরই প্রমাণ আবশ্যক হয়, তবে সাধ্যসম হেত্বাভাস ঘটে—যেমন ছায়া একটি দ্রব্য, যেহেতু ছায়ার গতি আছে। কিন্তু ছায়ার গতি আছে ইহারই প্রমাণ প্রয়োজন।[৪৮]

কালাতীত—যেখানে উদাহরণের কালের সঙ্গে হেতুর কালের সঙ্গতি নাই, এই প্রকার অনুপযোগী উপমানের ব্যবহারকে কালাতীত হেত্বাভাস বলে—যেমন, ঢাকে যষ্টির আঘাতদ্বারা যেমন শব্দের উৎপত্তি হয়, তেমনি আলোক বস্তুর উপর পতিত হইলে, তাহাদের সংস্পর্শে বর্ণ উৎপত্তি হয়। সুতরাং শব্দ বর্ণের মতোই বস্তুতে পূর্বেই ছিল। এ অনুমান কালাতীত দোষযুক্ত। বস্তুতে বর্ণ পূর্বেই ছিল, আলোকের সংস্পর্শের পরে ইহার সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু এই জন্য যদি বলা হয় যে শব্দও পূর্বেই ছিল, যষ্টির আঘাত ইহা প্রকাশ করিয়াছে মাত্র, তবে অনুমানটি দোষযুক্ত। কেননা যষ্টির আঘাতের **পরে** ঢাকে শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। পূর্বে ইহা ছিল না।

কারণ ও কার্য—অসৎকার্যবাদ—সমস্ত ব্যাপ্তিসম্বন্ধের মধ্যে কারণ-কার্য-সম্বন্ধ প্রধান। পূর্বে দেখিয়াছি যে, পূর্ববৎ অনুমানে কারণ হইতে কার্য অনুমান করা হয়। শেষবৎ অনুমানে কার্য হইতে কারণ অনুমিত হয়। এই দুইয়ের মধ্যে নিয়ত,

ন্যায়দর্শন অসৎ-কার্যবাদে বিশ্বাসী

৪৭। সব্যভিচার হেত্বাভাস আবার তিন প্রকারের—সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী। পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা ইহাকে অনৈকান্তিক বলিয়াছেন

৪৮। এই ত্রুটিকে অসিদ্ধও বলা হয় এবং ইহাও তিন প্রকারের—স্বরূপাসিদ্ধি, আশ্রয়াসিদ্ধি ও অন্যথাসিদ্ধি।

অব্যভিচার, অনুপাধিক (invariable and unconditional), সম্বন্ধ। ন্যায়-মতে কারণ ও কার্য দুইটি বিভিন্ন। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। মেঘ পূর্ববর্তী ঘটনা; এই দুই অভিন্ন নয়। কার্য-কারণ সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা-লব্ধ নয়—বুদ্ধি- বা অনুমান-লব্ধ।

কারণ ত্রিবিধ: (১) উপাদান- বা সমবায়ী-কারণ (material cause)—সূত্র বস্ত্রের সমবায়ী-কারণ; (২) অসমবায়ী-কারণ (formal cause)—সূত্রগুলির বিশেষ আকারে সংযোগই বস্ত্রের কারণ; (৩) নিমিত্ত-কারণ (efficient cause)—তন্তুবায়ের সক্রিয়তা, এবং তন্তু (তাঁত) এবং অন্যান্য যন্ত্রাদির সহায়তাই বস্ত্র বয়নকার্যের নিমিত্ত- বা সহকারী-কারণ। কোন কোন আচার্য করণ-কারণকে নিমিত্ত-কারণ হইতে পৃথক করিয়াছেন। তন্তুবায় (তাঁতী) নিমিত্ত-কারণ, কিন্তু তাহার তন্তু (তাঁত) ও অন্যান্য সরঞ্জাম করণ-কারণ। কাহারও কাহারও কাহারও মতে, করণ কোন বস্তু নহে, তাহার সক্রিয়তাই করণ-কারণ।

কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হয়, ইহারা পৃথক

ন্যায়মতে, কার্য উৎপত্তি হইবার পূর্বে তাহার উপাদান-কারণের মধ্যে কার্য বিদ্যমান থাকে। সমস্ত কারণের সংযোগ ঘটিলে পরে কার্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং কার্য পূর্বে **অসৎ** (অবিদ্যমান)—ইহার নূতন উৎপত্তির নাম **আরম্ভ**। সেই জন্য ন্যায়-বৈশেষিকের এই মতকে **অসৎকার্যবাদ** বা **আরম্ভবাদ** বলা হয়। উৎপত্তির পূর্বে ঘট ছিল না—মৃত্তিকার পরমাণুরূপ উপাদান-কারণ হইতে যে ঘট ছিল না (অসৎ), তাহার উৎপত্তি (আরম্ভ) হইল। ন্যায়মতে, এই পরিবর্তন সত্য। বেদান্তমতে কারণের কার্যে পরিবর্তন মায়া মাত্র। একমাত্র কারণ ব্রহ্মই সত্য। ন্যায়মতে এক একটি খণ্ড প্রলয়ের পর ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং জীবগণের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক এবং তাহাদের সংযোগে ত্র্যণুক এবং তাহাদের সংযোগে ক্রমে ক্রমে সমগ্র জড়জগতের সৃষ্টি হয়। ন্যায় মতে এই সৃষ্টিক্রিয়া সত্য। সাংখ্য ও বেদান্তমতে কারণ ও কার্য অভিন্ন। কারণের মধ্যে প্রথমাবধিই কার্য বিদ্যমান (সৎ) থাকে, অনুকূল অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। বীজ বৃক্ষের কারণ। বীজের মধ্যেই বৃক্ষ সম্ভাবনা রূপে সুপ্ত ছিল। এখানে সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি হয় নাই। কারণেরই আর এক রূপ হইল কার্য। ইহাই সৎকার্যবাদ। আবার সাংখ্যমতে মৃত্তিকা যখন ঘটে পরিণত হয়, তখন সত্যই কারণ কার্যে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বেদান্তমতে, এই পরিবর্তন সত্য নহে, ইহা মায়া মাত্র।

সৎকার্যবাদ মতে কারণ ও কার্য অভিন্ন

সাংখ্যের সৎকার্যবাদ—পরিণামবাদ

বেদান্তের পরিণামবাদ হইল বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ

(বিবর্তবাদ)। বৃক্ষের রূপ ও গুণ যদি বীজের মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্যমান না থাকে, তবে অসমবায়ী বা নিমিত্ত কারণ দ্বারাই বা তাহারা কিভাবে কার্যে প্রকাশিত হইল, ন্যায় দর্শনে ইহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। মীমাংসা দর্শন মতে, কারণের মধ্যে অবস্থিত এক অদৃশ্য শক্তিদ্বারা কার্য উৎপন্ন হয়। নৈয়ায়িকেরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অণুগুলির পরিস্পন্দ দ্বারা কার্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। ন্যায় দর্শনে নিষ্ক্রিয় শক্তি (mere potentiality) বলিয়া কিছু নাই। ন্যায়-বৈশেষিক মতে কারণ-কার্য সম্বন্ধে বিশ্বাস মানুষের জন্মগত সংস্কার, কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। কারণ-কার্য সম্বন্ধ প্রমাণ করিতে হইলে, দুইটি ঘটনার মধ্যে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী এই দুই প্রকার সম্বন্ধই যে বিদ্যমান, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। কার্য ও কারণ পরস্পরকে প্রভাবিত করে। এই সম্বন্ধ কোন রহস্যজনক শক্তির ফল নয়। প্রত্যেক 'কার্য-বিশেষ'-এর একটিই "কারণ-বিশেষ" থাকে।[৪৯]

উপমান

উপমার উপর নির্ভরশীল একপ্রকার প্রমাণের নাম উপমান

উপমার উপর নির্ভরশীল একপ্রকার প্রমাণের নাম উপমান। যে বস্তু আমাদের পরিচিত তাহার সহিত সাদৃশ্য-জনিত অপরিচিত কোন বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ, তাহার উপায়কে উপমান বলে। শব্দ এবং তাহার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান এই উপমান-রূপ প্রমাণ হইতেই পাওয়া যায়।

আমাদের আচার্য বলিয়াছেন, গোসদৃশ এক প্রকার প্রাণী গবয়পদবাচ্য। পূর্বে গবয় দেখি নাই, গোরু দেখিয়াছি। দৈবাৎ বনে গিয়া গোরুর মতো একটি প্রাণী দেখিলাম, যাহা গোরু নয়। তখন সেই অপরিচিত নূতন জন্তুটিকে গবয় বলিয়া জানিলাম। এই জ্ঞানের ভিত্তি হইল, অজ্ঞাত বস্তুর বর্ণনা এবং সেই বস্তুর সঙ্গে পূর্বের বর্ণনার সাদৃশ্য উপলব্ধি।

ইহা অন্যান্য দর্শনে স্বাধীন প্রমাণ হিসাবে অস্বীকৃত

উপমান অন্যান্য প্রস্থানে স্বীকৃত নয়। চার্বাকমতে উপমান দ্বারা শব্দের ব্যাপ্তির প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। বৌদ্ধগণ বলেন, উপমান পৃথক কোন প্রমাণ নয়—ইহা প্রত্যক্ষ এবং অপরের সাক্ষ্যের সংযোগ দ্বারা প্রাপ্ত। সাংখ্য এবং বৈশেষিক মতে উপমান একপ্রকারের অনুমান মাত্র। জৈন পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা এক প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা। মীমাংসক ও বৈদান্তিক উপমানের সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন।

৪৯। Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. II, Pp. 92-102

শব্দ

জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, প্রবঞ্চনা যাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, এমন সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তির বাক্য হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাও আমরা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করি। এ প্রকার সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিকে আপ্ত বলা হয়। ইহাই শব্দপ্রমাণ। সদাচার, সত্যনিষ্ঠা ও সাধনা দ্বারা ঋষি, আর্য, ম্লেচ্ছ সকলেই আপ্ত হইতে পারেন। আপ্তবাক্য দুইপ্রকার—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। যে আপ্তবাক্য প্রত্যক্ষযোগ্য বা অন্য প্রমাণ দ্বারাও সত্য বলিয়া জানা যায় তাহা দৃষ্টার্থ, যেমন, কৃষি বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বস্ত কৃষিজীবির বাক্য। আর প্রত্যক্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অধিকারী ব্যক্তিদের (যথা মহাপুরুষ, বিজ্ঞানী ইত্যাদি) বাক্যও গ্রাহ্য, ইহা অদৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ। আবার শব্দকে বৈদিক ও লৌকিক এই দুই প্রকারের বলা হয়। বৈদিক শব্দে ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত। তাহা ভ্রমপ্রমাদ-রহিত। কিন্তু লৌকিক শব্দ তত বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাঁহারা স্বভাবতঃ সত্যবাদী, লৌকিক শব্দের মধ্যে তাঁহাদের বাক্যই শুধু নির্ভরযোগ্য।

সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তি হইতে অসংশয়জ্ঞান আপ্ত বা শব্দজ্ঞান

ন্যায়মতে কোন শব্দই নিরর্থক নহে। প্রত্যেক শব্দে যে অর্থবোধক শক্তি নিহিত আছে, নৈয়ায়িক মতে সেই শক্তি ঐশ্বরিক ইচ্ছা মাত্র।

ঈশ্বর-প্রসঙ্গ

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ন্যায়ে আচার্যগণ বিস্তারিত ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং মুক্তিপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। অথচ ন্যায় দর্শনে পদার্থ-সংকলনের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। গোতম তিনটি সূত্রে ঈশ্বরপ্রমাণ করিয়াছেন।[৫০] গোতম বলিয়াছেন, ঈশ্বরই জীবের কর্মফল এবং কর্মফলের নিয়ন্তা। কেবলমাত্র ঈশ্বর অথবা শুধু কর্মফলরূপ অদৃষ্ট এই জগৎসৃষ্টির কারণ, ইহা বলা যায় না। জীবের কর্মফলস্বরূপ অদৃষ্ট ও ঈশ্বর, এ দুইই জগৎসৃষ্টির নিমিত্তকারণ। কর্মবিষয়ে জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া জীব কর্ম করে। এবং ঈশ্বরই কর্মফল বণ্টন করেন।

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব সবিস্তৃত আলোচিত হইয়াছে

৫০। ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাৎ — ন্যায়সূত্র — ৪. ১. ১৯
নপুরুষঃ কর্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ — „ ৪. ১. ২০
তৎকারিতত্বাৎ অহেতুঃ — „ ৪. ১. ২১

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে আচার্য উদয়ন প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় নাই।[৫১] সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রমাণের আবশ্যক না থাকিলেও, ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় ঈশ্বরের মননস্বরূপ উপাসনা অনাবশ্যক নহে।

বারটি প্রমেয় পদার্থের মধ্যে শরীর ইত্যাদি দশটি প্রমেয় দুঃখজনক বলিয়া মোক্ষকামীর পক্ষে পরিত্যাজ্য। আত্মা প্রথম প্রমেয়—মোক্ষ তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। সে মোক্ষের অধিগন্তা। মোক্ষ চরম প্রমেয়—ইহা আত্মার অধিগন্তব্য। ঈশ্বর দুঃখজনক বা হেয় নহেন, তিনি অধিগন্তা ও অধিগন্তব্যও নহেন। কাজেই প্রমেয়গুলির মধ্যে তাঁহার উল্লেখ নাই। গোতম সূত্র অনুযায়ী যে বারটি পদার্থ, প্রমেয় নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাদের যথার্থজ্ঞানই মুক্তির হেতু। ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান, গোতমমতে মুক্তির কারণরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। অন্যান্য প্রমেয়গুলি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই যথেষ্ট। পৃথক ভাবে ঈশ্বরকে জানিবার আবশ্যকতা ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত নয়। অবশ্য ন্যায় দর্শনে আত্মা শব্দ জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুয়েরই বাচক। জীবাত্মা সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মত। চার্বাকমতে চৈতন্যসম্পন্ন দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নাই। বৌদ্ধমতে (যোগাচার) আত্মা বিজ্ঞানসন্ততি মাত্র (stream of consciousness)। কিন্তু বিজ্ঞানের পশ্চাতে কোন স্বতন্ত্র দ্রব্য নাই। অদ্বৈতমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, জীবাত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ নহে, তাহা অহংপদবাচ্য চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন নয়। আত্মা এক অসাধারণ দ্রব্য। অন্য কোন দ্রব্যের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য নাই। তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুয়েরই সাধারণ ধর্ম আত্মত্ব।

তিন প্রকার যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ

গোতম তিন প্রকার যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন: (১) ঈশ্বরই বেদের কর্তা এবং সেই জন্যই বেদবাক্য অভ্রান্ত। (২) অদৃষ্ট বা কর্মফল স্বাধীন অদৃশ্য শক্তি নয়। কর্মফল নিয়ন্ত্রণের জন্য ঈশ্বররূপ বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ এক কর্তার প্রয়োজন। (৩) পরমাণুগুলির সংযোগ দ্বারা জড়জগতের সৃষ্টি ঈশ্বরই করিয়া থাকেন। ন্যায়দর্শন মতে ঈশ্বর অণু-পরমাণুদের সৃষ্টি করেন নাই, তাহারা নিত্য। ঈশ্বর তাহাদের নানাভাবে সংযোগ সাধন দ্বারা এই জড়জগৎ গঠন করিয়াছেন। কাজেই বলা যায় ন্যায়মতে God is not the Creator but the Architect of the Universe। ঈশ্বর এই জগৎ চালনা করিলেও, তিনি জগৎ হইতে পৃথক।

৫১। আসংসারং সুপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-১

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ একটি শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।[৫২] জগৎ বিবিধ উপাদানে গঠিত একটি কার্য (effect), সুতরাং নিশ্চয়ই তাহার একজন কর্তা আছে। ঈশ্বর কার্য নহেন, সুতরাং তাঁহার কোনও কারণ নাই। এই জগতের যিনি কর্তা, তিনি ইচ্ছা, চিকীর্ষা ও উপায়-জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান পুরুষ। পরমাণুগুলির সংযোগ এবং যথাস্থানে সন্নিবেশ (আয়োজন) দ্বারা এই জগৎ গঠিত হয়—তাহার জন্য বুদ্ধিমান এক কর্তার পরিচালনা আবশ্যক। এই বিশ্বজগৎকে কে ধারণ করিয়া আছে (ধৃতি)? নিশ্চয়ই তিনি পরম শক্তিমান ও বুদ্ধিমান কোন পুরুষ। জগতে পরম্পরাগত নানা শিল্পকর্ম (পদ) দেখা যায়। নিশ্চয়ই পরমকুশলী কোন পুরুষ ইহাদের আবিষ্কার ও প্রবর্তনের জন্য দায়ী। শ্রুতি বা বেদ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয় (শ্রুতেঃ প্রত্যয়ঃ), কারণ তাহারা ঈশ্বরের সৃষ্ট। বেদ বাক্যের সমষ্টি (বাক্যাৎ), সেই সকল বাক্যের বক্তা ঈশ্বর। পরমাণুর পরিমাণ দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ নহে—তাহার কারণ, 'দুই' এই সংখ্যা। এই সংখ্যা ঈশ্বরেরই সৃষ্ট। এ সমস্ত প্রমাণ হইতেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, অব্যয় বিশ্ববিদ্ একজন কেহ আছেন। সংসারের স্থিতি দেখিয়া যেমন তাহার মূলে একটি শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, তেমনি ইহার ক্রমিক ধ্বংস দেখিয়াও, বিনাশের মূলে এক কর্তার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। আরও বলা হইয়াছে যে, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি স্রষ্টা, তাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, এই কারণে তাঁহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব না হইলেও, তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই। নিরুক্তের একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উদয়ন বলিয়াছেন, "অন্য ব্যক্তি বৃক্ষের কাণ্ডকে দেখিতে পায় না, ইহা নিশ্চয়ই বৃক্ষের অপরাধ নয়।" গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'ঈশ্বরানুমান-চিন্তামণি' গ্রন্থেও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলীতে ঈশ্বরপ্রমাণ

ন্যায় দর্শনের ঈশ্বরপ্রমাণ বৈদান্তিকগণ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক কার্যের যে নিমিত্ত-কারণ থাকিতে হইবে, এমন নয়। স্বতঃই অনেক দ্রব্য সৃষ্টি হয়। কণ্টকের যে তীক্ষ্ণতা তাহা আপনা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।[৫৩] এই জগৎও স্বয়ংসৃষ্ট। জগতের বাহিরে জগৎ-কারণের ধারণা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। যদি কারণ স্বীকার করিতে

বেদান্তবাদীদের খণ্ডন

৫২। কার্যায়োজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ
বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যোবিশ্ববিদ্ অব্যয়ঃ। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ৫.১.

৫৩। অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টক তৈক্ষ্ণ্যাদি দর্শনাৎ—গৌতমসূত্র ৪, ১, ২২

হয়, তবে সেই কারণেরও কারণ, আবার তাহার কারণ খুঁজিতে হয়। তাহা হইলে, এই প্রশ্নও অসঙ্গত নয়, 'কে ঈশ্বরের কারণ'? আবার প্রশ্ন হয়, ঈশ্বর তো আপ্তকাম—তাঁহার তো অভাব কিছু নাই; তিনি তো রাগদ্বেষের অতীত, তবে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, মানবের প্রতি অনুকম্পা বশতঃই ঈশ্বর এ জগৎ গঠন করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ তো দুঃখময়, তাহা সৃষ্টির মধ্যে মানবের প্রতি করুণা তো সূচিত হয় না! উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, প্রত্যেক মানুষের সুখদুঃখভোগ নিজ অদৃষ্ট অনুযায়ীই হইয়া থাকে। ইহাই ঋত—ইহাই বিশ্বের বিধান। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, অদৃষ্ট দ্বারাই যদি মানুষের সুখদুঃখভোগ, তবে আর পৃথক ঈশ্বর স্বীকার কেন? উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, অদৃষ্ট তো অন্ধ শক্তি। তাহাকে কে পরিচালনা করে? কে অদৃষ্ট অনুযায়ী, সুখদুঃখ ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করেন? তবেই স্বীকার করিতে হয়, একজন নিরপেক্ষ, বুদ্ধিমান ঈশ্বর আছেন। তাঁহার করুণা বশতঃই, কর্মফল ভোগের দ্বারা মানুষের মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়। গোতম সূত্রে বা প্রাচীন নৈয়ায়িক আচার্যদের আলোচনায় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ খুব বেশী স্থান অধিকার করে না। সেই জন্য কেহ কেহ নৈয়ায়িকদের 'নিরীশ্বর তার্কিক' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু নব্য-ন্যায়ে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ যথেষ্ট বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

মোক্ষ বা অপবর্গ

অন্য সমস্ত ভারতীয় দর্শনের মতো ন্যায় দর্শনেও দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ও সংসার-চক্র হইতে মুক্তিই (অপবর্গ) সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত। ন্যায়মতে, ইহা আত্মার বিনাশ নহে, বন্ধনের অবসান। মোক্ষ ভাববাচক সুখকর অবস্থা নহে (not a positive state of bliss)—ইহা দুঃখের নিবৃত্তি। মোক্ষ লাভ হইলে দেহের বন্ধ ছিন্ন হয়, চৈতন্য ও কর্মও শেষ হয়। কিন্তু নৈয়ায়িক বলিয়াছেন, ইহা মূর্ছা বা সুষুপ্তি অবস্থা হইতে পৃথক, মহৎ এক অবস্থা। মোক্ষ হইতে হইলে, এই তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বা তাহাদের বিষয় আত্মা নয়। এই জ্ঞানলাভের সহায়ক হইতেছে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন। মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলে রাগ-দ্বেষ ও মোহ এই ত্রিবিধ দোষজনিত কর্মপ্রবৃত্তিও লোপ পায়। কামনা ও কর্মপ্রবৃত্তি দূর হইলে, কর্ম আর ফলোৎপাদন করে না এবং তাহা আর কোন বন্ধনের কারণ হয় না।

ন্যায়মতে মোক্ষ বা অপবর্গ নেতিবাচক অবস্থা

ন্যায় দর্শনের মূল্যবিচার

ন্যায় দর্শনের শ্রেষ্ঠ অবদান সত্যজ্ঞান লাভের উপযুক্ত প্রণালীর বিস্তৃত আলোচনা। সত্যপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুক্তিকেই ইহা শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে। ন্যায় দর্শনে বর্ণিত অনুমান-প্রণালী সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই গৃহীত। ব্যবহারিক জগতের পদার্থ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানই ধর্ম ও দর্শনের সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপায়, এই বিশ্বাস ন্যায় দর্শনের ভিত্তি। জগতের সৃষ্টি এবং অন্যান্য দার্শনিক প্রশ্ন সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনের অভিনবত্ব কিছু নাই—বৈশেষিক দর্শনের মতই ন্যায় প্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় দর্শনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে ন্যায় দর্শন একটি উল্লেখযোগ্য ক্রম। বৈশেষিক দর্শন অপেক্ষা ইহার স্থান উচ্চে, যদিও ইহাও বৈশেষিকের মতো সাধারণবুদ্ধি-নির্ভর ও বহুবস্তুতত্ত্বে বিশ্বাসী। দ্বিতত্ত্ব-বাদী বা অদ্বৈতবাদী বেদান্ত হইতে ইহার স্থান নিম্নে। ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনায় নব্য-ন্যায় যে সমস্ত যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের causal argument, teleological argument-এর আশ্চর্য মিল আছে। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি নিতান্তই মস্তিষ্কপ্রসূত, ভক্তের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ইহাতে হয় না। নৈয়ায়িকের মুক্তিতত্ত্বও নিতান্ত শুষ্ক ও বুদ্ধি-নির্ভর।[৫৪]

ভারতীয় চিন্তায় ন্যায় দর্শনের স্থান অত্যন্ত উচ্চে

ন্যায় দর্শনের বিচার পদ্ধতি সমগ্র ভারতীয় দর্শনের আদর্শ

ন্যায় বহুবস্তুবাদী, ন্যায়ের মুক্তিতত্ত্ব নিতান্ত শুষ্ক ও বুদ্ধি-নির্ভর

সংক্ষিপ্তসার

বৈশেষিক ও ন্যায় দুইই অতিশয় প্রাচীন দর্শন। ইহারা সমানতন্ত্র। বৈশেষিকের বহু তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত ন্যায় স্বীকার করিয়া নিয়াছে। এই দুই মতের মধ্যে বহু মিল আছে। দুইই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে; দুইই সাধারণবুদ্ধি-নির্ভর। দুইই প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে

৫৪। Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. II, Pp. 173-75
also: In thus conceiving the goal of life (Apavarga), the Nyāya-Vaiśesika is tacitly denying that there is any difference between soul and matter. The self that has reached it is divested of all experience and it is not even conscious of itself then. Such an ideal is surely repugnant to the common mind, whatever justification it may or may not have in theory. It may successfully avoid evil, but it is a success which is worse than defeat. The strightforward attempt of the Buddhist to secure annihilation is far better than this formal admission of a self in unconscious moksa.
Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy, Pp. 265-66

সত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় বলিয়া গ্রহণ করে; দুই মতই বহুবস্তুবাদী, এবং বহু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী; দুই মতই বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদ, সংশয়বাদ ও বিজ্ঞানবাদের বিরোধী। তবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। বৈশেষিক দর্শন জড় অণু-পরমাণুর সাহায্যে জগতের উৎপত্তি ও বিকাশ ব্যাখ্যায় অধিকতর আগ্রহী। ন্যায় দর্শন অন্যদিকে সত্য প্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদির স্বরূপ-বিশ্লেষণেই অধিক উৎসাহী। বৈশেষিক দর্শন স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করে না—তবে প্রসঙ্গতঃ ইহা স্বীকৃত। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বীকৃতি স্পষ্ট এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু প্রমাণ ন্যায় দর্শনে আলোচনা করা হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা জ্ঞানের বিষয়সমূহকে যুক্তি ও বিচারের প্রণালী দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়। ন্যায় দর্শনের প্রধান কাজ হইতেছে সত্য আবিষ্কারের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির পুংখানুপুংখ আলোচনা। এইজন্য ন্যায় দর্শনের আর এক নাম বাদবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা। ন্যায় দর্শনে বৈশেষিক দর্শনে উল্লিখিত সমস্ত পদার্থকেই 'প্রমেয়'র অধীনে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু প্রমাণ কাহাকে বলে, ইহার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি, এই সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা ন্যায় দর্শনে অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। অবশ্য অন্য ভারতীয় দর্শনের মতো ন্যায় দর্শনেরও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, সত্যজ্ঞান লাভের দ্বারা মুক্তিলাভের পথনির্দেশ।

ন্যায় দর্শনেব আলোচনার বিষয় ষোলটি—ইহাদের চারিটি বিভাগে পৃথক করা যায়: (১) জ্ঞানতত্ত্ব; (২) বাহ্য জগৎতত্ত্ব; (৩) আত্মতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব এবং (৪) ঈশ্বরতত্ত্ব। ষোড়শ পদার্থের অধিকাংশই জ্ঞানতত্ত্বের অধীনে আলোচিত। ন্যায় দর্শনের আলোচ্য ষোলটি বিষয় হইতেছে—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান।

প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমেয় অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের বস্তু, ন্যায়মতে বারটি—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। ইহাদের সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভই মুক্তি বা সমস্ত সংসার-দুঃখ মোচনের উপায়। এই যথার্থ জ্ঞান হইল প্রমা। জ্ঞানের বিষয় হইল প্রমেয়। জ্ঞানলাভের উপায় হইল প্রমাণ, আর যিনি সত্যজ্ঞান লাভ করেন তিনি প্রমাতা।

ন্যায় দর্শন বিশ্বাস করে যে, উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিলে সত্যজ্ঞান সম্ভব। বস্তু সম্বন্ধে যথাযথ চিন্তাই সত্যজ্ঞান। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অসাধারণ। ইহা সংযোগ বা সমবায়-সম্বন্ধ নয়। জ্ঞানের সত্যতা স্বপ্রকাশ নয়। ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সত্যজ্ঞানের এক লক্ষণ হইতেছে ইহা কর্ম উৎপাদনে সমর্থ। মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন প্রস্থান বিভিন্ন মত গ্রহণ করিয়াছেন। ভ্রম সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনের মতকে অন্যথাখ্যাতিবাদ বলা হয়। বেদান্ত মতকে অনির্বচনীয়খ্যাতি মতবাদ বলা হয়।

ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ ঘটিলে এবং অবস্থা অনুকূল থাকিলে যে অসংশয় জ্ঞান হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের কোন দোষ থাকিলে, অথবা অবস্থা প্রতিকূল হইলে (যথা আলোর অভাব), ভ্রম জন্মিতে পারে। তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে একদিকে যেমন বস্তুর সহিত

ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ থাকিতে হইবে, তেমনি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং আত্মার সংযোগ থাকিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রত্যক্ষকে লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই প্রকারে ভাগ করা যায়। অলৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ অ-সাধারণভাবে ঘটে। ইহা তিন প্রকার: সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। লৌকিক প্রত্যক্ষও তিন প্রকার: নির্বিকল্পক, সবিকল্পক এবং প্রত্যভিজ্ঞা। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তুর অস্তিত্ব মাত্র সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে, তাহার গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষে মনোযোগ হেতু প্রত্যক্ষের বস্তু স্পষ্ট প্রতিভাত হয়—তাহার গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধবিষয়েও পরিষ্কার জ্ঞান জন্মে। প্রত্যভিজ্ঞায় পূর্বে প্রত্যক্ষিত দ্রব্য আবার ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্তী হইলে, তাহাকে পূর্ব-পরিচিত বলিয়া তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি।

চিহ্ন বা লিঙ্গের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বস্তু সম্বন্ধে যে সত্যজ্ঞান, তাহার নাম অনুমান। পর্বতে ধূম দেখিয়া জানি সেখানে আগুন আছে। অনুমানে তিনটি পদ থাকে: সাধ্য, পক্ষ ও হেতু। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক নিয়ত সম্বন্ধ থাকিলে, পক্ষ ও সাধ্যকে সিদ্ধান্তে যুক্ত করা যায়। এই ব্যাপ্তিসম্বন্ধই অনুমানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। অনুমানকে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান এই দুই দলে ভাগ করা হয়। পরার্থানুমানের পাঁচটি অবয়ব: প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন। স্বার্থানুমানে তিনটি অবয়বই যথেষ্ট। পাশ্চাত্ত্য Syllogism ও ন্যায়ের পরার্থানুমান মূলতঃ এক হইলেও, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। ন্যায় দর্শনে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মতো আরোহ এবং অবরোহ, বস্তুগত সামঞ্জস্য এবং ভাবগত বা আকারগত সামঞ্জস্য পৃথক পৃথক আলোচিত হয় না।

ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে বহু আলোচনা আছে। মূল বিষয়ে মিল থাকিলেও বিভিন্ন দর্শনে ব্যাপ্তিসম্বন্ধকে ঠিক একইভাবে দেখা হয় নাই। ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অব্যভিচারী, অনুপাধিক সাহচর্য বা পরম্পরা-সম্বন্ধ। পঞ্চীকরণ পদ্ধতি দ্বারা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয়। বেদান্ত দর্শনও এই সম্বন্ধকে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বলিয়া মনে করেন। ব্যাপ্তিসম্বন্ধ চারি প্রকার: (১) অন্বয়ব্যাপ্তি (২) ব্যতিরেকব্যাপ্তি (৩) কেবলান্বয়ী ও (৪) কেবলব্যতিরেকী। যেখানে শুধুমাত্র নিজের জ্ঞানের জন্য অনুমান, তাহা স্বার্থানুমান। যেখানে পরকে বুঝাইবার জন্য অনুমান ব্যবহৃত, তাহা পরার্থানুমান। আবার পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই তিন ভাবেও অনুমানের ভাগ করা হয়। আবার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী এই তিন ভাবেও অনুমানের ভাগ করা হয়।

অনুমানের পদ্ধতিতে ত্রুটি ঘটিলে হেত্বাভাস ঘটে। নানাপ্রকার হেত্বাভাসের কথা ন্যায় দর্শনে আলোচিত।

কার্য-কারণ সম্বন্ধে ন্যায়ের মতকে অসৎকার্যবাদ বলা হয়। এই মত অনুযায়ী কারণ ও কার্য পৃথক। কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি হয়। সাংখ্য ও বেদান্ত মতে কারণ ও কার্য অপৃথক। এই মতকে সৎকার্যবাদ বলা হয়। আবার সাংখ্য এবং বেদান্তের মধ্যেও প্রভেদ

আছে। সাংখ্যমতে কারণের পরিণাম হইতেছে কার্য। দুগ্ধ ও দধি মূলতঃ এক হইলেও, দুগ্ধ পরিবর্তিত হইয়া দধি হয়। এই পরিবর্তন মিথ্যা নয়। ইহা পরিণামবাদ। কিন্তু বেদান্ত মতে কারণের কার্যে পরিবর্তন, মায়া বা বিবর্তমাত্র। ইহা সত্য নয়। এই মতকে তাই মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ বলা হয়।

উপমার উপর নির্ভরশীল এক প্রকার জ্ঞানের নাম উপমান। অন্যান্য প্রস্থানে উপমান স্বাধীন প্রমাণ হিসাবে অস্বীকৃত।

সত্যদ্রষ্টা, সদাচারী, স্বার্থশূন্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে অসংশয় অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে—তাহা আপ্ত বা শব্দ।

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর স্পষ্টতঃ স্বীকৃত। ঈশ্বর অণু ও পরমাণুর স্রষ্টা না হইলেও তাহাদের সংযোগ সাধনের দ্বারা জগতের বিভিন্ন দ্রব্যের গঠন ঈশ্বরই করিয়া থাকেন। ঈশ্বরই মানুষের আত্মাকে চালনা করেন। তিনি কর্মফল বণ্টন করেন। তিনি সগুণ—বিভু, শক্তিমান ও করুণাময়। তিন প্রকার যুক্তির দ্বারা গৌতম ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতেও একটি শ্লোকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রধান প্রমাণগুলি এই : (১) বেদে ঈশ্বর স্বীকৃত ঈশ্বরই বেদের কর্তা। তাই বেদবাক্য অভ্রান্ত। (২) পরমাণুগুলির সংযোগ দ্বারা জড় জগতের সৃষ্টি ঈশ্বরই করিয়া থাকেন। (৩) কর্মফল নিয়ন্ত্রণের জন্য ঈশ্বররূপ বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ কর্তার প্রয়োজন। (৪) জগৎ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটি কার্য, সুতরাং নিশ্চয়ই তাহার একজন কর্তা আছেন।

ন্যায় দর্শন অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মোক্ষ বা অপবর্গকে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। ন্যায় দর্শনের চর্চা দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ হইলেই বন্ধনমুক্তি ঘটে। এই অপবর্গ দুঃখের অবসানজনিত নেতিবাচক অবস্থা। বেদান্ত দর্শন মতে মুক্তি পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা।

ভারতীয় চিন্তায় ন্যায় দর্শনের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। ন্যায় দর্শনের বিচারপদ্ধতি সমস্ত ভারতীয় দর্শনের আদর্শ। ন্যায়ের স্থান বেদান্তের নিচে। ইহা বহুবস্তুবাদী। ন্যায়ের মুক্তিতত্ত্ব অত্যন্ত শুষ্ক ও বুদ্ধি-নির্ভর।

প্রশ্নমালা

1. Indicate the common features of Nyāya and Vaiśesika philosophies. Give a critical estimate of Nyāya as a system of philosophy.

2. Describe the Nyāya theory of knowledge.

3. Critically discuss the Nyāya theory of perception. What is the explanation of illusory perception according to the Nyāya and the Vedānta?

4. Explain the nature of Inference according to the Nyāya. What are its different forms? Compare the Nyāya inference with the Aristotelian syllogism.

5. Explain the theory of causation according to the Nyāya and compare it with the views of the Sāṁkhya and the Vedānta.

6. What is the nature of the relation of Vyāpti, according to the Nyāya? How is the relation established?

7. What is the nature of God, according to the Nyāya? What proofs does the Nyāya offer regarding the existence of God?

অন্যান্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাংখ্য দর্শন

ভারতীয় দর্শনে সাংখ্যের স্থান অতি উচ্চে। উপনিষদ প্রমুখ সুপ্রাচীন গ্রন্থে সাংখ্যের মূল তত্ত্বাবলী খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রাচীন সাংখ্য দর্শন আস্তিকবাদী হইলেও নিরীশ্বর। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নাই। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অ-সিদ্ধ বলা হইয়াছে। অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সাংখ্য বাস্তবিক পক্ষে নিরীশ্বর নয়। যাহা হউক, অন্যান্য ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের মতোই সাংখ্যের উদ্দেশ্য হইল জগতের সর্ববিধ (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক) দুঃখের আত্যন্তিক অবসানের পথনির্দেশ। কী করিয়া এই ত্রিবিধ দুঃখের নিত্যশান্তি হইতে পারে? দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক (শাস্ত্রপাঠাদি) সমস্ত উপায়ই অবিশুদ্ধ এবং তাহারা শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এই দুই উপায়ই পরিত্যাজ্য। ইহার বিপরীত, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও পুরুষের সম্যক্ জ্ঞানই মুক্তির পথে শ্রেষ্ঠ উপায়। এই তত্ত্বজ্ঞান কী রূপে লাভ করা যায়? সাংখ্য দর্শনে প্রমাণ ত্রিবিধ: দৃষ্ট (perception), অনুমান (inference) ও আপ্তবচন (authority); এই প্রমাণ হইতেই প্রমেয় সিদ্ধ হয়। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে যে নিশ্চিত জ্ঞান, তাহাই দৃষ্ট। যাহা ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত নাই, তাহার চিহ্ন (লিঙ্গ) যদি উপস্থিত থাকে, তবে তাহা হইতে যে বস্তুর ইহা চিহ্ন (লিঙ্গী) তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অপ্রত্যক্ষ যে জ্ঞান, তাহাই অনুমান। যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয়—শাস্ত্রে যদি তাহার উল্লেখ থাকে তবে তাহাও প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইবে। ইহা আপ্তবাক্য।

বিশ্বব্যাখ্যায় সাংখ্য সৎকার্যবাদের আশ্রয় লইয়াছে। এই মতে কারণ ও কার্য বস্তুতঃ অভিন্ন। কারণই কার্যে পরিণত হয়। উপাদান-কারণের মধ্যেই কার্য গোপন থাকে। সূত্রই বাস্তবিক পক্ষে বস্ত্রে পরিণত হয়। সাংখ্যমতে কারণ দ্বিবিধ: উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। উপাদান-কারণে যে সম্ভাবনা বর্তমান, নিমিত্ত-কারণ তাহাকে বাস্তবে পরিণত করে। কারণই কার্যে পরিণত হয়। দুগ্ধই দধিতে পরিণত হয়। সাংখ্যমতকে তাই পরিণামবাদ বলা হয়। সাংখ্য এই সৎকার্যবাদকে জগদ্ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়াছে। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম, আবার প্রকৃতিতেই ইহা বিলীন হইবে। সাংখ্যমতে সদ্-

বস্তুর কখনও বিনাশ হয় না। প্রকৃতি হইল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণ। পুরুষ সাক্ষীমাত্র; ইহা জগতের উপাদানও নয়, কারণও নয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও আপন সান্নিধ্য দ্বারা প্রকৃতিকে চঞ্চল করিয়া সৃষ্টি-প্রকরণের শুভারম্ভ ঘটায়। জগৎ এক অব্যক্ত উৎস হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই উৎসই হইল প্রকৃতি। প্রকৃতি অমূল। সাংখ্যকারিকায় বিস্তৃত যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রকৃতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা হইয়াছে। প্রকৃতি হইল গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমবায়। গুণ বলিতে বিজ্ঞানভিক্ষু পৃথিবীর সমগ্র বস্তুর মৌলিক উপাদানকে বুঝিয়াছেন। সত্ত্বগুণ লঘু ও উর্ধ্বগামী, রজোগুণ কর্মোদ্যমদায়ী এবং তমোগুণ হইল আলস্যসঞ্চারী। এই গুণত্রয় সংযুক্ত হইয়া কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সে প্রয়োজনটুকু হইল পুরুষের ভোগ। প্রকৃতি অচেতন, তাহার ভোগ নাই। এই পুরুষ হইল চৈতন্য-স্বরূপ ও নির্বিকার। পুরুষের সান্নিধ্যেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিচলিত হয় এবং সৃষ্টি প্রকরণ শুরু হয়। প্রকৃতির উদ্দেশ্য নির্বিকার পুরুষকে বন্ধনযুক্ত করা নয়, বন্ধনমুক্ত করা। এই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ কী ভাবে সাধিত হয়? সাংখ্যকার উপমার সাহায্যে এই সম্বন্ধটুকুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক চক্ষুষ্মান, চলচ্ছক্তিবিহীন পঙ্গু ব্যক্তি যেমন অন্যবিষয়ে সমর্থ এক অন্ধ ব্যক্তির সহিত যুক্ত হইয়া দুর্গম বনস্থলী অতিক্রম করে, তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্ত হয়। পুরুষের মোক্ষ সাধন হইলে প্রকৃতি ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজ সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। প্রকৃতির প্রয়োজন ছিল পুরুষ দ্বারা দৃষ্ট হইবার এবং পুরুষের প্রকৃতির এই লীলাদর্শনে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইবার, এবং অবশেষে নিজ হইতে প্রকৃতির প্রভেদ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন ছিল। এই বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে তবেই কৈবল্যপ্রাপ্তি সম্ভব।

পৃথিবীর সকল বস্তুই সত্ত্ব: রজঃ তমঃ, এই গুণত্রয়ের সমষ্টি। এই তিনটি গুণের মধ্যে কে প্রাধান্য পাইবে তাহা লইয়া বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি হইতে মহৎ বা বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার জাত হয়। এই অহংকার আবার ত্রিবিধ: সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের সৃষ্টি; তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জাত হয়। রাজস অহংকার উপরোক্ত উভয়বিধ অহংকারে বেগ সঞ্চার করে। পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্র হইতে জাত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে সাংখ্যের এই সৃষ্টি-প্রকরণ প্রকৃতির যান্ত্রিক অভিব্যক্তি (mechanical evolution) নহে। এই অভিব্যক্তির দুইটি ধারা: বুদ্ধি সর্গ ও

ভৌতিক সর্গ। প্রকৃতি বিচলিত হইলে প্রথম মহৎ বা বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধি হইল সৃষ্টি-সম্ভাবনার প্রথম অঙ্কুর। বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য হইল নিশ্চিত জ্ঞান। এই বুদ্ধি হইতেই অহংকারের উদ্ভব। অহংকারের জন্যই ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ত্রিবিধ অহংকার হইতেই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন, ও পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভব হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি এবং এই পঞ্চমহাভূতই যাবতীয় জড় বস্তুর উপাদান। সাংখ্য দর্শনে চক্ষু, শ্রোত্র প্রমুখ পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও বাক্‌পাণি প্রমুখ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কথা বলা হইয়াছে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন অনুভূতি জন্মায় ও বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সাংখ্য দর্শনে অন্তঃকরণ বলিতে মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে বোঝায়। সাংখ্যমতে ইহারা সকলেই আত্মার করণ। বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণ সকলেরই চেষ্টা পুরুষার্থসাধন। পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত, অসঙ্গ ও নির্গুণ। তবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুরুষ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সে প্রকৃতি হইতে আপন আত্যন্তিক পার্থক্য ভুলিয়া যায়। পুরুষ ভুলিয়া যায় যে সে শুধু সাক্ষীমাত্র। পারমার্থিক তত্ত্ব হিসাবে পুরুষের সুখদুঃখ কিছুই নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে সুখদুঃখবোধ ইত্যাদি বুদ্ধির যে ধর্ম তাহা পুরুষে সংক্রামিত হয়, ইন্দ্রিয়-মন-অহংকার সেবিত বুদ্ধি পুরুষকে প্রভাবিত করে। তাই তো পুরুষের কৈবল্যপ্রাপ্তির প্রশ্ন উঠে। দেহ জীর্ণ হইলে যেমন কৈবল্যলাভ সম্ভব হয়, তেমনি এই মরদেহেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়। এই মুক্তি হইল সকল সুখ ও দুঃখের অতীত অবস্থা।

সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। তবে ঈশ্বর যে নাই, এ কথাও সাংখ্য দর্শনে বলা হয় নাই। তাই তাহাদের মতকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অজ্ঞেয়বাদের সঙ্গে তুলিত করা চলে। সাংখ্যসূত্রে বলা আছে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার মতো যথেষ্ট প্রমাণের অভাব রহিয়াছে।

সাংখ্যের পরিণামবাদে, প্রকৃতি-পুরুষের সম্পর্কের স্বরূপনির্ণয়ে, সাংখ্যের সৃষ্টি-প্রকরণ ব্যাখ্যায় সমালোচক ও পণ্ডিতেরা নানান্ অসংলগ্নতা আবিষ্কার করিলেও ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে সাংখ্য দর্শন হিন্দুর দর্শনচিন্তার উৎকর্ষের অন্যতম প্রধান নিদর্শন।

যোগ দর্শন

যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, পুরুষ-প্রকৃতিবাদ স্বীকার করে। সাংখ্যের প্রমাণ- ও মুক্তি-সম্বন্ধীয় ধারণাটুকুও যোগ দর্শনে গ্রাহ্য। উপরন্তু যোগ দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।

যোগ শব্দের অর্থ লইয়া পণ্ডিতজনের মধ্যে মতবিরোধ বর্তমান। যোগ মনঃ-সংযোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যে উদ্যম দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় এবং বিশেষ কোন বস্তু বা অবস্থায় ইহা যুক্ত হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে যোগ। মাক্‌স্ মুয়েল্যের প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করিয়াছেন। যোগ দর্শনের একাংশ তত্ত্ববিষয়ক ও অপরাংশ ক্রিয়াবিষয়ক। যোগ দর্শনে প্রকৃতির ষোড়শ বিকারকে বলা হইয়াছে বিশেষ এবং পঞ্চতন্মাত্র ও অহংকারকে বলা হইয়াছে অবিশেষ। মহৎকে লিঙ্গ ও মহতের উদ্ভবের পূর্বে প্রকৃতির অবিকৃত সাম্য অবস্থাকে বলা হইয়াছে অলিঙ্গ। সাংখ্যের মতোই যোগ দর্শনের পুরুষও সাক্ষীমাত্র। পুরুষ দ্রষ্টা ও প্রকৃতি দৃশ্য। পুরুষের ভোগ- ও অপবর্গ-সাধনই প্রকৃতিরূপ দৃশ্যের লক্ষ্য। অবিদ্যাই হইল পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগের হেতু। অবিদ্যার বিনাশেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ ছিন্ন হয়। ইহাতেই পুরুষের কৈবল্য। যোগ দর্শন অন্যান্য ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের মতোই মানবের সকল দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিতে চায়। সকল দুঃখের উৎপত্তি হয় চিত্তে। পরিণাম বা পরিবর্তনই চিত্তের বৃত্তি। দুঃখ হইল চিত্তবৃত্তির ফল। তাই যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তিনিরোধের কথা বলা হইয়াছে। যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। অন্য পদ্ধতিতে আবার চিত্তবৃত্তিগুলিকে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার: অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। এই অবিদ্যা হইতেই অপর চারি প্রকার ক্লেশের উদ্ভব হয়। যে সকল বৃত্তি ইহাদের বিপরীত, যোগ দর্শন তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে অক্লিষ্ট। যোগ দর্শনের লক্ষ্য হইল চিত্তবৃত্তির সমস্ত বিক্ষোভ প্রশমিত করিয়া শান্ত ও আত্মস্থ হওয়া। চিত্তের বৃত্তির সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে। ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাশ্রিত। এই বৃত্তিগুলিকে ক্রমোন্নতি হিসাবে আবার পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

যোগ দর্শনে যোগসমাধির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে চিত্তের শান্ত, নিস্তরঙ্গ সত্ত্বগুণ-প্রধান নিরুদ্ধ অবস্থাই হইল যোগসমাধি। ইহা দ্বিবিধ: সম্প্রজ্ঞাত ও

অসম্প্রজ্ঞাত। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ আবার চারিপ্রকার : সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। অসম্প্রজ্ঞাত যোগসমাধিতে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ ঘটে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে বাহ্য বিষয়বস্তু, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বস্তুর উপর মন সন্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত যোগে জ্ঞান বা অনুভূতির কোন ক্রিয়াই থাকে না।

যোগ দর্শনের ক্রিয়াংশ বিষয়ক আলোচনায় প্রথমেই এ কথা বলিতে হয় যে চিত্তবিক্ষেপ-উৎপাদনকারী যোগের পথে অন্তরায় অবস্থাগুলির দূরীকরণের জন্যই আমাদিগকে প্রথম সচেষ্ট হইতে হইবে। এই অন্তরায়গুলি হইতেছে ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব ; এই অন্তরায়গুলি দূরীভূত হইলে তবেই মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার উদ্রেক হয়। পরের সুখে ঈর্ষান্বিত না হইয়া সুখবোধ করাই হইল মৈত্রী। পরের দুঃখে সমদুঃখ বোধ করা হইল করুণা। অপরে পুণ্যকর্ম করিলে তাহাতে আনন্দ বোধ করাই হইল মুদিতা এবং অপরের পাপকর্মে আকৃষ্ট না হওয়াই হইল উপেক্ষা। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপকারী সকল অন্তরায় দূর হয় এবং চিত্তের মালিন্য দূরকারী অবস্থাগুলি আয়ত্ত হয়।

যোগাঙ্গের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে তবেই তাহার সমাধি বা সমাপত্তি লাভ ঘটে। কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুর নির্দেশক্রমে দেহ ও চিত্তের শুচিতা ও সংযমের দ্বারা নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হয়। যে উপায়গুলির দ্বারা ইহা সাধিত হয় সেই প্রণালীগুলিকে যোগাঙ্গ বলা হয়। যম, নিয়ম প্রমুখ অষ্টবিধ যোগাঙ্গের কথা যোগ দর্শনে বলা হইয়াছে। এই প্রণালীগুলি গৃহস্থ প্রমুখ যোগমার্গ আরোহেচ্ছু সকল জীবের জন্যই বিহিত। এই প্রণালীগুলি নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া যাঁহারা যোগের উচ্চতর স্তরে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের যুঞ্জান ও যাঁহারা যোগবলে সমাধির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদিগকে যোগারূঢ় বলা হয়। যোগের প্রাথমিক স্তরের যোগাঙ্গসমূহ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। ইহাদের সাধন উচ্চস্তর স্তরে আরোহণের সোপান স্বরূপ। যোগের উদ্দেশ্য হইল ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা জীবাত্মার পরমাত্মার বিলয় নহে ; ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল চিত্তের সমস্ত চাঞ্চল্য ও ক্রিয়া শান্ত করিয়া আত্মস্থ হওয়া। ধ্যানে ধ্যানক্রিয়া ও ধ্যেয় বিষয়ের ভেদ লুপ্ত হয় না। যোগকথিত সমাধিতে এই দুই অভিন্ন হইয়া যায়। ধ্যেয় বিষয় ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। যোগদর্শনে 'সমাধি' কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। সমাধি বলিতে যোগের শেষ অবস্থা চিত্তবৃত্তিনিরোধ বুঝায় এবং এই উদ্দেশ্যের সাধক যে উপায় (যোগাঙ্গ) তাহার

শেষ স্তরও বুঝায়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটি স্তরকে অন্তরঙ্গ সাধনা বলা হয়। সমাধি তাই সাধনার সর্বোচ্চ স্তর আর সাধনা দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহার সর্বোচ্চ স্তরকেও সমাধি বলা হয়।

সমাধি বা সমাপত্তির বিভিন্ন স্তরভেদ। সমাপত্তির স্বকীয় প্রবৃত্তিভেদে ইহা চতুর্বিধ : সবিতর্ক সমাপত্তি, নির্বিতর্ক সমাপত্তি, সবিচার সমাপত্তি ও নির্বিচার সমাপত্তি। সবিতর্ক সমাপত্তিতে বাক্য, বিষয় ও সংজ্ঞা পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। যখন স্মৃতি-পরিশুদ্ধ হইয়া জ্ঞান প্রতিভাসিত হয় তখন তাহাকে নির্বিতর্ক সমাপত্তি বলে। এই উভয়বিধ সমাধিতে স্থূলের সাক্ষাৎকার ঘটে। সবিচার সমাধির সূক্ষ্ম বিষয়। সবিচার সমাপত্তির বিষয় দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন। নির্বিচার সমাপত্তিতে এইসব সূক্ষ্ম বিষয়গুলির অল্পমাত্র উদ্ভাসিত হয়। এই চতুর্বিধ সমাধি হইল সবীজ সমাধি। সমস্ত সমাধির উচ্চতম শেষ স্তরকে নির্বীজ সমাধি বলা হয়। এখানে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ।

যোগের বিভিন্ন স্তরে ক্রমিকভাবে যোগী নানাবিধ আণবিক শক্তি লাভ করে। এই সব শক্তির প্রকাশ ও ব্যবহারের ফলে সাধনমার্গে অধঃপতন ঘটে। ইহারা সমাধির পথে বিঘ্নস্বরূপ। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একত্র প্রয়োগের নাম সংযম। এই অন্তরঙ্গ সাধনত্রয় (সংযম) নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ। সংযম দ্বারা অতীত ও অনাগত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। পঞ্চভূত সংযম দ্বারা ভূতসিদ্ধি লাভ করা যায়। ভূতজয় হইলে যে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয় তাহাদিগকে অষ্টসিদ্ধি বলে। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, মহিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বসিত্ব প্রমুখ অষ্টসিদ্ধি লাভের পন্থানির্দেশ পূর্বোল্লিখিত সাধনত্রয়ের কার্য।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে যোগ দর্শনে ঈশ্বরের স্থান আছে। সাংখ্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপরে যোগ দর্শন ঈশ্বরতত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছে। চিত্তসংযমের উপায় হিসাবে ঈশ্বর প্রণিধানের কথা বলা হইয়াছে! ঈশ্বরধ্যানে চিত্তসত্ত্ব সহজে একাগ্র ও সমাহিত হয়। পতঞ্জলি সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তি জ্ঞানের সহায়ক। যোগ অনুযায়ী ঈশ্বর-অনুকম্পা মুক্তির কারণ নয়। তবে এ কথা স্বীকার্য যে যোগে ঈশ্বরতত্ত্ব দুর্বল। যোগের ক্রিয়াংশ ক্রমেই তত্ত্বাংশকে গ্রাস করিয়াছে। যোগ দর্শনে সাংখ্য দর্শনের সমস্ত দুর্বলতা ও অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলিতে হয় যে যোগ দর্শনই প্রথম পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিল যে মানুষের দেহ এবং চিত্ত অনন্ত শক্তির অধিকারী। 'দেহশুদ্ধি ও চিত্তসংযমের উপায়ের সবিস্তার বর্ণনাই হইল যোগ দর্শনের বিশেষ অবদান।

মীমাংসা দর্শন

মহর্ষি জৈমিনী মীমাংসা দর্শনের স্থাপয়িতা বলিয়া খ্যাত। মীমাংসা ও বেদান্ত পুরাপুরিভাবে বেদকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা এই দুই প্রস্থানে বেদ-নির্ভরতা অধিক। জৈমিনীর দর্শনকে 'পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনকে উত্তর মীমাংসাও বলা হয়।

বেদের দুইটি কাণ্ড : কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। পূর্বমীমাংসা বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড যুক্তি দ্বারা সমর্থন করে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যে বাস্তবিকই মানুষের মোক্ষসম্পাদনে সমর্থ, ইহা প্রমাণ করাই পূর্বমীমাংসার প্রধান উদ্দেশ্য।

মীমাংসা-মতে বেদ অস্পৃষ্ট, নিত্য, অবিনাশী। মানুষের সৃষ্টি ভ্রম-ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু বেদ অভ্রান্ত। বেদে বিভিন্ন ঋষির উল্লেখ আছে। তাঁহারা বেদের রচয়িতা নন। বেদের চিরন্তন সত্য তাঁহাদের মুখ হইতে প্রকাশ লাভ করিয়াছে মাত্র। তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রস্রষ্টা নন।

মীমাংসা-মতে জ্ঞান স্ব-প্রকাশ। উপযুক্ত অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইলেই জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্যক্ষের বেলায় ইন্দ্রিয়, বিষয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ত্রুটিশূন্য এবং অনুকূল হইলে তৎক্ষণাৎ যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। অনুমানের বেলায় লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে নিয়ত অব্যভিচারী ব্যাপ্তিসম্বন্ধ প্রমাণিত হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিশ্বস্ত আপ্তজনের বাক্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যয় উৎপন্ন করে। এসব ক্ষেত্রে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। সংশয় থাকিলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান সমস্ত সংশয় ছেদন করে। বেদনির্দিষ্ট জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। এ বিষয়ে কোন দ্বিধা বা অস্পষ্টতা থাকিলে মীমাংসা দর্শন দ্বারা দূরীভূত হয়। প্রভাকর-স্থাপিত মীমাংসা দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ছাড়া উপমান এবং অর্থাপত্তিকেও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। কুমারিল ভট্ট-প্রবর্তিত মীমাংসায় তদুপরি অনুপলব্ধিও প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত।

যাহা বেদনির্দিষ্ট, তাহাই ধর্ম। যাহা বেদনিষিদ্ধ, তাহাই অধর্ম। বেদ-নির্দিষ্ট আশ্রমানুযায়ী কর্মসম্পাদনই প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিহিত। কোন ফললাভের আশায় এই কর্মসম্পাদন নয়। চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম এবং নিষ্ঠা দ্বারা দেহমনকে পবিত্র করিয়া নিষ্কাম কর্মসম্পাদনই মুক্তিলাভের উপায়। প্রাচীন মীমাংসকগণ এই মুক্তিকে বিশুদ্ধ আনন্দ বা স্বর্গলাভ বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন। পরবর্তী মীমাংসকগণ মুক্তিকে দুঃখনিবৃত্তি এবং সংসারচক্রছেদন রূপ নেতিবাচক অবস্থা বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

চার্বাক প্রমুখ জড়বাদী আত্মাকে জড়বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং দেহের অবসানে আত্মারও অবসান হয়, এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না। বেদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে বিভিন্ন যজ্ঞ সম্পাদনদ্বারা স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক ইত্যাদি লাভ করা যায়। আত্মার বিনাশ ঘটিলে, কেই বা কর্মের পুণ্যফল ভোগ করিত? পৃথক ও স্বাধীন যুক্তিদ্বারা মীমাংসকগণ জড়বাদীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন এবং আত্মার অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আত্মার চেতনা আছে। কিন্তু ইহা আত্মার স্বরূপ নয়—ইহা আগন্তুক গুণ মাত্র। আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে চেতনার উদ্ভব হয়। মনরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযোগও চেতনার জন্য অত্যাবশ্যক। মুক্ত আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনমুক্ত হয়, তখন চেতনাও থাকে না, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা বা বীজ তখনও থাকে।

ন্যায়-বৈশেষিকের মতো মীমাংসাও বাহ্য জগতের সত্যতায় বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বহু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বহু জীবাত্মার নিয়ন্তা হিসাবে ভগবান বা পরমাত্মা স্বীকারের প্রয়োজন মীমাংসকগণ বোধ করেন না। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম অথবা তাঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র নির্ভুল ভাবে উচ্চারিত হইলে অদৃশ্য অমোঘ শক্তি সৃষ্টি করে। কর্মফলের অদৃশ্য শক্তিই ব্যক্তির অদৃষ্ট নির্ধারিত করে। কর্মের নির্দিষ্ট নিয়ম এই জগতের সমস্ত দ্রব্য গঠন করে। এই জগৎ চিরকাল চলিয়াছে—ইহার ধ্বংস ও আবার নূতন সৃষ্টি নাই। যজ্ঞাদি কর্মফল আত্মায় যে অদৃশ্য শক্তি বা সংস্কার সৃষ্টি করে, তাহা দ্বারাই ব্যক্তি এই জীবনে কৃত কর্মফল পরজীবনে ভোগ করে।

বেদান্ত দর্শন—শংকরাচার্য

সমস্ত বেদ এককালে রচিত হয় নাই। বহু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বৈদিক চিন্তায় বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ বিভিন্ন দেবতার স্তবগানে পূর্ণ—অতি উচ্চ দার্শনিক ভাবের সাক্ষাৎ সেখানে মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও সুশৃংখল দার্শনিক চিন্তার সেখানে অভাব। দেবতাদিগকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কি করিয়া বিভিন্ন যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ তাহারই বিবরণে

পূর্ণ। বেদের অন্ত হইতেছে উপনিষদসমূহ। উপনিষদেই অনেকটা সুশৃংখলভাবে বেদের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহাই বেদান্ত নামে খ্যাত। প্রত্যেক বেদের দুই অংশ : সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতায় আছে বেদমন্ত্র। ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা। যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনা সেখানে প্রধান। ব্রাহ্মণের আবার তিন ভাগ : ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষৎ। উপনিষৎ তাই বেদের অন্তভাগ বলিয়া বেদান্ত নামে বিখ্যাত।

মহর্ষি বাদরায়ণ উপনিষদগুলির মূল দার্শনিক তত্ত্ব অতি সংক্ষিপ্তাকারে ব্রহ্মসূত্র নামে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তায় বেদান্তের প্রভাব অসামান্য। কিন্তু বেদান্তসূত্র এত সংক্ষিপ্ত যে, ইহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হইয়াছে। এই ভাষ্যগুলির মধ্যে শংকরাচার্যের ভাষ্য দেশে ও বিদেশে এত সুবিদিত যে, অনেক সময়ই শংকরের অদ্বৈত বেদান্তকেই একমাত্র ভারতীয় দর্শন বলিয়া ভুল করা হয়। শংকরাচার্যের বেদান্ত ব্যাখ্যাকে অদ্বৈত বেদান্ত বলা হয়। বেদান্তের আর একটি ভাষ্যও সুপরিচিত—তাহা হইল রামানুজাচার্যের শ্রীভাষ্য। রামানুজের বেদান্ত মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়।

শংকরের অদ্বৈত বেদান্তবাদ

অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্য অতি সংক্ষেপে সার্ধ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জীবব্রহ্মৈব নাপর"। ইহার অর্থ—'ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মায়া মাত্র এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন।'

অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মের কল্পনার মূল আমরা ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে এক বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতিরিক্ত বিরাট পুরুষের বর্ণনা হইতে পাই। এই পুরুষ সমগ্র বিশ্বজগৎ—জড়, জঙ্গম, পক্ষী, প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা, ঈশ্বর সকলকে ধারণ করিয়া আছেন—তিনি সমস্ত উপাধি, সমস্ত বিশেষণের অতীত। তাঁহা হইতেই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, তাঁহাতেই সর্ব জগতের স্থিতি, তাঁহাতেই সমস্ত কিছুর বিলয়। সেই **একই** সত্য, সমস্ত বহু সেই **একেরই** প্রকাশ। সেই **একই** আত্মা। সমস্ত বহুকে তিনিই ধারণ করিয়া আছেন, সেই বহু বা নানা বাস্তবিক সত্য নয়। এই ভাবগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নানা উপনিষদেই ব্যক্ত হইয়াছে—যথা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'তত্ত্বমসি', ইত্যাদি।

শংকর বেদান্ত-মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্মই একমাত্র কারণ। এই জগতের যাহা কিছু সত্য বলিয়া মনে করা হয়, তাহা সেই এক ব্রহ্মেরই প্রকাশ। অদ্বৈত

বেদান্ত সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে কারণ ও কার্য অভিন্ন। সাংখ্যও সৎকার্যবাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁহাদের মতে জগৎ মূল্য-প্রকৃতির পরিণাম বা বিকার। কিন্তু বেদান্তমতে এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম—ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট নয়। ব্রহ্মই জগতে প্রকাশিত। এই জগৎ ব্রহ্মের মায়া বা বিবর্ত। তাই অদ্বৈত বেদান্তের কারণবাদকে বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ বলা হয়। সাংখ্যের কারণবাদ হইল পরিণাম বা আরম্ভবাদ।

এই জগৎ তো আমাদের কাছে সত্য বলিয়াই মনে হয়। অদ্বৈত বেদান্ত বলে ইহা **মায়া**। একাধিক উপনিষদে ব্রহ্মকে মায়াবী বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মের মায়াশক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।* মায়াবী যেমন অজ্ঞ মানুষের চোখের সামনে একটি টাকাকে বহু টাকা করিয়া 'ভোজবাজি' দেখান, অথচ বাস্তবিক পক্ষে 'অনেকগুলি টাকা' সৃষ্টি হয় না—তেমনি ব্রহ্মের মায়াশক্তি বশতঃ এই প্রবৃত্তিকে আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা বহু বলিয়া বিশ্বাস করি। এই মায়া ব্রহ্মেরই অবিচ্ছিন্ন শক্তি এবং এ মায়া তাঁহাকে মুগ্ধ করে না। জীব অজ্ঞানতা বশতঃ এক ব্রহ্মকেই জগতের বহু দ্রব্যে পৃথক করিয়া দেখে। এই অজ্ঞানতা বা অধ্যাসের আবরণ দূরীভূত হইলেই জীব ব্রহ্ম হইতে নিজের ও জগতের বহু বস্তুর অভিন্নতা বুঝিতে পারে। বেদান্ত দর্শনই এই মোহাপহারক।

অদ্বৈত দর্শনে তিন প্রকার অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে—ব্রহ্মেরই আছে **পারমার্থিক সত্তা**—ব্রহ্মই একমাত্র চিরন্তন বাস্তব সত্য। এই জগৎ দৃশ্যতঃ সত্য—ইহা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় নয়, কাজেই ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। কিন্তু এই জগৎ তো আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গের মতো অসম্ভব, সম্পূর্ণ অলীক নয়। আমাদের প্রত্যক্ষে ইহাকে সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই এই সংসারে আমাদের চলিতে হয়। কাজেই এই জগতের **ব্যবহারিক সত্তা** আছে। এই জগৎ মায়া। কিন্তু মায়ারও তো আধার চাই। ব্রহ্মই সেই আধার। এবং মায়ার কারণ হইতেছে অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইবে। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে আমরা 'ইহা নাই', একথা যেমন বলিতে পারি, আবার তেমনি, 'ইহা আছে' একথাও তেমনি বলিতে পারি। তাই ইহা হইতেছে **অনির্বচনীয় সত্তা**।

সকলের চেয়ে অস্থায়ী সত্তা হইতেছে আমাদের ব্যক্তিগত ভ্রম, স্বপ্ন বা অলীক প্রত্যক্ষের (dreams, illusions and hallucinations)। ইহাদের সত্তা নিতান্তই

প্রাতিভাসিক। জগৎ সম্বন্ধে যে মিথ্যাজ্ঞানের ভ্রম তাহা ব্যক্তিবিশেষের নয়—তাহা সর্বজনীন। জগৎ সম্বন্ধে যে মায়া তাহা সম্পূর্ণ নেতিবাচক নয়। জগতে সদ্‌বস্তু ব্রহ্মকে যখন দেখিতেছি না তখন আমাদের দৃষ্টি আচ্ছাদিত। অবিদ্যার এই দিকটি হইতেছে সত্যের **আবরণ**। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন সত্য রজ্জুকে দেখিতেছি না। তাহা আবৃত। কিন্তু শুধু তাহাই নয়—রজ্জুতে সর্পকে নিরীক্ষণ করিতেছি। অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে সর্পত্ব **আরোপ** করিতেছি। ইহারই নাম অধ্যাস। অনুরূপ ভাবে মিথ্যা মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া এক ব্রহ্মকে দেখিতেছি না—বরঞ্চ তাহাতে বহুবস্তুত্ব আরোপ করিতেছি। ব্রহ্ম এক, তাহাতে সজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত কোন প্রকার ভেদ নাই।

ব্রহ্ম বাস্তবিকপক্ষে নির্গুণ—সমস্ত গুণাতীত। তথাপি দার্শনিকেরা ব্রহ্মে সর্বশক্তিময়তা, বিভুত্ব, করুণাময়ত্ব ইত্যাদি গুণ কল্পনা করেন। অদ্বৈত বেদান্তে সেই জন্য ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে। সত্য, জ্ঞান, অনন্ততা ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। ইহারা গুণ নয়। ইহারা ব্রহ্ম হইতে অপৃথক। সত্যম্, জ্ঞানম্, আনন্দম্ ব্রহ্মঃ' কিন্তু সর্বব্যাপিত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, করুণা ইত্যাদি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

অজ্ঞানতা বিদূরণ ও বেদান্তের সত্যজ্ঞান লাভই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। এবং যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। যজ্ঞ-অনুষ্ঠান, পূজাভক্তি কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই অবস্থা লাভের প্রস্তুতি হিসাবে সাধারণ মানুষের জন্য অবশ্য নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে প্রভেদ সম্বন্ধে আলোচনা, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত পুণ্যফল লাভের প্রতি বিতৃষ্ণা, সংযম, শুচিতা ইত্যাদি কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা সম-দমাদি সাধন-সম্পদলাভ এবং সর্বোপরি প্রয়োজন মোক্ষলাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তটস্থলক্ষণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা আরাধনা সাধারণ মানুষের অন্তরে মুমুক্ষুত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবার জন্যই কেবল প্রয়োজন।

যিনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করেন, তিনি অবিমিশ্র অমৃতানন্দের অধিকারী হন। কোন বন্ধন তাঁহাকে আবদ্ধ করে না। তিনি দেহে থাকিয়াও জীবন্মুক্ত। দেহের অবসানে তিনি বিদেহ মুক্তি লাভ করেন।

———

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—রামানুজাচার্য

ব্রহ্মই চরম সত্য, তিনিই চিৎ ও অচিৎ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে—ইহা রামানুজাচার্যও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার মতে এই জগৎ মিথ্যা নয়—মায়া নয়। এই জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ—তাঁহারই সৃষ্টি। তাঁহারই উপাদান হইতে সমগ্র জগৎ সত্যই সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি অবিদ্যাজনিত মায়া নয়। যাহাকে শংকর ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। উর্ণনাভ যেমন নিজ অন্তস্থ সূত্র দ্বারা বিরাট আবাস সৃষ্টি করে, ব্রহ্মও তেমনি নিজ অন্তস্থ সনাতন অচিৎ বা জড়পদার্থ হইতে এই বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করেন। আবার নিজ অন্তস্থ চিৎ উপাদান হইতে বহু জীবাত্মা সৃষ্টি করেন। জগৎ ও জীবাত্মা তাঁহার অংশ—তিনি অংশী। জীবাত্মা অণু, স্বয়ংপ্রভ, চেতন ও নিত্য। নিজ কর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর প্রতি জীবাত্মাকে নিজ কর্ম-অনুরূপ দেহ দেন। এই দেহের বন্ধন—এই অচিতের বন্ধন—জ্ঞানদ্বারা ছেদন করিতে পারিলে তবেই মোক্ষলাভ। দেহ থাকিতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা হইতেই কর্ম ও দেহের বন্ধন সৃষ্টি হয়। দেহযুক্ত হইয়া জীবাত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষার বস্তুতে আকৃষ্ট হয়। নিজেকে দেহ বা ইন্দ্রিয় বলিয়া ভুল করিয়া কর্মের পাকে জড়িত হইয়া কর্মের বন্ধনে জড়িত হয়। ইহারই ফল পুনঃ পুনঃ জন্ম—সংসারচক্রে আবর্তিত হওয়া। কিন্তু বেদান্তপাঠের দ্বারা জীব যখন নিজেকে দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নিশ্চিত জানিতে পারে, তখনই তাহার সর্ববন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়। ঈশ্বর সর্বগুণের শ্রেষ্ঠ আকর—সেবা পূজা আরাধনা দ্বারা দেহের ও মনের মলিন কামনা-বাসনা তাঁহারই কৃপায় দূর হয়। প্রেমময় ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ভক্তি ও আত্মসমর্পণ দ্বারা জীবাত্মা ব্রহ্মের সান্নিধ্যলাভ করে—**ব্রহ্মের মতনই** হইয়া যায়। **কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন নয়।**

ব্রহ্মই চরম সত্তা—কিন্তু তিনিই একমাত্র সত্য, একমাত্র সত্তা একথা বলা ঠিক নয়। তাঁহার অন্তরেই আছে জগতের বহুত্বের উপাদান। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরুপাধিক, অখণ্ড সত্তা নন। এই মতবাদও অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু এই অদ্বৈততত্ত্ব জগৎ ও জীবের বহুত্বদ্বারা বিশিষ্ট। সুতরাং **এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ** বলা হয়। রামানুজ বলেন, উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রেও জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমন তাহাদের ভেদের কথাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে আছে, অধিকং তু ভেদ নির্দেশাৎ (২. ১. ২২); অংশো নানা ব্যপদেশাৎ, অন্যথা চাপি দাশ কিতবাদিত্বং অধীয়ত একে (২. ৩. ৪৩)। শ্রুতিতেই আছে, সতা সৌম্য তদা সম্পন্নোভবতি ; আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য। এই সব শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া রামানুজ বলিয়াছেন যে শ্রুতিতে কোন স্থানে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কোথাও আবার অভিন্ন বলা হইয়াছে। সুতরাং দ্বৈতবাদ বা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বেদান্তের প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই প্রকৃত ব্যাখ্যা।
